স্রোতের সঙ্গে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৫৮

প্রচ্ছদপট :

শ্রীগৌতম রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
এস. এম. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯ হইতে পি, কে, পাল কর্তৃক মুদ্রিত

এক

শেষ রাত্রির বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, মাথার কাছে খোলা জানালা দিয়ে সেই বাতাস এসে মশারি দোলাচ্ছিল, মশারির ভেতর ঘামের গন্ধ-ভরা গুমোটটা স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর তার ফলে ঘুমন্ত প্রবীরকুমার ব্যানার্জি চমৎকার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখছিল একটা।

স্বপ্নটা দেখছিল এই জন্যে যে, আপাতত একজোড়া জুতোর অত্যন্ত দরকার ছিল তার। সম্প্রতি যে জুতোজোড়া তার পাদপদ্ম আলো করছে —ভাঙা টাইমপীস থেকে খালি শিশি-বোতল এবং পুরনো জুতো পর্যন্ত কিনতে যারা দরজায় দরজায় হাঁক দিয়ে বেড়ায়—ছ' মাস আগেই ওই জোড়াকে ওদের হাতে অক্লেশে সমর্পণ করতে পারত সে। কিন্তু শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সংকল্পে অটল। কাঁটা উঠে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক, সেলাই করতে গিয়ে মুচি হতাশ নয়নে তাকিয়ে থাকুক, আরো মাস তিনেক ওই জুতোতেই চালাতে হবে তাকে। অর্থাৎ ওই জুতোয় আরোহণ করেই পার হতে হবে ঘনঘোর বর্ষার জলধারা, তরল কাদার রোমাঞ্চকর প্রলেপ।

মুশকিল হল, রবারের জুতো একেবারেই পরতে পারে না সে। মিনিট পাঁচেক পায়ে রাখলেই অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা শুরু হতে থাকে মাথায়, মেঘের মতো ভার নামতে থাকে কপালে। ডাক্তার বলেন, অ্যালার্জি। ওই একটা চমৎকার শব্দ আমদানি করেছেন ডাক্তারেরা—যখন কোনো কিছুর হদিস মেলে না, তখন ওই পরম বাক্য: 'অ্যালার্জি'।

মোটের ওপর, প্রবীরের একজোড়া জুতো দরকার এবং মাসতিনেক আগে সেটা কেনা যাচ্ছে না। ফলে, শোবার আগে গোড়ালি জুতোয় হাত বুলিয়ে দেখছিল সবটা বেশ চষা মাঠের মতো আর এখানে-ওখানে চিনচিনে ব্যথার বিদ্যুৎ। শেষ রাত্রে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মশারির ভেতর খানিকটা স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে দিলে, অতএব ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠল।

তখন প্রবীরের পায়ে ভাইসরয় কিংবা অ্যাম্বাস্যাডার জাতীয় নামের এক জোড়া অতি কুলীন জুতো। সেই-টে পায়ে দিয়ে সেই অতীব মসৃণ কোনো পথ দিয়ে (যে রকম পথ মাত্রেই স্বপ্নেই মেলে, যাদবপুর থেকে চিড়িয়ার মোড় পর্যন্ত যার অস্তিত্ব কোথাও নেই) সে পরম সুখে হেঁটে যাচ্ছিল। তার পর হোঁচট, টুলু

ইচ্ছে করছিল এবং মনে হচ্ছিল এ-রকম জুতো পায়ে থাকলে তিন মাসে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আসা যায়।

স্বপ্নটা নিবিড় হচ্ছিল, স্বাপ্নিক পথের দু' ধারে বসন্তকালের পাখিরা ডাকছিল-টাকছিল, প্রবীর যেন কোত্থেকে এক ঠোঙা গরম চীনাবাদামও পেয়ে গিয়েছিল। সুখের আবেশটা আর একটু ঘন হলে তার পাশে একটি নায়িকার আবির্ভাবও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে রাত ভোর হল, বাইরের বুড়ো নিমগাছে খ্যা-খ্যা করে বেয়াড়া গলায় কাক ডাকল, আর মা ঘরে এলেন।

মার সারা রাত ঘুম হয় নি। ছেলের সামনে পারেন না—তাই লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকবার কেঁদেছেন। আর পারা গেল না, ভোরের আকাশ সাদা হল, মা আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা ঠেলে ছেলের ঘরে এলেন।

'ভুলু!'

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকনাম। এখনকার চোয়ালভাঙা কড়া চেহারা নয়, ছেলেবেলায় ফর্সা গোলগাল ছিল দেখতে, আর জন্মকালীন পোশাক পরে সারা গায়ে ধুলো মেখে ঘুরে বেড়াত। দিদিমা নাম দিয়েছিলেন ভোলানাথ। সেই থেকেই ভুলু।

মা আবার ডাকলেন, 'ভুলু!'

মশারির মধ্যে নড়ে উঠল প্রবীর। স্বপ্ন বিলীন হল হাওয়ায়, ভাইসরয় কিংবা ফিল্ড মার্শাল জুতো উপযুক্ত পায়ের উদ্দেশে উধাও হয়ে গেল বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে চিনচিন করে উঠল ব্যথার বিদ্যুৎ। ময়লা মশারি আর ঘামের গন্ধ-ভরা বিছানায় প্রবীর চোখ মেলল।

ঘর ছায়া-ছায়া। মা দাঁড়িয়ে। মশারির আবরণ থেকে কেমন সুদূর মনে হয় তাঁকে। মা'র রোগা শরীরটাকে আরো শীর্ণ, আরো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এখন। স্বপ্নের মতোই মাও যে-কোনো সময় ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যেতে পারেন। মমতার একটা ছোঁয়া লাগল চকিতের জন্যে।

মা খুব ভীরুর মতো ডাকলেন, 'তোর ঘুম ভেঙেছে ভুলু?'

'ভেঙেছে।'

'চা-টা খেয়ে—' সংকোচে মা একবার থামলেন: 'একটু সকাল-সকালই যাবি নাকি মুরারিবাবুর কাছে?'

সব বিস্বাদ হয়ে গেল, মাথাটা জ্বালা করে উঠল। বিছানার পাশে, খোলা [illegible]রার ওপর বসে সেই সময় একটা কাক চাঁছা গলায় ডেকে উঠল খ্যা

খ্যা করে।

এক বন্ধুর কাছ থেকে এক সময় দিন কয়েক যোগ-ব্যায়ামের তালিম নিয়েছিল প্রবীর। মা'র কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল শরীরটা—শবাসনের ভঙ্গিতে হাত-পা মেলে দিয়ে মরা ব্যাঙের মতো চিৎ হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর তড়াক করে উঠে বসল বিছানার ওপর।

মা একটু পেছিয়ে দাঁড়ালেন।

মশারির বাইরে এসে প্রবীর মা'র দিকে তাকালো। ঘর ছায়া-ছায়া। তবু মা'র শীর্ণ সাদা মুখটাকে দেখা যায়, কঙ্কালের মতো লাগে। মার ওপর মিথ্যেই রাগ করা—সব চেয়ে নিরুপায়কে আরো বেশি কষ্ট দেওয়া। সমস্ত জীবন একটানা দুঃখই পেয়েছেন। বাবার ধারণা ছিল তিনিই শেষ গ্র্যাজুয়েটদের একজন—যাদের পরে আর কেউ ইংবিজি শেখেনি। অফিসের নতুন ছেলেদের লেখায় ভুল ইংরিজি—আর্টিকল কিংবা প্রিপোজিশনের খুঁত—এই সব আবিষ্কার করতে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে একটা হিংস্র উল্লাস ছিল তাঁর। তিনি নিজেকে এম-এ, পি-এইচ-ডি ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি ইণ্টেলেকচ্যুয়াল বলে জানতেন, আর—

আর মহাকালী পাঠশালায় ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া মা-কে সম্পূর্ণ ইডিয়ট ভাবতেন। 'তোমার মতো গাধাকে নিয়ে সংসার করা—' এইরকম সিদ্ধান্ত প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখ থেকে।

মা শান্ত, মা সবল, মা ঝগড়া করতে জানতেন না। খাওয়া চলে না, এমনি এক সংসার থেকে এসেছিলেন। কাজেই নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন বাবার সিদ্ধান্ত। গাধার মতো খেটেছেন, গাল খেয়েছেন, ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়েছেন। না—মা'র কোনো ভূমিকা নেই, কিছুই করবার ছিল না তাঁর। যা কিছু করার তা বাবাই করে গেছেন, কারণ প্রতুল নিচের ক্লাসে বার দুই ফার্স্ট হওয়ার পরে তাঁব বিশ্বাস জন্মেছিল, এই ছেলে ভবিষ্যতে চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনকে ছাড়িয়ে যাবে।

তারপর—

তারপর এখন যেতে হবে মুরারি হালদারের কাছে। যে লোকটার নাম শুনলেও সকালবেলাটা অশুচি হয়ে যায়।

আবার ছায়ার ভেতর থেকে মা'র গলা ভেসে এল।

'আমি জানি বাবা, তোর কত খারাপ লাগছে। কিন্তু হাজার হোক, টুলু

তো তোর আপন ভাই।'

টুলু প্রতুলের ডাক নাম। 'টোলানাথ' থেকে নিষ্পন্ন নয়—ভুলুর অনুক। শব্দ। আপন ভাই—নিঃসন্দেহ! বাবা বিদ্রূপ করে বলতেন, 'ভুলুর মগজে কিচ্ছু নেই, শেষে পাস-কোর্সে বি-এ পাস করল! টুলুকে আমি এশিয়ার বেস্ট স্কলার করে ছাড়ব।'

বেস্ট স্কলারের নমুনা মৃত্যুর আগেই বাবা কিছু দেখে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে আজ পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেতেন তার। নিষ্ঠুর কৌতুকের মতো ব'। একটা নিজের ভেতরে অনুভব করল প্রবীর।

মা আবার বললেন, 'সেই জন্যেই বলছিলুম, একটু তাড়াতাড়ি মুরারিবাবুর কাছে গেলে—'

মা'র ওপর রাগ করা উচিত নয়, তবু বিরক্তিটা ঠেকানো গেল না কোনো মতে।

'তোমার-আমার গরজে তো হবে না মা। ও-সব বড়লোক ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।'

'কী বলছিস তুই—ন'টা পর্যন্ত ঘুমুতে পারে কেউ।'

'বড়লোকের অসাধ্য কাজ নেই মা, সব পারে।'

ছেলে ঠাট্টা করছে কিনা, মা বুঝতে চাইলেন একবার। তারপরে আবার তাঁর চোখে জল এল।

'তা হোক বাবা, তুই একটু তাড়াতাড়িই যা!'

'কিছু ব্যস্ত হয়ো না মা, বাজারটা সেরে দিয়ে তারপর যাব।'

'বাজার আজ না হলেও চলবে বাবা।' মা'র গলা কাতর হয়ে এল: 'ছেলেটা থানার হাজতে আটকে রইল, হয়তো ওকে মারধোর করছে—'

নাঃ, অসম্ভব, মা'র ওপরে সহানুভূতি জাগিয়ে রাখা অসম্ভব। শুধু জৈবিক অন্ধ স্নেহ একটা। মা কি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও কঠিন হতে পারেন না কখনো? একটা নির্জীব মেয়েলিপনার মধ্যে তলিয়ে রইলেন চিরকাল, গাধার মতো সংসারের বোঝা টানলেন, নিস্তেজ চোখ মেলে বাবার ইংরিজি-বাংলা মেশানো বাছা-বাছা গালাগালগুলো আত্মসাৎ করলেন, আর ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়ে গেলেন। একবারও কি মাথা তুলে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারতেন না? তা হলে—তা হলে হয়তো সব অন্যরকম হতে পারত। অন্তত ঠিক এ-রকমটা হতে পারত না।

তক্তপোশ থেকে নেমে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে তীক্ষ্ণ অধৈর্য স্বরে প্রবীর বললে, 'যাচ্ছি—যাচ্ছি। গিয়ে না হয় দশটা পর্যন্তই বসে থাকব হালদারের দারোয়ানের পাশে।'

নির্জীব, মেয়েলি মা'র কান্না এবার আর রাশ মানল না। টপ করে গাল বেয়ে একটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

ধরা গলায় মা বললেন, 'তুই বিরক্ত হলে কী করব বল্—টুলু তো আমার পেটের ছেলে।'

'হুঁ—কুলতিলক।' আরো কতগুলো বীভৎস কথা এগিয়ে আসছিল ঠোঁটে, প্রবীর সামলে নিলে। বললে, 'যাব মুরারিবাবুর কাছে, যাচ্ছি। কিন্তু আরো দিনকতক পুলিসের হেপাজতে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে না মা—বরং ওর স্বাস্থ্যের জন্যেই ওটা দরকার।'

মা চুপ।

'একটু চা-টা দেবে, না, এইভাবেই দৌড়োব?'

ব্যস্ত হয়ে মা বললেন, 'চা দিচ্ছি, তুই মুখটুখ ধুয়ে নে।'

অতএব ভোরের স্বপ্নে পাওয়া জুতো নয়, যে জুতোজোড়াকে ছ' মাস আগে অনায়াসে বিদায় দেওয়া চলত, সেইটে পায়ে পরে, গোড়ালিতে কয়েকবার চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে করতে এবং কোনো এক ফাঁকে মুচিকে দিয়ে কয়েকটা উঠতি-গজাল ঠুকে নিতে হবে, এই কথা ভাবতে ভাবতে—বেলা সাতটা নাগাদ মুরারি হালদারের বাড়ি দিকে রওনা হল প্রবীর।

কারণ আর কিছু নয়—থানার ও-সি গৌরবাবুর সঙ্গে মুরারি হালদারের অত্যন্ত খাতির আছে। তিনি একটু বলে দিলে ছেলেটা হয়তো ছাড়ান পেয়ে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, পুলিসের ঠ্যাঙানি বন্ধ হতে পারে অন্তত।

এই ঠ্যাঙানি যে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য, এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সংশয় নেই প্রবীরের। আজ তিন বছর ধরে রিহার্সাল দেবার পরে প্রতুল এখন পাড়ার বিশিষ্ট মস্তান। এশিয়ার ব্রাইটেস্ট স্কলার হায়ার সেকেণ্ডারী আর দেয় নি, ফীজের টাকা নিয়ে দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেইবারে বাবার প্রথম স্ট্রোক।

দ্বিতীয় স্ট্রোক একটি বালিকা-ঘটিত ব্যাপারে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ছুরির খোঁচা খেয়ে প্রতুল হাসপাতালে গিয়েছিল। বাবা সে স্ট্রোক আর সামলাতে পারেন নি। কারণ সে ভদ্রলোক এশিয়ার উঠতি বেস্ট্ মস্তানের

জন্যে মনে মনে আদৌ তৈরি ছিলেন না খুব সম্ভব।

তারপর থেকে টুলুর বিবিধ কীর্তির ইতিহাস। মারামারি তো আছেই, কয়েকটা বোমাবাজির সঙ্গেও সে জড়িত ছিল, এইরকম জনশ্রুতি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এতদিন পুলিসের নজর পড়ে নি তার ওপর। কিন্তু যে সিগারেটের দোকানটার সামনে টুলু এবং তার ক'টি বন্ধুর আস্তানা ছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে অদূরের কোনো মহিলা কলেজের ছাত্রীদের তারা নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করত—কী কারণে সেই সিগারেটওলার ওপরেই খেপে গেল তারা। ফলে দোকান লুট, সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি, তারপর টুলু এবং তার দু-একটি বন্ধুর হাজত-যাত্রা।

আর এরপরেই মা'র সমস্ত রাত ঘুম নেই। এর জন্যেই মা'র ছায়া-ছায়া শরীরটা আরো অস্পষ্ট। চুল রুক্ষ, চোখের দুধারে শুকনো জলের দাগ। অথচ, এই টুলু মা-কে কী বলত?

'ইউ শাট আপ। অয়েল ইয়োর ওন মেশিন।'

প্রবীর হয়তো চেঁচিয়ে উঠল: 'এই টুলু!'

দাদা কে কোনোদিন খুব ভক্তি করবার দরকার হয় নি প্রতুলের। কারণ, বাবাই বাণী দিয়েছিলেন: 'ও পাস-কোর্সের বি-এ, ওর মগজে কিছু নেই।' সুতরাং দাদার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে—তার স্কিন-টাইট ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে শিস টানতে টানতেই হয় তো বেরিয়ে গেল সে।

চলতে চলতে প্রবীর ভাবল, অদ্ভুত। এই টুলুর জন্যেই মা কাল সারাটা দিন কেঁদেছেন, কাল রাতে ঘুমুতে পারেন নি; আর প্রবীর চলেছে মুরারি হালদারের কাছে, সকালবেলা যে লোকটার নাম করলেও দিনটা বিশ্রী হয়ে যায়!

মুরারি হালদার কী করবে?

থানার ও-সি গৌরবাবুর সঙ্গে খাতির আছে তার। অনুগ্রহ করে সে যদি একখানা চিঠি দেয়, তা হলে চিঠিটা নিয়ে প্রবীর থানায় দৌড়োবে। তার পর এশিয়ার বেস্ট্ স্কলার হয়তো ছাড়া পাবে, হয়তো দারোগা বলবেন, 'আচ্ছা—ওকে আর পিটব না। আর যদি নিতান্তই ঠ্যাঙানোর দরকার পড়ে, একটু ধীরে-সুস্থে পেটাতে বলব।'

সকালের রোদ নরম। আকাশে হলকা হালকা মেঘ। দিনটা স্নিগ্ধ। যে-কোনো একটা স্বপ্নের পথ ধরে গাছের পাতার শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলার মতো দিন।

কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে প্রতুলের জন্যে মুরারি হালদারের কাছে। আর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে থেকে থেকে যন্ত্রণার চমক।

দুই

না—একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোন না মুরারি হালদার।

বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে চাকর বললে, 'একটু বসতে হবে. বাবু পুজোয় বসেছেন।'

এটা একটা খবর। প্রবীর ঠিক তৈরি ছিল না এ জন্যে।

'পুজো করেন নাকি?'

'আগে করতেন না।' চাকরটা একটু চাপা হাসি হাসল কি না ঠিক বোঝা গেল না: 'গত বছর হরিদ্বারে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। সেই থেকেই—'

'বুঝেছি।'

চাকর চলে গেল, মুরারি হালদারের বাইরের ঘরে পুজো শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল প্রবীর।

এ ভালো—এই সব পুজো-টুজো। মনপ্রাণ ঠাণ্ডা হয়, ইষ্টদেবতা খুশি থাকেন, নিজের কাজ-কারবারের দায়িত্ব শ্রীশ্রীঅন্তর্যামীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। আমি কে? নিমিত্ত মাত্র। তোমরা ভালোই বলো আর মন্দই বলো—আমি তো কিছুই করছি না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—

এখন যদি হৃষীকেশ বলেন, মুরারি, লেবারগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে—ওদের আর নাই দিয়ো না—দাও কারখানা বন্ধ করে—মুরারি হালদার দিতে বাধ্য; যদি শ্রীভগবান আদেশ করেন—দাও গুণ্ডা পাঠিয়ে ইউনিয়নের দু-চারটে পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করে—সে আদেশ না মেনে কী করতে পারেন তিনি? যদি অন্তরে এই দৈববাণী মেলে যে কারখানার জন্যে যে সব কেমিক্যালের লাইসেন্স আছে—ভুয়ো হিসেব দাখিল করে সেগুলোকে চোরাবাজারে চালান করো—তা হলে সে নির্দেশ না মানবার আমি কে? জানামি ধর্মং, জানাম্যধর্মং—কিন্তু কী করা যাবে, যথানিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।

এবং গুরু।

এখন সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ আর কোথায় পাওয়া যাবে? বড় মামার কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মতি-গতি ছিল, গুরুর চরণে শরণ নিয়েছিলেন তিনি। বলতেন,

'বুঝলি, গুরু করবার দারুণ সুবিধে আছে একটা। একবার শিষ্য হয়ে যা—তার পর তোর যা কিছু পাপ তাপ তিনিই নেবেন হাত পেতে, তোর গায়ে আঁচটিও লাগবে না।'

তার মানে, গুরু ড্রেনেজ্ নাকি? কিন্তু প্রশ্নটা মামাকে করা যায় নি তখন। মামা অত্যন্ত সিরিয়াস লোক। সেই মামা যখন একতলা স্টেট বাসের হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে অফিসে আসবার সময় ধাক্কা খেয়ে সোজা চলে গেলেন চাকার তলায়, তখন তাঁর হয়ে গুরুই কেন চাপা পড়লেন না—এই জিজ্ঞাসাটা প্রবীরের মনে জেগেছিল। কিংবা সবই হয়তো গুরুর লীলা, তিনিই তাঁকে শর্টকাট করে নিয়ে চলে গেলেন দিব্যধামে।

অতএব মুরারি হালদার গুরু করলেন এবং পুজোয় বসে গেছেন—আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এতে। আর টাকা-পয়সা বেশি থাকলে পুজো-টুজোয় মন বেশ নিবিষ্ট হতে পারে, রেশন-বাজার-মাসের শেষ—এ সবের নিতান্ত বাজে ভাবনাগুলো আর বিরক্ত করতে পারে না তখন।

আধ্যাত্মিক চিন্তার ঘোর কাটিয়ে প্রবীর সামনের টেবিল থেকে ইংরিজি কাগজটা টেনে নিলে। এই কাগজটা এক সময়ে নির্লজ্জভাবে ইংরেজের তাঁবেদারি করত—এইটেই ছিল তখন ব্যুরোক্রেসির আদি এবং অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতা পাওয়ার পর এ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইণ্টেলেকচ্যুয়ালদের মুখপত্র।

সম্প্রতি দেশের জন্যে কাগজটি অতি চিন্তিত। প্রায়ই নানারকম রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেষণ করে যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার দরকার নেই, পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। গোটা বাংলা দেশ এখন আদিগন্ত নরখাদকদের লীলাভূমি, এ কাগজ তিনদিন পড়লেই সে ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকে না।

কাগজটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একবার ভুরু কোঁচকালো প্রবীর। ইয়োলো জর্নালিজিম বলে একটা কথা আছে ইংরিজিতে। কিন্তু কাকে বলে? ঠিক মনে করতে পারল না।

ভারী পায়ের আওয়াজ নামছে সিঁড়ি দিয়ে। প্রবীর চকিত হল। কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখল যথাস্থানে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল

'গাড়িটা বের করতে বল্। একটু পরেই আমি বেরুব।'

এবং ঘরে মুরারি হালদার ঢুকলেন।

'আরে ভুলু যে! কী মনে করে?'

ছেলেবেলা থেকেই চেনেন—পাড়ার লোক। তা ছাড়া ভালো ইংরিজিগর্বিত পুরনো গ্র্যাজুয়েট বাবার ধারণা ছিল, মুরারিবাবুকে আইডিয়াল ভাবা উচিত। সেলফমেড ম্যান। ছিলেন কোন্ স্টিভেডোর ফার্মের কেরানী—সেখান থেকে ত্থাখ্—কোথায় উঠেছেন।

অবশ্য এই উত্থানটা প্রবীরের খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তার বাবা তাঁকে ভক্তি করতেন, দেখা হলেই একগাল হাসিতে নুয়ে পড়ে নমস্কার করতেন—এ কথাটা মুরারিবাবুর মনে আছে।

'কী খবর হে ভুলু?' প্রসন্ন চোখ মেলে চাইলেন তিনি: 'আরে দাঁড়িয়ে পড়েছ কেন, বোসো—বোসো।'

বসবার আগে কয়েক সেকেণ্ড দোটানায় দুলল প্রবীর। সন্দেহ নেই—এ সময় মুরারিবাবুকে দেখলে কেমন শির শির করে ওঠে গায়ের ভেতর, ফস করে একটা প্রণাম করে ফেলাও অসম্ভব নয়। খালি গায়ে নেমে এসেছেন, শ্যামবর্ণ রোমশ বুকে ধবধব করছে সাদা পৈতে, কপালে বেশ বড় একটি সাদা চন্দনের ফোঁটা। হঠাৎ মনে হয়, মুখখানা বেশ জ্যোতির্ময়, এখনো একটা ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যে রয়েছেন।

কিন্তু সেই বেয়াড়া বিরূপতা। একথা কিছুতেই মনে না হয়ে যায় না যে এই লোকটার মুখ দেখলেও সকালটা—

সামনাসামনি ভারী চেয়ারটায় বসে পড়ে মুরারি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু কথা আছে নাকি?'

'আজ্ঞে—' বলতে আত্মগ্লানিতে জিভ জড়িয়ে এল। মা যদি সারাটা জীবন ধরে মার না খেতেন, যদি কাল সমস্ত রাত জেগে চোখের জল না ফেলতেন, তা হলে—তা হলে! থানায় টুলুকে কম্বল ধোলাই দিলেও তার ভাবনার কিছু ছিল না, বরং মনে হত ওটা টুলুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। কিন্তু মা—

'আজ্ঞে, টুলুকে ধরে নিয়ে গেছে, শুনেছেন বোধ হয়।'

'অ, সেই পানের দোকানে মারামারি? টুলুও ছিল নাকি তাতে?'

আত্মগ্লানিটা যন্ত্রণার মতো মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকল একটু।

'কী আর বলব বলুন।'

'আশ্চর্য!' মুরারি ভুরু কোঁচকালেন: 'আশ্চর্য! তোমার বাবা কত যে আশা করতেন ওর ওপরে। ছেলেটা যে কী করে এমন বয়ে গেল!'

ঠিক কথা—কী করে এমন বয়ে গেল টুলু! তার তো কোনো দরকার ছিল না। সে তো সেই সব পরিবার থেকে আসে নি—যেখানে ছিন্নমূল কতগুলো অগোছালো সংসারে প্রত্যেক দিন ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, প্রতিবাদ আর নৈরাজ্য চেতনা জন্ম নেয়—যেখানে ইতিহাস দিনের পর দিন উশুল করতে থাকে তার দেনা। তারা তো উদ্বাস্তু নয়। যত ছোটই হোক, এ তাদের পৈতৃক বাড়ি। বাবা যা চাকরি করতেন, তাতে একটু টানাটানি হয়েও এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট্ স্কলারের জন্যে এম-এ, এম-এসসি পর্যন্ত খরচ চালাতে পারতেন তিনি। অথচ—

অথচ।

আসলে, বাতাসটাই কালো হয়ে যাচ্ছে। কারো নিস্তার নেই। বস্তিতে এপিডেমিক লাগলে পাশের প্রাসাদের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েও ব্যাক-টিরিয়াকে ঠেকানো যায় না।

প্রবীর জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

'ভারী দুঃখের কথা!' মুরারিবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করলেন।

'মা বলছিলেন—' প্রবীর গলাটা পরিষ্কার করল একটু: 'আপনি যদি থানার ও-সি গৌরবাবুকে একটা চিঠি দেন—'

মুরারির চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে এল।

'কেন হে, তোমাদের লোক্যাল এম-এল-এ—'

ছোট্ট খোঁচা একটা। এই এম-এল-এ-টিকে মুরারিবাবুর পছন্দ নয়। তাঁর কারখানার বেয়াড়া শ্রমিকগুলোর সঙ্গে সে ভদ্রলোকের রাজনৈতিক আঁতাত আছে। এবং গত ইলেকশনের সময় প্রবীর তাঁর পোলিং এজেণ্টের কাজ করেছিল, ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও মনে আছে মুরারিবাবুর। তাঁকে এ-সব অনেক খুঁটিনাটি মনে রাখতে হয়—না হলে এমনভাবে ওপরে উঠতে পারতেন না।

প্রবীর একবার ভাবল, এর পরে উঠে পড়া যেতে পারে। কিন্তু মা! কী আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়েই মেয়েরা জন্মায়!

'আজ্ঞে আপনিই তো পাড়ার মুরুব্বী—' গলার স্বরটা নিজের কানেই নির্লজ্জ চাটুকারের মতো ঠেকল: 'মা বললেন, আর কাউকে দিয়ে কিছু হবে না। আপনিই যদি—'

মা এতটা বলেন নি। কিন্তু চারদিকে বাতাসটা কালো হয়ে যাচ্ছে। টুলু কী হয়ে গেল! তাকেও নিচে নামতে হচ্ছে।

'আপনি যদি একটা চিঠি—'

'চিঠির দরকার নেই, ফোনে বলে দেব এখন।'

'তা হলে তো আরো ভালো হয়।'

বলতে ইচ্ছে করল, দয়া করে ফোনটা যদি এখনি করেন! কিন্তু অনুগ্রহের ওপর অতটা চাপ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অনুগ্রহ মুরারি হালদার নিজেই করলেন।

'কিছু ভেবো না হে। তুমি বললে, আমি শুনলুম। এর পরে যা করবার আমিই করব। তা ছাড়া পাড়ার লোক। এ তো আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।' মুরারি গলা তুলে ডাকলেন: 'গাড়ি বের করেছে?'

চাকরটা এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়।

তার মানে মুরারি হালদার এখুনি বেরুবেন। আর তাঁর সময় নষ্ট করা যাবে না। মা তাড়া দিয়ে পাঠিযে ভালোই করেছেন দেখা যাচ্ছে। আর একটু দেরি হলেই ধরা যেত না ত্রাণকর্তাকে।

কিন্তু ফিরে গিযে মা-কে কোনো একটা ভরসা দেওয়া দরকার। নইলে সারাদিন না খেয়ে বসে থাকবেন হয়তো। পৃথিবী জুড়ে মায়েদের এত মমতা, এত চোখের জল। তাতেও চারদিকের সব কালো ধুয়ে-মুছে কেন নির্মল, উজ্জ্বল হয়ে যায় না?

উঠে পড়ে প্রবীর বললে, 'আমি কি আর একবার খবর নেব?'

'দরকার হবে না। বললুম তো, শুনে রেখেছি, এর পরে যা করবার আমিই করব। তবে—' একবার থামল: 'ইচ্ছে করো তো একবার আসতে পারো সন্ধ্যের দিকে।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

বেরিয়ে যেতে যেতে একবার মনে হল, এরপরে একটা প্রণাম করা উচিত ছিল কি না মুরারি হালদারকে, ভক্তির জন্যে না হোক, অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও। আর মুরারি হালদার সেটা প্রত্যাশা করেছিলেন কি না?

কিন্তু নাঃ, কিছুতেই প্রবৃত্তি হল না।

অতএব বাড়ি ফেরা এবং মাকে বিশদ বিবরণ জানানো।

আবার ছায়ায় ভরে গেল মা'র মুখ। হতাশ চোখ মেলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

'তার মানে, ছেলেটাকে আজো ছাড়বে না?'

'আমি কী করে বলব ?'

'হাজতে হয়তো মারধোর করছে, হয়তো খেতেও দেয় না—'

না—মা'র ওপরে বেশিক্ষণ কোমল হয়ে থাকা শক্ত। মুরারি হালদারের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার গ্লানিটা মনের ভেতরে জ্বালা ছড়াচ্ছিল তখনো। সব ওই রাস্কেলটার জন্যে।

'ছাখো মা, সব জিনিসের লিমিট আছে একটা। মস্তানি করবার সময় খেয়াল ছিল না ? উল্লুকটা তো আর নাবালক নয়। খেটে আসুক না মাসকয়েক জেল, ওর পক্ষে সেটা ভালোই হবে।'

মা একেবারে চুপ।

এখন বাড়িতে বসে থাকলে দম আটকে আসতে চাইবে। মা আর কথা বলবেন না, একটা কথাও জিজ্ঞেস করবেন না আর, শুধু যুক্তিহীন স্নেহ আর বোবা দুঃখের ভার নিয়ে বাড়ির সব আবহাওয়াটাকে ভারী করে তুলবেন আরো। অসম্ভব, সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়া ভালো।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো একবার।

'এখন সাড়ে ন'টা। আমি একটু বেরুচ্ছি মা। ঘণ্টা দুই পরে ফিরে আসব।'

মা সেই হতাশ গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

রবিবারের পথ। কলকাতা ফাঁকা। বাইরে থেকে কত মানুষ পেটের দায়ে বাকী ছ'টা দিন পথে পথে ভিড় জমায়, এই ছুটির দিনে খানিকটা আন্দাজ করা যায় তার।

বাসের দরকার ছিল না। ঢাকুরিয়া থেকে রেল লাইন পেরিয়ে একটু সোজা পথে এলেই বালিগঞ্জ। তারপর সাদার্ন অ্যাভিনিউর উদার ফুটপাথ ধরে খানিকটা হাঁটলে বাঁ-দিকে সেই পরিচ্ছন্ন রাস্তাটা। বাড়িগুলো সুন্দর, গাছগুলো নতুন সতেজ পাতায় ঝিরঝিরে।

এই রাস্তায় দিদির ফ্ল্যাট। পুব-দক্ষিণ খোলা। 'খুব একটা বেশি নয়—ভাড়া মোটে সাড়ে পাঁচশো—' মণীশদা বলেছিল একবার। মণীশদা তাদের ভগ্নীপতি।

ভাই-বোনদের ভেতরে দিদিই বুদ্ধিমতী সবচাইতে। কলেজে পড়বার সময় এক বছরের সিনিয়ার মণীশদাকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে। দিদির হিসেবী

চোখ। সে দেখেছিল, মণীশদার বাবা বেশ জাঁদরেল অ্যাটর্নি, মণীশদা নিজেই একটা গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসে। চেহারা মোটা, গোলগাল, বেঁটে, এখনই মাথায় টাকের আভাস। তা ছাড়া দিদির চেহারা ভালো, বেশ ভালো। একটু-আধটু নাচও শিখেছিল।

সাক্ষী কাজেই সে মণীশদাকে বিয়ে করে ফেলল। বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে, নিয়ে খেয়ে, খবরের কাগজ খুলে, তা থেকে দুটো-একটা ভুল ইংরিজি বের করবার আনন্দন চর্চার মধ্যে ছিলেন। এমন সময় দিদি মোটর থেকে নামল মণীশদার সঙ্গে।

'আশীর্বাদ করুন বাবা, আমরা বিয়ে করেছি।'

সিভিল ম্যারেজ হলে কী হয়, দিদি অনুষ্ঠানের ত্রুটি করে নি। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও টেনে এসেছিল একটা।

ইন্টেলেকচুয়াল বাবাও এতটার জন্যে তৈরি ছিলেন না। প্রথমে গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল তাঁর। তারপর বললেন, 'ও! তা বেশ—বেশ!'

অন্তঃপুরে 'ইডিয়ট' মা একটু কেঁদে ফেলেছিলেন।

'কায়েত-বদ্যি হলেও কথা ছিল, এ যে একেবারে—'

বাবা বললেন, 'চোপরাও।'

কাঁটা যে তাঁরও বিঁধছিল না তা নয়, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়্যাল হওয়ার ল্যাঠা অনেক। সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে কঠিন ভাষায় ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু নিজের ওপর ঘা-টা এসে পড়লে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা লাগে প্রথমটায়।

দিদির হিসেবে ভুল হয় নি। মণীশদাও অ্যাটর্নি। উত্তর কলকাতার সেকেলে বনেদী বাড়িতে লোকের কিচির-মিচির, ব্যাকডেটেড্ চাল-চলন বেশিদিন ভালো লাগল না। দিদিই ভালো লাগতে দিল না খুব সম্ভব।

তারপর দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাট। বেশি নয়—ভাড়া মাত্র "সাড়ে পাঁচশো"! মণীশদার মতে "র‍্যাদার চীপ"। নতুন গাছের সতেজ পাতায় ঝিরঝির শব্দ। ছমছাম পথ, সুঠাম বাড়ির সার। দু' পা বাড়ালে সাদার্ন অ্যাভিনিউ। তারপর লেক।

কী তফাত তাদের ঢাকুরিয়ার সঙ্গে! সেখানে কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঘরবাড়িগুলো যেন এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গাছগুলো পর্যন্ত বুড়োটে, তাদের ডালে কাকের বাসা।

দোতলায় দিদির ফ্ল্যাটে ওঠবার আগে সামনের সাদা দেওয়ালে একবার চোখ

পড়ল তার। কতগুলো কালো কালো প্রকাণ্ড অক্ষর। নিষ্কৃতি নেই—এখানেও না।

"নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও—"

"শ্রীকাকুলম্ জিন্দাবাদ—"

প্রবীর একটু হাসল। উঠে গেল তেতলায়।

মস্তবড় সিটিং রুমে তখন রেডিয়োগ্রামে বাজছিল 'অলিভারে'র গান। তার তালে তালে নাচছিল দিদির বড় মেয়ে টিনটিন।

তিন

দরজার গোড়ায় একটু দাঁড়িয়ে পড়ল প্রবীর।

দিদির মেয়ে 'অলিভারে'র নাচ নাচছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু বেছে বেছে ফ্যাগিনের নাচটা কেন? সোনার চামচে মুখে করে যে জন্মেছে, তার তো পকেট মারতে শেখাটা খুব জরুরি কাজ নয়।

মণীশদা তখনো সকালের কাগজটা পড়ছিল, দিদি একটা সচিত্র মহিলা পত্রিকা কোলের ওপর রেখে বেশ মনোযোগের সঙ্গে নাচ দেখে যাচ্ছিল টিনটিনের। দিদির চোখে বেশ উৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছিল, পায়ের চটিতে তাল পড়ছিল, বোঝা যাচ্ছিল দিদিরও মনে মনে নাচটা চলছে।

ছুটির সকাল। বেশ একটি পরিতৃপ্ত স্বচ্ছন্দ দিন। খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণের হাওয়া সাঁতার কাটছে ঘরে। একফালি রোদ এসে পড়েছে দেওয়ালের এক-খানা অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্টের ছবির ওপর। ছবিটা প্রবীর বোঝে না—দিদি কিংবা মণীশদা যে বোঝে তাও নয়। তবু ও-সব এক-আধখানা রাখতে হয় ঘরে—নইলে ঠিক রুচির পরিচয় দেওয়া যায় না। দেওয়ালের আর একদিকে রবীন্দ্র-নাথ—বিষণ্ণ এবং গম্ভীর।

এমন একটি রমণীয় পারিবারিক আসরে—এই সংস্কৃতি-চর্চার ভেতরে, দাড়ি না-কামানো মুখ, আধ-ময়লা জামা-কাপড় এবং যে জুতোটাকে আর কিছুতেই পরা উচিত নয়, সেটা পায়ে গলিয়ে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে কি না প্রবীর একবারের জন্যে তা ভাবল। কিন্তু তার আগে দিদির চোখ পড়ল তার ওপর।

'কে, ভুলু? আয়—আয়।'

হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলে রেডিয়োগ্রামটা।

মণীশদা কাগজ সরিয়ে তাকালো। অনিচ্ছায় পা থামল টিনটিনের।

'এসো হে—এসো। খবর-টবর কী ?' মণীশদা ডাকল।

আসরটা নিশ্চয় মাটি হয়ে গেল, কিন্তু এখন আর করবার কিছুই নেই। সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মতো বেয়াড়া জুতোটা পায়ে দিয়ে এবং দাড়ি না-কামানো মুখ নিয়ে প্রবীর ঢুকে পড়ল। তারপর সামনের সোফায়।

'খবর আর কী—এমনিই দেখা করতে এলুম।'

'মা ভালো আছে ?' দিদির জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ, ভালোই আছেন।'

'টুলু ?'

এক পলকের জন্যে নরম সোফার ভেতরে শক্ত হয়ে গেল প্রবীর। বলা উচিত হবে ? এই পুব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাটের এমন সাংস্কৃতিক নির্মল আব-হাওয়ার মধ্যে বলা যায় কথাটা ? বলা যায় যে, মস্তান প্রতুল একটা পানের দোকানে মারামারি করে এখন হাজতে ? এবং সে এক্ষুনি এল মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করে—যাতে সে ছাড়া পায়, নেহাৎ পক্ষে থানার ও-সি তাকে কম্বল-ধোলাই না দেন ?

কী লাভ বলে ? এদের কিছু আসে যায় না। সেই বিজয়ার সময় একবার মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। তারপর এই ক'মাসের মধ্যে কোনো খবর নেয় নি আর।

'টুলু ?' আস্তে আস্তে জবাব দিলে : 'হ্যাঁ, সেও ভালো আছে।'

মণীশদা বললে, 'পড়াশোনা তো আর করল না।'

'না। বলে,' যে দেশে হাজার হাজার এন্‌জিনীয়র বেকার, সেখানে এডু-কেশনের কোনো মানেই হয় না।'

'হুঁ, চরম জ্ঞানের বাক্য—' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল মণীশদা, তারপর টেবিল থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ঠোঁটে পুরল। 'এ-সব জ্ঞান লাভ হলেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে চেয়ার-ডেস্ক ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়, তারপর সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ।'

'তুমি থামো—' দিদি ঝনঝন করে উঠল : 'এগুলো পড়াশুনো না করবার ফন্দী ছাড়া কিছু নয়। আগে বেরিয়েই আসুক না এন্‌জিনীয়র হয়ে—তারপর যদি চাকরি না পায়, তখন আন্দোলন করুক।'

না—টুলুর জন্যে ওকালতির কিছু নেই। চাকরি পাব না—এ কথা ভেবে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয় নি। তাকে ডেকে নিয়েছে সেই অন্ধকার—যাকে আমরা কেউ চাই নি, অথচ ইতিহাসের দেনা যাকে আপনিই ঘনিয়ে এনেছে। কিন্তু সে প্রশ্ন নয়। দিদির বলার ঢংটাই খারাপ লাগল।

'যারা আন্দোলন করছে—মানে সে-সব এন্‌জিনীয়র এখনো বেকার, তাদেরই কি খুব সুবিধে হচ্ছে দিদি?'

একটু অস্বস্তি বোধ করল দিদি। ঠিক এইরকম একটা পাল্টা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না।

চুরুটটাকে গালের এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিলে মনীশদা।

'লেট মী আনসার দিস কোয়েশ্চন অন হার বিহাফ। আই নো প্রবীর, তোমার একটা লেফটিস্ট টেনডেনসি আছে। তুমি আগে আমার এই প্রশ্নটার জবাব দাও। চাকরির সোর্সগুলো যদি নিজেরাই বন্ধ করে দাও—এমপ্লয়মেণ্ট সমস্যার সমাধান কী করে হবে বলতে পারো?'

'খুলে বলুন।'

এই অতি বিরস আলোচনায় টিনটিনের বিরক্তি লাগছিল। সে বাধা দিলে মাঝখানটায়।

'আইসক্রীম খাবে বড় মামা?'

আইসক্রীম! সব কটা চোখ ঘুরে গেল টিনটিনের দিকে। প্রবীর হাসল।

'হঠাৎ আইসক্রীম কেন রে?'

'আমি নিজে তৈরি করেছি যে। নিয়ে আসব ফ্রীজ থেকে?'

'ও তোরাই খা। আমার একটা দাঁত কনকন করছে ক'দিন ধরে, ওতে সুবিধে হবে না। বরং একটু চা খাওয়াতে পারিস।'

দিদি বললে, 'মঙ্গলকে একটু চা করতে বলে দাও টিনটিন।'

'বলছি—' ওড়না উড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে টিনটিন বেরিয়ে গেল।

একটু অন্যমনস্ক হল প্রবীর। একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি যেন। দিন চারেক আগে—রাত নটা নাগাদ—পার্ক স্ট্রীটে? তখন তার ভাবনা অন্যদিকে ছিল, একটা ছায়া যেন পড়েছিল চোখের ওপর, মনে পড়ে নি। এখন সবটা যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ রেখায় ফুটে উঠল, সব বিস্বাদ হয়ে গেল, অত্যন্ত বিশ্রীভাবে সে অনুভব করল, সেই মেয়েটি টিনটিনই বটে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটা—

মণীশদা আবার শুরু করল, 'তোমরা রাতদিন ঘেরাও করবে—কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, কনস্ট্যান্ট লেবার-ট্রাব্‌ল। ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অন্য স্টেটে। মহারাষ্ট্র তো আছেই, পাঞ্জাব-হরিয়ানা কিভাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ডেকে নিচ্ছে, দেখছ তো? ফার্মগুলো বন্ধ করে দেবে—অথচ বেকার এন্‌জিনীয়রের চাকরি চাই—এ তো মন্দ রসিকতা নয় হে!'

'মণীশদা—বাংলা দেশে না হয় ঘেরাও শুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু প্রব্‌লেমটা যে তার অনেক আগেই জট পাকিয়েছে—একথা আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়।'

দিদি বিরক্ত হযে উঠল: 'থাম্‌ তো বাপু, কী কচকচি আরম্ভ করলি তোরা। রাতদিন এসব শুনছি কানের কাছে, মাথা ধরে গেল। হ্যাঁ রে, টুলুর কি এইভাবেই চলবে নাকি?'

মণীশদা একটু হেসে আবার তুলে নিলে কাগজটা। প্রবীর বললে, 'আমি জানি না। তুই-ই জিজ্ঞেস করিস ওকে।'

'জিজ্ঞেস করব যে, পাচ্ছি কোথায় ওকে?'

প্রবীর চুপ করে রইল।

দিদির ভুরু দুটো জুড়ে এল একসঙ্গে: 'ভাবতেই পারা যায় নি, ওটা বয়ে যাবে এভাবে। অথচ, বাবা কত আশা করতেন ওর ওপরে। লেখাপড়ায় এমন জ্ঞান ছিল—'

হয় তো ছিল। কিন্তু বাবা যে ভাবতেন প্রতুল একেবারে আইনস্টাইন হয়ে উঠবে, স্কুলের নীচু ক্লাসের রেজাল্ট থেকে সেটা প্রমাণ হয় কি না বলা শক্ত। আসলে যে-বাবা নিজেকে ইণ্টেলেকচুয়াল ভাবতেন. ইংরিজি খবরের কাগজ খুলে তা থেকে ভুল বের করবার চেষ্টা করতেন, তিনি যে শুধুই এ-জি বেঙ্গলে একজন সিনিয়র ডিভিশন ক্লার্ক—এই গ্লানিটা তাঁর মন থেকে কিছুতেই যেত না। তাই প্রতুল লেখাপড়ায় একটু ভালো—এই সম্ভাবনাটাতেই তিনি নিজের মনের মতো করে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বেলুনের মতো গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের বেলুনটা টিকল না বেশিক্ষণ—বাবার অতিরিক্ত প্রশ্রয়েই ফেঁসে গেল সেটা।

প্রবীরের চটক ভাঙল। ঝাঁঝালো গলায় দিদি কিছু বলছিল।

'বাবা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা এমন হোপ্‌লেস্‌—'

প্রবীরের বুকে ব্যথা চিনচিন করে উঠল একটা। বাবার আর একটি দান। রাতদিন নিরীহ নির্জীব মাকে শুনিয়েছেন: 'তুমি কিছু বোঝো না—তুমি

একটি ইডিয়ট।' সেই শিক্ষাটা পুরো নিয়েছে দিদি—মাকে চিরকাল অবজ্ঞা আর অনুকম্পা করে এসেছে, সেই জন্যেই বাবার মৃত্যুর পর টুলু এত বেপরোয়া। আর দাদা—বাবার ভাষ্যে সে তো ডালার্ড—কে তাকে আর গ্রাহ্য করে?

বাবা আর একটু কম ইন্টেলেকচুয়াল হলে ভালো করতেন।

দিদি বলে যাচ্ছিল, 'মা এমন হোপ্‌লেস্ যে ছেলেটাকে একটু কন্ট্রোল পর্যন্ত করতে পারল না!'

বিরসভাবে প্রবীরের বলতে ইচ্ছে করল: মা তো সংসারে চিরদিন ছায়ার মতো আড়ালে থাকলেন—তাঁকে মিথ্যে টেনে আনছিস কেন? টুলুর কন্টোল বিগড়ে দেবার পক্ষে বাবা আর তুই-ই যথেষ্ট। কিন্তু বললেই দিদির মুখ ছুটবে, আরো একরাশ গালাগাল করবে মাকে। কখনো কখনো দিদি আশ্চর্য রকমের নিষ্ঠুর হতে পারে। কী লাভ মা'র অপমানের বোঝা বাড়িয়ে?

মণীশদার যে আলাদা কোনো মত এ ব্যাপারে আছে তা নয়। সে বুদ্ধিমান মানুষ—অ্যাটর্নি—লাভ-ম্যারেজের মুগ্ধতা নিয়ে দিদিকে আগে ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু বিয়ের পরে নিশ্চয় বুঝেছে যে, দিদির সঙ্গে যত বেশি একমত হওয়া যায়, সংসার এবং শান্তি ততই বেশি নিরাপদ।

কিন্তু শ্যালকের সামনে—গলা খুলে শাশুড়ীর এই নিন্দা—তার চক্ষুলজ্জায় বোধ হয় একটু বাধল।

'আঃ উমা, কী বকছ! এভাবে বলা ঠিক নয়।'

দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠল: 'তুমি চুপ করো। এগুলো আমাদের বাড়ির ব্যাপার, তোমার কন্‌সার্ন নয়।'

মণীশদা বললে, 'কিন্তু—'

'থামো না। আসল কথা কী জানো? ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দিতে হয়। আর সে ট্রেনিংয়ের ভার থাকে মার হতেই। মাতৃদোষেণ মূর্খতা—কারেক্ট।'

তা হলে টিনটিনের ট্রেনিং দিদির হাতেই হচ্ছে—নিঃসন্দেহ। বিলিতী স্কুলে পড়ছে, জুনিয়র কেমব্রিজ দেবে। কিন্তু—কিন্তু ওই অস্বস্তিটাই কাটছে না। বয়েস এখনো পুরো পনেরো হয় নি বোধ হয়, কিন্তু—প্রবীরের কপাল কুঁচকে এল: রাত নটার পরে—পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁ থেকে—একটা ছোকরার হাত জড়িয়ে—কিংবা কে জানে, এও হয়তো দিদির ট্রেনিংয়ের অংশ!

মঙ্গলের হাতে ট্রে এল। দিদির বক্তৃতা থামল।

চা তৈরি করে এগিয়ে দিয়ে দিদি বললে, কিছু খাবি? ভালো কেক আছে।'

'না দিদি, খিদে নেই।'

মণীশদা আবার কাগজ নামালো কোলের ওপর।

'তারপর ব্রাদার, তোমাদের যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্টের খবর কী?'

'তোমাদের বলছেন কেন? ফ্রণ্ট যাদেরই হোক, গভর্ণমেণ্ট তো সকলেরই।'

'না হে, সকলের গভর্ণমেণ্ট নয়। এরা কৃষক আর শ্রমিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বাকি সবাই এদের হিসেবে একেবারে আগাছা।'

আবার খানিক বিরস তর্কের সূচনা।

চুরুট নিবে গিয়েছিল, ধরাতে ধরাতে মণীশদা বলে চলল, 'তোমরা তো আমাদের স্বর্ণ-দিগন্ত দেখেছিলে হে। ভেবেছিলে তিন মাসের ভেতরেই দেশ একেবারে আলোতে ঝলমল করে উঠবে। এখন তো দেখছি নিজেদের কামড়ানো ছাড়া আর কোনো প্রোগ্রাম নেই তোমাদের।'

'আমাকে টানছেন কেন? দেশের অধিকাংশ লোকই আশা করেছিল।'

'আশা মিটেছে?' চশমার ফাঁক দিয়ে মণীশদার চোখে বিদ্রূপ ঝিকমিক করতে লাগল: 'যা শুরু করেছ তোমরা—তোমাদের যৌথ দেশসেবা তো গঙ্গাযাত্রা করল বলে।'

'অন্যেরা তো অনেকদিন চালালেন মণীশদা! তাঁরা নির্ভুল ছিলেন না—এঁদেরও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।'

'সব ভেঙে-চুরে?'

'হয়তো তারও দরকার আছে। ভুলের ভেতর দিয়ে নিজেদের চেনা যায়।'

'কিন্তু ভুলগুলো বড্ড কস্টলি, ব্রাদার। দেশ জুড়ে যা চলছে, স্রেফ খুনোখুনি। সাধে কি তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন—'

'মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা ব্যক্তিগত, কিংবা তাঁর দলের। ও থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।' ভেতরে ভেতরে উত্তাপ বোধ করতে লাগল প্রবীর: 'মণীশদা—সময়ের চেহারাটা বড্ড তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সমস্যাগুলো নিষ্ঠুর আর বাস্তব হয়ে উঠছে, তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে সব, পথ জটিল হচ্ছে—যারা নেতৃত্ব নিচ্ছে তারাও সমস্তটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। অনেক অন্যায় তো জমে গিয়েছিল, তার দাম দিতে হবে, ঠেকে শিখতে হবে বার বার।'

'বার বার?' মণীশদা কুটিলভাবে হাসল: 'ভাবছ এবার ফ্রণ্ট ভাঙলে আবার এরা ভোট পাবে?'

'ফ্রণ্ট যে ভাঙবেই, আপনি কী করে জানলেন?'

'আমাদের জানবার দরকার কী—তোমাদের লীডাররাই তো গলা খুলে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। এই তো স্বয়ং তোমাদের—'

দিদি আবার বাধা দিলে বিরক্ত হয়ে।

'উঃ, আবার সেই পলিটিক্সের কিচির-মিচির। ও-সবে কিছু হবে না। দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তাই যাবে। নে ভুলু, মুখ বন্ধ করে চা খা এখন। একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

এই দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, নিশ্চিন্ত বসবার ঘরটিতে দিদিই সভাপতি, তার কথাই চূড়ান্ত। মণীশদা আবার একটু হেসে খবরের কাগজটা তুলে নিলে। খুব সম্ভব শরিকী-সংঘর্ষের কোনো বিবরণ পড়তে লাগল প্রসন্ন মনে। চা-টা নিশ্চয় ভালো, কিন্তু কোনো স্বাদ পাচ্ছিল না প্রবীর। আজকের সকালটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মণীশদা স্বগতোক্তির মতো একবার পড়ল: 'ওয়ান স্পীয়ার্ড টু ডেথ—হাউসেস গাটেড—'

দিদি কান দিলে না সেদিকে।

'টুলুকে একবার আসতে বলিস তো আমার কাছে।'

'আচ্ছা—ফিরে এলে বলব।'

'ফিরে এলে মানে?' দিদি কৌতূহলী হল: 'গেছে নাকি কোথাও?'

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে হল প্রবীরকে।

'মানে বাড়ি ফিরে এলে বলব।'

'বলিস। বেশ তো ছিল, কিন্তু কী যে হল লক্ষ্মীছাড়াটার—এভাবে বয়ে যাবে ভাবাই যায় নি। আসলে মা'র যদি ব্রেন বলে কিছু না থাকে—'

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে প্রবীর বললে, 'দিদি, আজ উঠি। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

পথে রোদের ধার বাড়ছে। সাদার্ন অ্যাভিন্যুর বাড়িগুলোরও নিস্তার নেই—'নকশালবাড়ির লাল আগুন', 'শ্রীকাকুলম', 'চেয়ারম্যান মাও', 'সশস্ত্র বিপ্লব'। রোদে লেখাগুলো ক্রোধের মতো জ্বলছে।

দেশ। অনেক ঋণ জমে উঠেছিল, অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে শোধ করবার পালা। সেদিন আসছে—আসবেই। কিন্তু কী হবে সেই ঋণশোধের চেহারাটা? কাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ? কী ভাবে?

চলতে চলতে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু। একটা ছোট শোভাযাত্রা।

'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট চলছে—চলবে—'

চলছে—চলবে? ঠিক কথা, চারদিকে ভাঙনের রেখা। অতি বড় আশাবাদী সমর্থকদেরও মন জুড়ে ছায়া। তবু আশা ধরে রাখতে হয় শক্ত মুঠোতে। জীবন তাই। হার মানতে সে জানে না।

কী থাকবে—কী যাবে কে বলতে পারে এই কাল-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে? কিন্তু সব দুঃখ, সব ক্রোধ, সমস্ত যন্ত্রণা—আর—আর হয়তো অনেক অপচয়ের রক্ত—একদিন কোথাও না কোথাও এসে সংহত হবে। অনেক নেতৃত্ব উড়ে যাবে ঝড়ের পাতার মতো, এই কঠিন—অতি কঠিন কালটাকে যারা মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না—যারা দিশেহারা—ইতিহাস তাদের কোন্ অন্ধকারে যে ঠেলে দেবে, কেউ জানে না। খুব বড় একটা কিছুকে পেতে গিয়ে অনেক কিছু হারাতে হবে—কিন্তু না হারিয়ে কারা কী পেয়েছে কোন্‌দিন?

রোদ বাড়ছে, পায়ের জুতোটায় অস্বস্তি, জ্বালা করছে মাথার ভেতরে। আচ্ছা—টুলু তো রাজনীতি করতে পারত? যদি সব কিছুর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জেগে থাকে, বেশ তো—নিজের জায়গা করে নিতে পারত যে-কোন একটা দলে? বলতে পারত—এ চলবে না, একে বদলাব?

কিংবা তারও চেয়ে সোজা নৈরাজ্যের রাস্তা। তার আকর্ষণ বেশি, প্রলোভন বেশি। হয় লড়ো, নইলে ডুবে যাও অবক্ষয়ের অন্ধকারে। অন্ধকারটাই সহজে হাতছানি দেয়। বিপ্লবের বিকল্প বিকার।

'প্রবীরদা?'

প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের বাস স্টপে স্বপ্না।

'কিরে—এ সময় এখানে?'

'একটু কাজে এসেছিলুম এদিকে। তুমি কোথায় চললে?'

'দিদির বাসায় এসেছিলুম। বাড়ি ফিরব এবার।'

'সবাই ভালো?'

'চলছে—' বলতে গিয়ে প্রবীর একবারের জন্যে ঠোঁট কামড়ালো: 'তোদের খবর কী?'

'এক রকম—' একটু বিষণ্ন হল স্বপ্না: 'তবে ছোটদা অ্যাবসকনড্ করে আছে।'

'বুঝেছি।'

ছোটদা—অর্থাৎ আনন্দ রাজনীতিতে চরমপন্থী। সে জানে, পার্লিমেণ্টারী পলিটিক্সে কিছু হবে না—ওগুলো সব ভাঁওতা। সে কলেজ ছেড়ে চলে গেছে গ্রামে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'মার্ডার চার্জ আছে ওর নামে।'

'বুঝেছি।'

'আমাদের জন্যে ভাবছি না—,' স্বপ্না আবার আবছা স্বরে বললে, 'কষ্ট হয় বাবার জন্যে।'

সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই—কী বলা যাবে? অনেক দাম অনেককে দিতে হবে—কে জানে কোন্ পথে, কী ভাবে একদিন শোধ হবে এতকালের সমস্ত দেনাগুলো।

রোদ ধারালো। সামনের দেওয়ালে আধছেঁড়া একটা পোস্টার উড়ছে হাওয়ায়। ময়দানে কবে যেন বিরাট জনসমাবেশ ছিল, তারই ঘোষণা। স্বপ্নার কপালে কয়েকটা ঘামের বিন্দু।

'যাব একদিন তোদের বাসায়।'

'নিশ্চয় যেয়ো।'

স্বপ্নার বাস এসে পড়ল।

'চলি প্রবীরদা—'

'আয়।'

বাস চলে গেলে আরো কিছুক্ষণ ধারালো রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর, তার মাথাটা আরো বেশি জ্বালা করছিল। সে জানে। এই মেয়েটা টুলুকে ভালবেসেছিল।

রাস্কেল! দাঁতে দাঁত ঘষে স্বগতোক্তি করল প্রবীর: 'রাস্কেল! এই রকম এক টুকরো উজ্জ্বল ভালোবাসাই তো যে-কোনো জীবনকে বদলে দিতে পারে—তুই কি অন্ধকার ছাড়া পথ খুঁজে পেলি না আর?'

চার

বাগানে একটি ফুলও বাঁচানো শক্ত। নীচু প্রাচীর টপকে ছেলেপুলেরা যা সামনে পাচ্ছে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। গন্ধরাজ গাছটায় প্রথম কুঁড়ি এসেছিল, শিব-

প্রসাদ কদিন ধরেই ফুল ফোটবার অপেক্ষা করছিলেন। কাল সন্ধ্যায় দেখে-ছিলেন বসন্তের হাওয়ায় দুটি কুঁড়ি একটু একটু পাপড়ি মেলেছে, কাছে মাথা নামিয়ে আনতে শান্ত একটুখানি মৃদু গন্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁকে। সকালে ফুল দুটির সন্ধানে এসে দেখলেন তারা নেই—ডালটাই যখন মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গেছে। সে ডালে আরও দু-তিনটি কুঁড়ি ছিল।

বুকের ভেতরে ঘা লাগল একটা। বিমূঢ় বেদনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

সেই ছোট ছোট ছেলেরা। নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ঘরের সন্তান সব।

চারদিকের বঞ্চনার মধ্যে জন্মেছে। উদ্বাস্তু সব পরিবারের ছন্নছাড়া উপনিবেশের ভেতর। জোড়াতালি দেওয়া দুঃখের সংসার। কারো একটা নামমাত্র দোকান, কারো যৎসামান্য চাকরি, কারো উঞ্ছবৃত্তি। অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, অভাব, যন্ত্রণা। প্রাণপণে ভালো হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেও সব সময় অন্ধকারের দরজা খোলা যায় না। সমাজবিরোধী শক্তিগুলো এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পায় বলে পুলিসের ধারণা।

কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না শিবপ্রসাদের। একটা নিরুপায় পরাভবের মতো মনে হয়। উনিশশো চব্বিশ থেকে উনিশশো ছেচল্লিশ। চোদ্দ বছর বয়সে নন-কো-অপারেশন দিয়ে শুরু করেছিলেন, "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে শেষবার জেল খাটলেন। বুকের ভেতরে ধক-ধক করে একটা আলো জ্বলত তখন, মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের অভয়বাণী: বীরের রক্তস্রোত, মায়ের চোখের জল কিছুই মিথ্যে হবার নয়। বিশ্বের ভাণ্ডারীর খাতায় ঋণ শোধের হিসেব-নিকেশ আসতে আর দেরি নেই।

সে ঋণ শোধ হল তারপরে। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে।

গন্ধরাজ গাছটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন শিবপ্রসাদ। মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গেছে ডালটা। অন্তত ফুল দুটো নিয়ে কুঁড়িগুলো রেখে যেতে পারত। কিছুই রাখে নি। এই নয়-দশ-এগারো-বারো বছরের ছেলেগুলো এর মধ্যেই জেনে গেছে—কোথাও কোনো ফুলকে ফুটতে দেওয়া যাবে না। তারা জন্মা-বার আগেই তাদের মূলে যারা কীট ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের এই সৌখিন বিলাসিতা অসহ্য।

কী করেছে এই ফুলগুলো নিয়ে? উত্তর পাওয়ার জন্যে বেশি কষ্ট করতে হবে না শিবপ্রসাদকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই দেখতে পাবেন

ফুলগুলোকে কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিয়েছে কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ জমাট জলের ভেতরে। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে তাঁর।

ওরা ফুল ছিঁড়ছে না, প্রতিহিংসা নিচ্ছে। প্রতিহিংসা নিচ্ছে শিবপ্রসাদের ওপর।

হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন ওই দলে। উনিশশো চব্বিশ থেকে উনিশশো ছেচল্লিশ পর্যন্ত। বার সাতেক জেল খাটলেন। এই জন্যে? এই জন্যেই কি?

কিন্তু দাম কি তিনিও দেন নি? বাড়ি-ঘর, দেশ?

শিবপ্রসাদ বারান্দায় উঠে এলেন। আজকাল কী যে হয়েছে, একটুখানি রোদের তাপও সইতে পারেন না—গায়ের মধ্যে জ্বালা করতে থাকে, মাথা ধরে ওঠে। অথচ এক সময় দিনে কুড়ি-বাইশ মাইল হেঁটে পাড়ি দেওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তাঁর কাছে—আগুন-ঝরা জ্যৈষ্ঠের রোদও তাঁকে ছুঁতে পারত না—তিনি দেশের কাজ করতেন।

দেশ!

পুরনো ঈজি-চেয়ারটায় শুয়ে পড়ে ভাবলেন: দেশ! কিন্তু এই দেশের কোনো চেহারা কি স্পষ্ট ছিল তখন? আইডিয়া, স্বপ্ন, বিশ্বাস! রবীন্দ্রনাথের গান: 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।' উনিশশো তিরিশের সত্যাগ্রহী বাহিনীর আগে আগে তিনিই গাইতে গাইতে চলেছেন:

'ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—
ইসি ঝাণ্ডেকো নীচে নির্ভয়
বোলো—ভারত মাতাকে জয়—'

তখন ভারতমাতার সেই রঙিন ছবিটা মনের মধ্যে। মাথায় হিমালয়ের মুকুট জ্বলছে। পায়ের তলায় রক্তপদ্ম হয়ে ফুটে আছে সিংহল; একটি বরাভয় কর উদ্যত রয়েছে কচ্ছকে স্পর্শ করে—আর একটি বাংলাদেশের ওপর প্রসারিত হয়ে রয়েছে—মুঠোয় ধরা শস্যের মঞ্জরী। তলায় লেখা 'ভারতলক্ষ্মী'।

সেই ছবিটা এখন কোথায়?

তার উত্তর এই গন্ধরাজের পাপড়িগুলো দিতে পারে। সেই ছবিটা এখন টুকরো টুকরো হয়ে ভাসছে কাঁচা নালাটার খানিকটা আবদ্ধ দুর্গন্ধ জলের ওপর। ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু কলোনিগুলোর দিকে তাকিয়ে সব কিছুকে বিকট একটা ঠাট্টার মতো মনে হয় এখন।

নিজের ভাবনার গতিতে শিবপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পাশের ঘরে

তাঁর নাতি—বড় ছেলে স্বরাজের একমাত্র সন্তান—আট বছরের নীলাঞ্জন সুর তুলে স্কুলের পড়া করছে। শিবপ্রসাদ ডাকলেন, 'নীলু!'

'আস্‌তাছি দাদু।'

ছেলেটা বেরিয়ে এল। নাম নীলাঞ্জন। কিন্তু গায়ের রঙ ফর্সা, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। অপুষ্ট রোগা চেহারা, চোখ দুটো ভীরু আর কোমল। আস্তে আস্তে দাদুর ঈজি-চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'দাদু—ডাক্‌লা আমারে?'

একদা জেলখাটা স্বদেশী, দু' বছর আগেও সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার ঠাকুর্দাকে সে তুমিই বলে। এই সম্পর্কটাই গড়ে উঠেছে প্রথম থেকে।

দাদুর অদ্ভুত একটা মমতা হয় বাচ্চাটার দিকে তাকালে। রোগা, শান্ত, ভালোমানুষ। সামান্য দোষে মা-বাপের কাছে এক-আধটা চড়-চাপড় খেলে চুপ করে এক কোণায় গিয়ে বসে থাকে। জ্বরে গা পুড়ে যায়, মুখ টকটকে লাল, তবু একটা শব্দ করে না কখনো। এই শান্ত, নিরীহ ছেলেটা চারদিকের এই জীবনের মধ্যে কোথায় দাঁড়াবার জায়গা পাবে—যেখানে জীবন ক্রমশ আরো নিষ্ঠুর, আরো কঠোর, আরো জটিল হয়ে উঠছে?

একটু চুপ করে থেকে শিবপ্রসাদ বললেন, 'জানোস, গন্ধরাজ ফুল দুইটারে ছিঁড়্যা লইয়া গ্যাছে। ডালটারেও ভাইঙা নিছে।'

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল নীলু। এই ফুলের পরিচর্যায় সে-ই দাদুর প্রধান সহকারী। জল যুগিয়ে দেয়, খুরপি এনে দেয়, মধ্যে মধ্যে পরম আনন্দে এসে জানায়: 'দাদু, দেইখ্যা যাও—আট-দশটা দো-পাটির গাছ উঠছে।' শিবপ্রসাদ জানেন, নীলুই তাঁর সমব্যথী।

নীলু ম্লান গলায় বললে, 'জানি দাদু। ভোরে উইঠাই আমি দেখছি। তুমি তখন পূজা কর্‌তাছিলা, তোমারে কই নাই, শুনলে তো তুমি দুঃখু পাইবা।'

'নাঃ, দুঃখ পাওনের আর কিছু নাই—' শিবপ্রসাদ একবার দাঁতে দাঁত চাপলেন: 'আর খামাখা করুম না এই সমস্ত। কাইট্যা, মুড়াইয়া, ব্যাবাক গাছগুলান্ ফ্যালাইয়া দিমু বাইরে। অরাও শান্তি পাইবো, আমারও হাড় জুড়াইবো।'

চুপ করে রইল নীলু। দাদুর রাগের কথা।

'কত ফুল আছিল দেশের বাড়িতে। নতুন পুকুর কাটা হইছিল অ্যাক্‌টা—সেই মাটিতে যে কী ফুল হইত! গোলাপে ভইর‍্যা যাইত। আর স্থলপদ্ম।

পুকুরের চাইরদিক ঘিরা্যা গাছ লাগানো হইছিল, হাজারে হাজারে ফুল ফুটত—জলে ছায়া পোড়তো, মনে হইত, পুকুর ভইর‍্যা পদ্ম ফুটছে। সংস্কৃত কাব্যে পড়ছিলাম সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈ—আলোর সেই ছবি।'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন আবার। খেয়াল হল, এসব তিনি নীলুকে বলছেন না, তাঁরই স্বগতোক্তি। সেই স্থলপদ্ম, সে-সব গোলাপ কেউ কোনোদিন চুরি করতে আসে নি; কারণ তখনো ভারতমাতার ছবিটা আলোয়-আশায়-বিশ্বাসে ঝলমল করত—মাথায় তাঁর হিমালয়ের মুকুট—পায়ের তলায় সিংহলের কমল পীঠ।

শিবপ্রসাদ বললেন: 'কারা ফুল ছিঁড্যা নিছে, জানোস তুই?'

'কেমনে কমু? দেখি নাই তো। কাইল বিকালে পঙ্কজ, রত্না আর দেবু ঘুরুতাছিল বাগানের ধার দিয়া—কী য্যান্ কইতাছিল। অরাই নিছে।'

'ডাইক্যা আনতে পারোস?'

'আইবো না। গাইল দিবো।'

'আমি তো কিছু কমু না। খালি জিগামু, চাইয়া লয় না ক্যান্? গাছ ভাইঙা—সর্বনাশ কইর‍্যা কী লাভ হয়?'

'অরা আইবো না দাদু। কইবো, আমরা ফুল নিছি—দ্যাখছস্ তোরা?' নীলুর স্বর আরো বিমর্ষ হল: 'জানো দাদু, অরা ইস্কুল থিক্যা পলাইয়া বায়োস্কোপে যায়। পঙ্কজ পরশু বাস স্টপের সামনে খাড়াইয়া খাড়াইয়া সিগারেট খাইতাছিল, আমি দেখছি।'

'বুঝছি।'

এ আমার, এ তোমার পাপ! কী বলবেন শিবপ্রসাদ, কাকে বলবেন?

'আইচ্ছা যা তুই, পড় গিয়া।'

নীলু আবার চলে গেল পড়ার ঘরে। শিবপ্রসাদ চোখ বুজলেন।

গন্ধরাজের কুঁড়ি থেকে অনেক দূরে। সেই রাতটায়। স্বাধীনতার রাত্রে। শহর কলকাতা—তার শহরতলী উত্তাল উতরোল। যুদ্ধ, দাঙ্গা—সব কিছুর শেষ। পলাশীর যুদ্ধের পরে—একশো নব্বুই বছরের শৃঙ্খল মোচন। মধ্য রাতের বেতারে দিল্লীর প্রাণ-তরঙ্গ। কলকাতা—তার শহরতলী—আনন্দে, আবেগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। আলোর দীপালী। জাতীয় পতাকায় আকাশ দেখা যায় না, মাইক্রোফোনে জাতীয় সঙ্গীত—যেন শিউরে উঠছে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত।

আর ভিড়। এত মানুষ—এত উত্তেজনা—কেউ কখনো দেখে নি।

এই আনন্দিত কোজাগরীর মধ্যে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই আজকে। সেদিনও মুসলিম এলাকায় হিন্দু পা বাড়াতে পারত না—হিন্দু অঞ্চলের কাছাকাছি কোনো মুসলমান হঠাৎ এসে পড়লে প্রাণভয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করতে হত তাকে। আজ কোথাও বাধা নেই—কোথাও আশঙ্কা নেই—এ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছে। একজন আর একজনকে বলছে—'চল যাই জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে, নাখোদা মসজিদের পাশে সেই রেস্তোরাঁটার বিরিয়ানি পোলাও কতদিন খাই নি। এক দল পাঠান পুলিস—সেদিন পর্যন্তও যারা হিন্দুদের বিভীষিকা ছিল, একটা লরীতে যেতে যেতে তারা জয়ধ্বনি করে গেল: 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ!' তাদের পেছনে পেছনে একটা জীপে একদল যুবক নাচানাচি করে হিন্দী ফিল্মের গান গাইছে: 'দূর হটো সব দুনিয়াবালে—হিন্দোস্তান হামারা হ্যায়! দূর হটো—দূর হটো—'

মনে হয় সব বদলে গেছে একটা যাদুমন্ত্রে। কোথাও পড়ে নেই মন্বন্তরের একটা কঙ্কাল—গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের একটা রক্তের বিন্দু নেই কোথাও—যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক-আউটে বীভৎস সেই তামসী রাত্রিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে চিরকালের মতো। হিমালয়ের তুষার গলে নেমে এসেছে নির্মল জলধারা—উত্তাল হয়ে উঠে এসেছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ, সব ধুয়ে মুছে নিষ্কলঙ্ক হয়ে গেছে।

'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে—'

সেই সোনার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছিল শিবপ্রসাদের।

কে একজন তাঁর মধ্যে বলেছিল, 'তবু দেশটা ভাগ হয়ে যাবে? গান্ধীজী চাইলেন না—তবুও?'

'তা হোক। শান্তি আসুক।'

'আসবে?'

'নিশ্চয়। জিন্না যা চেয়েছেন, তা তো পেয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিও তো সাপোর্ট করছে।'

'হুঁ। কিন্তু—'

'কিন্তু নেই এর ভেতরে। দেখছ না অবস্থা? ভারতবর্ষ ভাগ না হলে থামবে এই হেট্রেড্ ক্যাম্পেন, এই সিভিল ওয়ার? দাঙ্গায় কলকাতায় অন্তত

হাজার পঞ্চাশেক নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তোমরা কি চাও তাই চলুক? আর পাঞ্জাবের নরক? যা সমস্ত প্রিমিটিভ বর্বরতাকে হাজার গুণে ছাড়িয়ে চলে গেছে? চাও এ সব?'

'না—তা কেউ চায় না।'

'তা হলে শান্তি আসুক। ওরা ওদের অধিকার নিয়ে খুশি হোক, আমরা আমাদের সীমায় নতুন ভারতবর্ষ গড়তে থাকি। বাড়-বাড়ন্ত হোক আজাদ পাকিস্তানের, আজাদ হিন্দুস্তান ফুলে-ফসলে ভরে উঠুক।'

তখন এই পর্যন্তই। এর বেশি ভাববার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তা ছাড়া সমাধানের পথই বা কোথায়? ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্ব তখন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে—মাঝখানে ঘৃণা আর ভ্রাতৃহত্যার রক্ত-সমুদ্র। কী করা যেত এ ছাড়া? কী করতে পারতেন মাউণ্টব্যাটেন?

হ্যাঁ, শান্তি আসুক। যে-কোন মূল্যে।

কিন্তু সে মূল্য যে কতখানি দিতে হবে তা তখন কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিলেন?

কোন গন্ধরাজ আর থাকবে না। একটু ফুলকেও আর ফুটতে দেবে না কেউ।

'পশ্চিম বাংলা—পশ্চিম বাংলা। পূর্বদিকে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান—' নীলু পড়া করছে।

শিবপ্রসাদ চমকে উঠলেন। পশ্চিম বাংলা—পূর্ব পাকিস্তান।

'নীলু?'

'কি কও দাদু?'

'আর কিছু পড়নের নাই তর? তখন থিক্যা ভূগোল নিয়া চ্যাঁচামেচি কোরতে আছস?'

'আমি তো অখনি ভূগেল পড়্‌তাছি দাদু।'

'তা হউক, আর কিছু পড়্‌।'

নীলাঞ্জন কী বুঝল কে জানে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তাইলে অঙ্ক কষ্‌তাছি।'

'হ, তাই কষ্‌।'

বড় ছেলে স্বরাজ বাজার করে ফিরল। সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রেখে, বাড়ির ভেতর যেতে যেতে ব্যাজার মুখে বলল, 'মাছ আর খাওন যাইবো

না। কুড়ি টাকার কমে কথা কয় না।'

ভেতর থেকে স্ত্রীর গলা শুনলেন শিবপ্রসাদ।

'রেশনে কী চাউল দিছে রে স্বরাজ? ফুইট্যা উঠতে না উঠতেই পিণ্ড পাকাইয়া গেল।'

'ওই পিণ্ডই গিল্তে হইবো। নাইলে খোলা বাজারের চাউল আনতে হইবো দুই টাকা কে-জি—পারবা সেই রাজভোগ খাইতে? স্বরাজ গজগজ করতে লাগল: 'দেশ তো চিরকালের মতোই ডুব্ছে—মইর্যা শেষ হইছে। অখন ওই ব্যাশনেব চাউল দিয়াই দেশের শ্রাদ্ধে পিণ্ড দেওন লাগবো।'

শিবপ্রসাদ একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। বড ছেলের জন্মের সময় স্বাধীনতার সৈনিক তার নাম দিয়েছিলেন স্বরাজপ্রসাদ। রাজনীতির বাড়ি। অল্প বয়েস থেকে স্বরাজও রাজনীতি করত। শিবপ্রসাদ বাধা দেন নি—কেন দেবেন? কলেজে পডবার সময় সে পুরোদস্তুর একজন ছাত্রনেতা—বামপন্থী চিন্তা তার, কংগ্রেসী সোসালিজ্মের নির্মম সমালোচক। অনেক উত্তপ্ত তর্ক চলেছে বাপ-ছেলের ভেতরে—কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারেন নি।

পাস করবার পরে স্বরাজ চাকরি নিল, তখনো পুরো বামপন্থী। তারপর কী যে হল। নিজেদের শিবিরেই ভাঙন ধরল তাদের। কিছুদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করল স্বরাজ, শেষে একদিন বাড়ি ফিরে বিস্বাদ বিরস গলায় ঘোষণা করল: 'চুলায় যাউক পলিটিক্স—এই সমস্ত আবর্জনার মধ্যে আমি আর নাই।'

আর একবার ধাক্কা লেগেছিল শিবপ্রসাদের।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি তখন একটা সরকারী স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার। ছেলের বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর অবস্থা যে খুব স্বস্তিজনক ছিল তা নয়; মধ্যে মধ্যেই নানা অপ্রীতিকর কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। এমনও ভেবেছেন, না হয় দেবেনই চাকরি ছেড়ে, টিউশন করবেন তার চাইতে। ছেলের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই, পথেরও না। কিন্তু চাকরির খাতিরে তাঁর ছেলের স্বাধীন রাজনৈতিক মতামতে তিনি বাধা দিতে পারেন না। ইংরেজ সরকারকেই জীবনে কখনো ভয় করলেন না—মাথা নীচু করবেন স্বদেশী সরকারের চোখ রাঙানিতে?

সেই ছেলে বলছে—চুলোয় যাক পলিটিক্স। শিবপ্রসাদের ভালো লাগে নি। যেন নিজেকেই পরাভূত মনে হয়েছে তাঁর। যে পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে

গিয়েছিলেন, সে পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু হয়েছে : এই কি চেয়েছিলুম আমরা—এই কি আমাদের সোনার মন্দিরের দ্বার খুলে যাওয়া? শেয়ালদা স্টেশনে নতুন উদ্বাস্তুদের ভিড় দেখে এবং গেদেতে একবার গিয়ে পৌঁছবার দুর্ভাগ্যের পর তাঁর মনে যে ছায়া নামছিল, সেই ছায়ায় এই নতুন ছেলেরাও ডুবে যাবে ?

'দাদু—এই অঙ্কটা একটু দেইখ্যা দাও। এই প্রশ্নের অঙ্কটা।'

নীলাঞ্জন।

চিন্তাটাকে ফিরিয়ে আনলেন, হাতে নিলেন অঙ্কের বইটা।

'অ। এইটা। কিচ্ছু শক্ত না। ত্রৈরাশিকে করতে হইবো। একটু ঘুরাইয়া দিছে।'

নীলু চলে গেল। অঙ্ক কষতে আর একজন খুব ভালবাসত। একটা অঙ্কও ভুল হত না তার। স্কুল-ফাইন্যালে পুরো একশো পেয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে তার জন্ম। তখনো আকাশে ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ অম্লান। তখনো আশায় বিশ্বাসে জ্বলজ্বলে মন। ছেলের নাম রেখেছিলেন আনন্দপ্রসাদ।

আনন্দ।

একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন শিবপ্রসাদ। বরাবর ভালো ছাত্র। এই নীলুর সঙ্গে অনেক মিল ছিল তার ছেলেবেলায়। এমনি শান্ত, নরম, ফুটফুটে চেহারা। কথা কম বলে, তলিয়ে থাকে নিজের ভেতরে। স্বরাজ যখন উদীয়মান নেতা, তখন টেবিলে সরস্বতীর ছবিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সে অঙ্কের পর অঙ্ক কষে যায়।

তিনটে লেটার নিয়ে পাস করল। একটা স্কলারশিপ।

'আমি এন্‌জিনীয়ারিং পড়ব, বাবা।'

'খুব ভালো—খুব ভালো। উই নীড্ এন্‌জিনীয়ার্স টু বিল্ড্ আপ আওয়ার কান্ট্রি।'

আনন্দ ভর্তি হল এন্‌জিনীয়ারিঙে। এক বছর দু' বছর। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারপর—

না—এই শান্ত নিরীহ ছেলেগুলোকেই বিশ্বাস নেই। এরাই বুকের ভেতরে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর আগুনকে নিঃশব্দে বয়ে বেড়ায়—বাইরে থেকে বুঝতেও পারা যায় না। সাধে কি ইংরেজ আমলের আই-বি.-রা সব চেয়ে ভালো ছাত্রদেরই বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ করত ?

সেই ইতিহাস যেন ফিরে এসেছে আবার। মরণ নিয়ে খেলা। সর্বাত্মক বিপ্লব। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি ধ্বংস হোক। সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রাম। রাইফেলই শক্তির উৎস।

আনন্দ চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ডাকে। এখন পুলিস তাকে খুঁজছে। মার্ডার চার্জ তার নামে।

ঠোঁট চেপে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ। না—একটা কথাও তিনি আনন্দের সম্পর্কে ভাবতে চান না। ওদের পথ—ওদের আদর্শ—সব তাঁর চিন্তার সীমা থেকে অনেক দূরে। আনন্দ কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসে নি স্বরাজের মতো। স্বরাজরা জানত তাঁরা প্রতিপক্ষ, তাই তর্ক তুলেছে। আনন্দেরা জানে তাঁরা মৃতদেহ—শবের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক।

কিন্তু—

না—আনন্দের সম্বন্ধে তিনি কিছু ভাববেন না। এই বাড়ির কেউ আর ভাবে না। অন্তত তাঁর সামনে ভাবতে সাহস নেই কারুর।

শুধু স্বরাজ একবার বলেছিল, 'অ্যাডভেনচারিজম্। কিন্তু অ্যাডভেনচার আর বিপ্লব কি এক?'

কে জানে। কে বলবে।

'বাবা, এত বেলায় বইস্যা বইস্যা ঝিমাইতাছ? উঠ্‌বা না—চান কর্‌বা না?'

চেয়ে দেখলেন মেয়ে স্বপ্না। অনেক দূর থেকে এল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। মেয়েটার মুখে-কপালে ঘামের ফোঁটা।

'গেছিলি কই মা?'

'গরচা লেনে। এ্যাকজনে এম. এ-র কিছু নোট দিবে কইছিল।'

'পাইলি নোট?'

'না—বাড়িতে নাই। কই গেছে। দেড় ঘণ্টা বইস্যা থাইকাও দেখা হইল না। কাইল ইস্কুল থিক্যা আসনের কালে আর একবার যামু অখন।'

রোদে মেয়েটার মুখ লাল। ঘাম ঝরছে। প্রাইভেটে এম এ-টা দিতে পারলে স্কুলের চাকরিতে গ্রেড বাড়বে। সেই আশাতেই ঘুরছে স্বপ্না।

'নোট পরে হইবো।' কোমল গলায় শিবপ্রসাদ বললেন, 'তুই জিরা গিয়া।'

'জিরামু। আগে তুমি ওঠো দেখি—চান কইর্যা লও।'

পাঁচ

দুপুরে মা কী খেয়েছেন অথবা আদৌ কিছু খেয়েছেন কিনা, প্রবীর জানবার চেষ্টা করল না। মাকে কোনো কথা বলা অনর্থক। টুলু না আসা পর্যন্ত মা'র মুখে কিছুই রুচবে না।

সেই যুক্তিহীন অন্ধ মমতা। মা বাবার মতো বুদ্ধিজীবী নন। অবশ্য বাবা বেঁচে থাকলে এই মুহূর্তে বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ করে নিতে পারতেন কিনা কিংবা এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট্ স্কলারের এই সামারসল্ট তাঁর কি রকম লাগত সে কথা এখন জোর করে বলা শক্ত। যে মা চিরদিন ছায়ার মতো রইলেন, একান্ত নির্বোধের মতো ভার টেনে নিলেন, যে মা'র অপদার্থতা সম্বন্ধে বাবা, দিদি এবং টুলুর কোনো সন্দেহ জাগে নি—টুলু ফিরে না আসা পর্যন্ত আড়ালে সে মা'র চোখের জল পড়তেই থাকবে।

কাজেই যে মুরারি হালদারের মুখ দেখলেও সকালটা মাটি হয়ে যায়, সন্ধ্যা-বেলায় আবার যেতে হল তাঁর কাছে।

মুরারি বসবার ঘরেই ছিলেন। আরো দুজন কারা ছিল। তাদের তিনি বলছিলেন, 'ঠিক আছে, ওই সেভেন পার্সেন্টেই সেট্‌ল করে নাও।' তারপর প্রবীরকে বললেন, 'এই যে!'

'টুলুর কী হল জানবার জন্যে—'

মুরারির ভুরু কুঁচকে এল।

'কেন, টুলু বাড়ি যায় নি?'

'ছাড়া পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, তিনটে নাগাদ। গৌরবাবু বললেন, একটা বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। আর—' একটু হাসলেন: 'আর বলেছেন এই দলটা সম্পর্কে নানা কমপ্লেন আছে। ভবিষ্যতে হাতে পেলে আর সহজে ছাড়বেন না। একটু সামলে চলতে বলে দিয়ো।'

ঘরের বাকী দুজন লোকের চোখে কৌতূহল। সরু গোঁফের নীচে একজনের বাঁকা হাসি দেখা দিল একটু।

'মস্তান বুঝি?'

'আর বলো কেন? ভদ্রলোকের ছেলেরা যে কী রাস্তায় যাচ্ছে—'

প্রবীরের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

'আচ্ছা কাকা, আসি আজকে। অনেক উপকার করলেন।'

'না না, উপকারের আর কী আছে! এ তো সামান্য ব্যাপার। কিছু ভেবো না—টুলু একটু পরেই বাড়ি ফিরে আসবে। হয়তো একটু লজ্জা হয়েছে —তাই—আচ্ছা এসো—হ্যাঁ, টুলুকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে।'

'আজ্ঞে বলব।'

প্রবীর বেরিয়ে এল। মুরারি হালদারের গলা শোনা গেল ভেতর থেকে: 'না—না, সেভেন পার্সেন্টের বেশি হলে—'

টুলু ছাড়া পেয়েছে। আর ভাববার কিছু নেই—করবারও না। কিন্তু কী আশ্চর্য হতভাগা হয়ে গেছে ছেলেটা। তিনটেয় বেরিয়েছে হাজত থেকে, এখন আটটা বাজে। এর মধ্যে একবার বাড়িতে আসবার কথা ভাবতে পারল না! নাকি ইডিয়ট মা'র ও-সব বাজে সেন্টিমেন্টের কোনো দামই নেই তার কাছে?

ইচ্ছে করল, কান ধরে টেনে নিয়ে আসে।

কোথায় পাওয়া যাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে লেকের ধারে একটা ফুচকা আর আলুর দমের দোকানের পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে সে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছে সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে বাসে আসতে আসতে এই দৃশ্যটা কবারই চোখে পড়েছে প্রবীরের।

যাব তাকে খুঁজতে? কিংবা মাকে আগে দিয়ে আসব খবরটা?

নিশ্চিত কিছু ভেবে নেবার আগে প্রবীর রাস্তার একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটু। মুরারি হালদার থানার ও-সি গৌরবাবুকে বলে দিয়েছেন, সেই খাতিরে এযাত্রা একটা মুচলেকা নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রতুলকে। এখন তাকে ভালো করবার পালা।

বাবার মতোই, নিজের বুদ্ধিতে অসীম বিশ্বাসী দিদির ধারণা: প্রতুল একবার কাছে এলে তার উপদেশে সম্পূর্ণ বদলে যাবে, কারণ দিদির ট্রেনিং দেবার ক্ষমতা অসাধারণ—নিজের মেয়ে টিনটিনকে অতি চমৎকার ভাবে মানুষ করছে সে। উপদেশ মুরারি হালদারও দিতে চান—দেবার রাইট আছে তাঁর—নইলে হয়তো আরও কদিন থানার হাজতে ভালোরকম ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হত প্রতুলের, চাই কি গৌরবাবু একটা কেসেই ফাঁসিয়ে দিতেন তাকে।

কিন্তু উপদেশ তাঁরা দিতে চাইলেও প্রতুলকে পাঠানো যাবে কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে। সে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ, কারো মতামতেরই তোয়াক্কা করে না। যদি করত, সব অন্যরকম হয়ে যেত তা হলে।

প্রতুলের যা হওয়ার হোক। কিন্তু মুরারি হালদার। ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীরের মনে প্রশ্ন জাগল—জিনিসটা এখন কি রকম দাঁড়ালো?

'এই সব লোকেরাই শত্রু। এরাই বুর্জোয়া—শ্রমিকের রক্ত শুষে নিয়ে এদেরই বাড-বাড়ন্ত। ইতিহাসে এদের জন্যে কোনো ক্ষমা নেই—' এই সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব প্রবীরও ঘোষণা করেছে ইলেকশানের সময়। কিন্তু কী আশ্চর্য, কনট্র্যাডিকশ্যান থিয়োরী আর প্র্যাকটিসেব ভেতরে। প্রতিদিনের জীবনে সামান্য বিপদে পড়লেই এরা ছাড়া যেন ত্রাণকর্তা কেউ নেই। স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন উঠলে এদের কাছে গিয়েই ধরনা দিতে হয়: 'আপনার তো দিল্লীতে অনেক জানাশোনা সোর্স আছে—যদি আমার জন্যে—'

না—দাবি-দাওয়া নয়। এ আমার ন্যায্য পাওনা—আমাকে দিতেই হবে, একথা বলবাব মতো জোর তো গলায় কোথাও নেই। তখন স্রেফ ভিক্ষুকেব ভূমিকা, চাটুকারের ব্রত। সভায় দাঁড়িয়ে মুরারি হালদারের মুণ্ডপাত করা—আর বাড়ি গিয়ে হাত কচলে বলা: 'আমার ভাই গুণ্ডামি করে হাজতে আছে—সুতরাং যদিও কাজটা সম্পূর্ণই বে-আইনি, তবু অনুগ্রহ করে—আপনার ইনফ্লুয়েন্সে তাকে আপনি ছাড়িয়ে আনুন!'

খাসা!

এর পর প্রবীর ব্যানার্জি কোনো ইলেকশান মীটিঙে বলতে পারবে: 'আপনারা জনগণের শত্রু শোষক মুরারি হালদারকে ভোট দেবেন না?'

যারা ইউনিয়নের নেতাদের ওপর হামলাবাজি করে, মালিকের টাকা খায়, কোলিয়ারী অঞ্চলের যে পেশাদার খুনেরা দিন-দুপুরে শ্রমিকদের বল্লম-কৃপাণ দিয়ে খুন করে—তারপর ফেলে দেয় কোনো পোড়ো খাদের ভেতর—তারাও এর চেয়ে ভালো, তাদের কোনো মুখোশ নেই। অথচ প্রবীর ব্যানার্জি বামপন্থী ক্যাণ্ডিডেটের জন্যে প্রাণপণে লড়ে থাকে।

সব—সব ওই স্কাউনড্রেল টুলুর জন্যে। পারিবারিক সম্পর্ক—আপন ছোট ভাই! চুলোয় যাক ছোট ভাই। উল্লুকটা বছর পাঁচেক জেল খেটে এলেও এই বিশ্ব-সংসারে কার কী আসত-যেত?

আর মা!

সেই অন্ধ অর্থহীন স্নেহ। কেন—মা কি একথা ভাবতে পারেন না যে ফলটা পচে গেছে, তার গাছ থেকে ঝরে যাওয়াই ভালো? মা'র কি এমন মনে হতে পারে না—টুলু বলে যে ছেলে তাঁর ছিল অনেকদিন আগেই মরে গেছে সে, কিংবা আদৌ তার জন্মই হয় নি?

ডান হাতের মুঠোটাকে শক্ত করে চেপে ধরল প্রবীর। বাবা-দিদি-টুলুর কথাই হয়তো ঠিক। মা কেবল কতকগুলো ইন্‌স্টিংক্ট দিয়ে তৈরি—ব্রেন বলে, লজিক বলে তাঁর কিছু নেই। নইলে আজ নিজের মনের কাছে এমন ভাবে ছোট হয়ে যেতে হত না প্রবীরকে।

চিন্তাটা থমকে গেল। একটু দূর থেকে দুটি ছেলের কথা কানে আসছে। একটির বয়েস চোদ্দ-পনেরো, আর একটির কুড়ি-বাইশ বছর হবে।

কথা ছোটটাই বলছিল।

'সেই দুটো বোন একসঙ্গে যাচ্ছিল। যেটা ছোট—স্কুলে পড়ে না? এমন সেজেছিল স্লা—'

চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে কী অপরূপ ভাষা।

বড় ছেলেটা বললে, 'ছোটটা খাসা দেখতে মাইরি। চাক্কু চালিয়ে দেয়।'

'সেই জন্যেই তো আমি একটু ইয়াকি মেরেছিলুম। তা বলে কিনা—এক চড় মারব! আমি বললুম, দু' চড় মারব—'

'খিক খিক খিক—'

বড় ছেলেটা শেয়ালের মতো শব্দ করে হাসল: 'তাপ্পর স্লা?'

'তাপ্পর' কী হল, সেটা শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালো না প্রবীর। এ এমন একটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়—পৃথিবীর প্রথম দিন থেকেই এগুলো ঘটে আসছে। কিন্তু আজ যেন চারদিকে সব কিছুই কদাকার হয়ে উঠেছে, এখন একটা ছোট ঘামাচিও বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয়।

প্রতুলের দোষ নেই। এবার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেই হল। তারপর যে রসাতলের দিকে যেতে চাও।

বাড়ির দিকে চলতে চলতে রেডিওর খবর। স্থানীয় সাবাদ ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়।

'যুক্তফ্রন্টের সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে বলে তাঁরা মনে করেন। বাংলা কংগ্রেসের যে ক'জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন—'

না—কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। পায়ের তলায় যেটাকে পাথরের শক্ত ভিত বলে মনে হয়েছিল, তার তলায় এতখানি চোরাবালি জমে আছে কে জানত ?

দেশ কারুর নয়। দলটাই পরম এবং চরম।

'তোর জন্যে আমি একদিন গলায় দড়ি দেব তুইও বাঁচবি—আমিও বাঁচব।'

'সত্যি বলছি মা, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম কেবল।'

বাড়িতে পা দিতে গিয়ে প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মানে, টুলু ফিরে এসেছে। খুব সম্ভব ইডিয়টিক ইমোশন্যাল মা-টাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চায় কিংবা বন্ধু-বান্ধবগুলো হাজতে আটকে আছে বলে কোথাও আড্ডা দেবার জায়গা নেই এখন।

'কেন দাঁড়িয়ে থাকলি ? গণ্ডগোল হচ্ছিল—কেন ওখান থেকে চলে গেলি না তখন ?'

প্রবীর উঠোনে এসে দাড়ালো। বারান্দায় একটা মোড়া পেতে প্রতুল বসে, দাদার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। বাস্তবিক, চক্ষুলজ্জার বালাইটা তা হলে এখনো আছে তার।

মা বসে ছিলেন উঠোনের দিকে পিঠ দিয়ে। একটু আগেই খুব কেঁদেছেন, গলার স্বর এখনো ধরা : 'হ্যাঁ রে, তোর কি একটু মায়াও হয় না আমার জন্যে ?'

'টুলু!'

প্রবীর ডাকল। মা ফিরে তাকালেন।

'কে রে ভুলু ? টুলু এসেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' প্রবীরের স্বর শক্ত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে, 'তুই আমার ঘরে একটু আয় টুলু—তোর সঙ্গে কটা কথা আছে আমার।'

শুনেই মা ছটফট করে উঠলেন।

'তুই আর ওকে এখন কিছু বলিস নি ভুলু, বাড়িতে আসবামাত্রই তো আমি—'

'মা, তুমি চুপ করো তো!' কর্কশ গলায় প্রবীর ধমক দিলে একটা।

বিস্বাদ বিরক্ত মনটা দপ করে তার জ্বলে উঠল বারুদের মতো—বেরিয়ে এল একেবারে দিদির প্রতিধ্বনি : 'তুমিই আদর দিয়ে ওর মাথাটা খেয়ে দিয়েছ।'

মা চুপ করেই গেলেন। দুটো ভিজে ভিজে চোখ ভরে উঠল ভয়ে—যন্ত্রণায়।

সেদিকে তাকালে মায়া হয়। প্রবীর তাকালো না। অন্ধ মমতার সময় নয় এখন।

'টুলু—আয় আমার ঘরে।'

টুলু উঠে এল। দু' ভাই বসল ঘরে এসে। মুখোমুখি। টুলু একটা চেয়ারে, প্রবীর খাটের কোণায়।

মিনিটখানেক স্তব্ধতা। ঘরের টাইমপীসটার শব্দ। তারপর :

'তোর জন্যে আমাকে মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করতে যেতে হয়েছিল।'

মাথা নীচু করে বসে ছিল প্রতুল, চোখ তুলল।

'কেন গেলে?'

'নইলে আরো আটকে রাখত। কেসে জড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ডুবছিস না টুলু—আমাদেরও ডোবাচ্ছিস একসঙ্গে।'

'কী কেস করত?' প্রতুল এবার পিঠ সোজা করল : 'আমি ও-সবের ভেতরে ছিলুম না।'

'মিথ্যেই জড়িয়ে নিয়েছে তোকে?'

'তাই।'

'মারামারির ভেতরে তোর বন্ধুবান্ধবেরা ছিল না? ছোরা বের করে নি?'

'আমি বলতে পারব না—দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

'ও—তাই বুঝি!' একটু চুপ করে থেকে প্রবীর জিজ্ঞেস করল, 'কখন ছাড়ল তোকে থানা থেকে?'

'এই সন্ধ্যের সময়।'

'না—বেলা তিনটেতে!'

প্রতুল একবার চমকালো।

'কে বললে?'

'থানার দারোগা।'

টুলু সামলে নিলে :

'এই বেরিয়ে—আসতে আসতে—'

বাধা দিয়ে প্রবীর বললে, 'টুলু, কী লাভ এ-সব বলে? একটা মিথ্যেকে ঢাকতে গিয়ে আরো দশটাকে টেনে আনতে হয়। তোর সঙ্গে কথা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। শুধু একটা কথার জবাব দে আমার। এইভাবেই চলবে?'

গোঁজ হয়ে প্রতুল বললে, 'যা ভাবছ তা নয়। আমি কাজ খুঁজছি।'

'সে তো খুব সুখের কথা। কিন্তু সকালবেলা মেয়েদের কলেজটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে, সন্ধ্যায় লেকের কাছে গুলতানি করলে, এখানে-ওখানে মারামারি করে বেড়ালে কাজ পাওয়া যাবে? না কি এইটেই কাজ?'

'দাদা, বড্ড বাড়িয়ে বলছ।'

নির্লজ্জতায় মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল প্রবীরের। ইচ্ছে করল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইকে শাসন করবার রাস্তা নয় ওটা। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'আমি বলছি না, পুলিসে বলে।'

'পুলিসে ও-রকম বলেই থাকে।'

'তা হবে, ওরা মিথ্যে শত্রুতা করছে তোর সঙ্গে।' প্রবীর একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল: 'কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারীও যে পাস করল না—কেউ তাকে চাকরি দেবে? টুলু, এখনো তো সময় যায় নি। তুই পরীক্ষা দিতে পারিস, পাস করতে পারিস—'

'পাস করে কি হবে দাদা? হাজার হাজার বেকার এন্‌জিনীয়ারই তো চাকরি পায় না।'

মোক্ষম যুক্তি। জবাব মুখে তৈরিই আছে।

'তাতে তোর কী আসে-যায়? তুই তো চেষ্টা করে দেখিস নি।'

'এম. এ., এম. এস্‌সি পাস করব, অথচ কাজ একটা কোথাও জুটবে না—অতখানি এনার্জি আমি অকারণে নষ্ট করতে চাই না দাদা।'

না, কলেজের মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে এনার্জির সাশ্রয় হয়। অনেক এনার্জি বেঁচে যায় পথে-ঘাটে মস্তানি করে বেড়ালে। আবার একটা জিঘাংসা ফুটে উঠল মনের ভেতরে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা যায় না। তা ছাড়া পকেট থেকে যে একটা ছোরা বেরিয়ে আসবে না, তাই বা কে বলতে পারে!

'তুই কী করতে চাস তা হলে ?'

'বললুম তো—কাজের ব্যবস্থা করছি একটা।'

'কী কাজ—জানতে পারি ?'

'ভাবছি, এজেন্সি নেব কিছু কিছু।' টুলু যেন প্ল্যান গুছিয়ে নিতে চাইল একটা : 'ধরো, স্কুলে-কলেজে এটা-ওটা সাপ্লাই দেব। কিংবা কলেজ ল্যাবরেটরিতে তো অনেক কিছু লাগে—সেগুলোও যোগান দিতে পারি ওদের। এই সব ভাবছি।'

'তা হলে ভ'বনাটা কাজে লাগালে হয়।'

'কিছু ক্যাপিটাল দরকার। অন্তত শ'পাঁচেক টাকা।'

প্রবীর টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুই সিরীয়াস ?'

'তুমি আমাকে কী ভাবো দাদা ?'

আমি কিছুই ভাবতে চাই না—কিছু না ভাবতে হলেই বেঁচে যাই। টুলু ব্যবসা করবে—রোজগার করবে—দায়িত্ব নেবে—এমন আশ্চর্য শুভ ঘটনা ঘটে গেলে ভাববার আর কিছুই থাকে না। কিন্তু—

টুলু আবাব বললে, 'তুমি টাকাটার ব্যবস্থা করে দাও—আমি লেগে পড়ব।' বলতে বলতে একটু উজ্জ্বল হল তার চোখ।

মিনিটখানেক চুপ করে রইল প্রবীর।

'আচ্ছা দেব টাকা। তোর আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে বাবা যে সামান্য কিছু রেখে গেছেন, তাই থেকেই তুলে দেব। কিন্তু তার আগে এক মাস আমি তোমায় দেখব। আর তোমার ওই অ্যাসোসিয়েশনটি ছাড়তে হবে।'

টুলু বললে, 'তুমি মিথ্যে অবিচার করছ। আমার বন্ধুরা কেউই মস্তান নয়। কাজ-কর্ম নেই বলে—। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি জন-তিনেকে মিলে পার্টনারশিপে ব্যবসাটা আরম্ভ করব।'

'ও—পার্টনারশিপ ?' প্রবীর যেটুকু কোমল হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা শক্ত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। মাণিক আর প্রমোদ—'

'ওরাও নিশ্চয় পাঁচশো করে টাকা দেবে ?'

টুলু একটু থামল।

'হ্যাঁ—তা—তা দেবে বইকি।'

'খুব ভালো কথা। ওদের টাকা যোগাড় করতে বলো তা হলে। এক মাস পরে পার্টনারশিপ ডীড রেজিস্ট্রি করিয়ে দেব। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—আইন-কানুনের ব্যাপারগুলো আমিই দেখব এখন।'

ব্যবসায়ের উৎসাহে কোথায় যেন ভাটা পড়ে গেল টুলুর।

'অল্প থেকে আরম্ভ করব, তার জন্যে এত সবের দরকার আছে দাদা?'

কঠোর মুখে প্রবীর বললে, 'আছে। তোমার পাঁচশো টাকা নিয়ে তুই বন্ধুতে সেটা পরম আনন্দে উড়িয়ে দেবে, টাকা এত সস্তা নয়।'

'ওরা এত ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল্ নয়, দাদা।'

'কতখানি রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্ তার প্রমাণ তো এখনো পাওয়া যায় নি।' তীক্ষ্ণ চোখে প্রবীর টুলুর দিকে তাকিয়ে রইল: 'আইনসম্মতভাবে না হলে একটা পয়সাও আমি দেব না।'

'আচ্ছা, আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে—' টুলু নির্জীব হয়ে গেল।

প্রবীর আবার তাকিয়ে রইল টুলুর দিকে। ব্যবসা করবে! আসলে শ' পাঁচেক টাকা হাতে পেলে কিছুদিন চমৎকার কেটে যায় বোধ হয়। তারপর বললেই চলে: 'সুবিধে হল না দাদা—বিজনেস ফেল করেছে। আরো শ'পাঁচেক হলে—'

প্ল্যানটা ভালো। খুব ইন্টেলিজেন্ট। কোনো প্রাণের বন্ধুই যোগান দিয়েছে খুব সম্ভব।

একবার ইচ্ছে হল, বলে—'রাস্কেল, তোর পয়সা-কড়ি বাড়ি-ঘরের অংশ যা আছে সব ভাগ করে নে—তারপর ঝাঁপিয়ে পড়্ যে নরকে তোর খুশি।' কিন্তু মা! একটা যুক্তিহীন, অন্ধ, অবিবেচক মমতার দেওয়াল রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কিছুই করা যায় না—কেবল নীলকণ্ঠ হওয়া ছাড়া।

কিংবা—কিংবা এমন হতে পারে, নিজের মনটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে তার। নিজের ভাইকে সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না—সে ভালো হতে চাইলেও না।

একটু চুপ করে থেকে, ক্লান্ত একটা নিশ্বাস ফেলে প্রবীর বললে, 'টুলু, আজ স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আর একবার চমকালো টুলু। এবার মুখটা একটু বিবর্ণ হল তার।

প্রবীর আস্তে আস্তে বললে, 'মেয়েটা কোনো স্কুলে চাকরি করছে বোধ হয়। টুলু, তোর জন্যে ও কতখানি করেছিল, মনে আছে? ওই মেয়েটার জন্যেও কি

তুই ভালো হতে পারিস না?'

টুলু উঠে দাঁড়ালো।

মাথা নামিয়ে বললে, 'আমি এখন একটু শুয়ে পড়ব দাদা, শরীরটা ভালো লাগছে না।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে প্রবীরের মন হল, হয়তো এখনো সব শেষ হয়ে যায় নি, হয়তো এখনো আশা আছে। কাল-পরশু একবার যেতে হবে স্বপ্নাদের বাড়িতে।

আর মনে পড়ল—আজ দু মাস, না—তারও বেশি—সাবিত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় না।

ছয়

বি-টি আছে, প্রাইভেটে এম. এ.টা পাস করিলে গ্রেড বাড়ে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বইপত্র নিয়ে বসল স্বপ্না। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে পড়বার জো নেই, একরাশ হোম-টাস্কের খাতা দিয়েছে মেয়েরা।

সেই খাতাগুলো দেখে, ভাষা আর বানানের বিপর্যয়ে লাল কালির দাগ টানতে টানতে রাত এগারোটা বাজল। তারপর এম এ.র নোটগুলো। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট বোধগম্য হচ্ছিল না তার, কাণ্ট-হেগেল-দর্শনের তত্ত্ব, সব একসঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল, মনে হতে লাগল সব লাল কালি দিয়ে কাটাকুটি করা।

একমাত্র বাবার ঘরে আলো। বড়দা শুয়ে পড়েছে, ছোড়দার ঘর তালাবন্ধ। বাবার ঘুম কমে গেছে, অনেক রাত অবধি এটা-ওটা পড়েন, আবার ঘুম থেকে উঠে পড়েন চারটে সাড়ে চারটে না বাজতেই। ছোড়দা উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বাবার অনিদ্রা আরও বেড়েছে। ছোড়দা সম্পর্কে বাবার কী যে আশা ছিল।

নোটগুলো সরিয়ে রেখে স্বপ্না চোখ তুলল। পাশের বাড়িতে একতলা-দোতলায় সব আলো নিবে গেছে। নারকেলগাছের শব্দ উঠছে হাওয়ায়—নির্জন পথের ওপর পাতার ছায়া দুলছে। একটা সাদা কুকুর ঘণ্টাখানেক আগে চলে-যাওয়া কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটানা সুরেলা ভঙ্গিতে ডাকছে: ভু-ঔ-ঔ-ঔ—

বাবার অনেক আশা ছিল ছোড়দার ওপর। কিন্তু ছোড়দা ঝড়ের মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে গেল। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় নি; নিয়মিত পড়াশুনো করছিল, শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে আসবে, তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

অথচ ছোড়দা মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। সে চিরদিন কম কথা বলে, বাইরে থেকে মনের চেহারা কখনো বোঝা যায় না। সে যে রাজনীতি নিয়ে ভাবত—এমন সন্দেহই কারো জাগে নি কোনো দিন। অথচ এ বাড়িতে রাজনীতি চিরকাল সজাগ—দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত বাবা ও ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি আর স্বাধীনতার পরে বড়দা গলা চড়িয়ে বলত: 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

ছোড়দা থাকত নিজের পড়াশুনো নিয়ে। সেই ছিল তার তপস্যা।

বড়দা বলত: 'একেবারে বুক-ওয়ার্ম। বইয়ের বাইরে পৃথিবী বলে কিছু নেই ওর কাছে।'

সেই বড়দা এখন রাজনীতির নামে বিরক্ত। দু-একটা বামপন্থী সভা-সমিতিতে কখনো-সখনো যায়, পত্রিকা কিংবা বই-টই পড়ে, তার বেশি আর কিছুই নয়। বলে, 'দেশ বলে আর কিছু নেই, যা আছে তা দলাদলি। কমন এনিমির কথা ভুলে গিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে লড়তে চায় এখন—শ্রমিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় শ্রমিককে, কৃষককে দিয়ে কৃষকের রক্ত ঝরায়। বাংলা দেশে লেফটিস্ট পলিটিক্সের বারোটা বাইজ্যা গেছে।'

'আবার বাবা তলিয়েছেন নিজের ভেতর। তিনি আর কথা বলেন না।

কী পেয়েছেন? তিনিই জানেন। অথবা বাবার মতো পুরনো আদর্শবাদীরা কিছুই চান না। একটু আগেই কাণ্ট পড়ছিল সে। বাবার জীবনের তত্ত্ব ইমানুয়েল কাণ্টের জীবন-ভাষ্যের মধ্যেই আছে। 'অন্যের সুখের জন্য, সকলের সুখের জন্যেই তো তোমার সাধনা; কিন্তু তোমার নিজের জন্যে আছে পূর্ণতা; সেই পূর্ণতা তোমার ব্যক্তিগত সুখ দেবে সে আশা রেখো না—হয়তো যন্ত্রণা, হয়তো চরম দুঃখই তুমি পাবে—কিন্তু পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই তোমার কাম্য নেই।' নান্য তস্মাৎ—আর কোন আশঙ্কা তুমি রেখো না।

বাবা দেশের জন্যে, সকলের জন্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। নিজে চেয়েছিলেন 'পূর্ণ' হতে—কী পেয়েছেন? ছোড়দাও সেই পথই বেছে নিয়েছে। 'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে।' বাবা ছোড়দার কছে অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু ছোড়দা কি তাঁকে নিরাশ করেছে? সেও যন্ত্রণার পথ ধরে যেদিকে চলেছে—

'ঘুমাস নাই ?'

স্বপ্না চমকালো। বৌদি।

'অখন শো গিয়া। বারোটা বাজে।'

'এই এটটু নোটগুলান ল্যাখতাছিলাম। পড়নের সময় পাই না তো সমস্ত দিন।'

'ছাই পড়তাছস।' বৌদি বিছানার কোণটায় বসে পড়ল: 'পাঁচ-সাত মিনিট ধইর‍্যা আইস্যা খাড়াইয়া রইছি—তর চক্ষু তো বইয়ের দিকে নাই।'

'না', স্বপ্না হাসল: 'ঠিকই ধোরছো—পড়ায় মন বসতাছে না। এটা-ওটা ভাবতাছিলাম। তা তুমি উইঠ্যা আইলা ক্যান ?'

'ঘুম আসতাছে না। আইজ আবার একটু টানের মতন উঠল।'

বৌদির হাঁপানি আছে। মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট পায়, আবার হয়তো বছর-খানেক কোনো চিহ্নও থাকে না।

স্বপ্না বললে, 'বেশি ?'

'না, সেই রকম কিছু না। উইঠ্যা একটা ট্যাবলেট খাইলাম, তারপর একটু কম। কিন্তু ঘুম আর আসল না। দেখলাম তর ঘরে আলো জ্বলতাছে—তাই আইলাম।'

স্বপ্না বললে, 'আমার জন্য ভাবতে হইবো না, অখন শোও গিয়া।'

বৌদি একটু চুপ করে রইল।

'ভালো লাগতাছে না। একটা চাকরি-বাকরি করলে হইত।'

'এই শরীর নিয়া ?'

শুধু হাঁপানি নয়, সেটা বড় কথাও নয়। বৌদির শরীর নীলু হওয়ার পর সেই যে ভাঙল, তারপর থেকে তার এটা-ওটা অসুখের বিরাম নেই আর। অল্প অল্প জ্বর হয় যখন-তখন। ডাক্তার বলেন, অ্যানিমিয়ার জন্যে।

বৌদির নিশ্বাস পড়ল একটা।

'সত্যি, শরীরটা যে কীভাবেই ভাঙল। সব কাজের বাইরে চইল্যা গেছি। এক-একদিন বিছানায় পইড়্যা থাকি, তর আর মায়ের উপর সংসারের সমস্ত খাটুনি গিয়া পড়ে। অথচ—'

অথচ এ শরীর অন্য রকম ছিল এক সময়। সারাদিন এখানে-ওখানে ছুটো-ছুটি করে কিংবা মিছিলের সঙ্গে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটেও এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করা যেত না।

বৌদির একটা নিশ্বাস পড়ল। নির্জন পথটার ওপর একটা শিরীষগাছের পাতার ছায়ানাচ। নারকেল গাছের শব্দ। বৌদির মনে ছবির পর ছবি আসছিল।

স্বরাজের সঙ্গে তার পরিচয়, মিছিলের ওপর পুলিস-চার্জের পর।

স্বরাজ বসে পড়েছিল ময়দানে। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল তার। বৌদি—সুজাতা—ছুটে গেল সেদিকে।

['নিন আমার এই রুমালটা। কপালটা বেঁধে ফেলুন।'

'ধন্যবাদ কমরেড।'

'ধন্যবাদ পরে দিলেও চলবে। ও কি হচ্ছে, কীভাবে বাঁধছেন? দিন আমাকে - ঠিক করে দিচ্ছি।'

'বাঁচালেন। এসব আপনারাই ভালো পারেন।'

'সে তো হল। কিন্তু খুব লেগেছে নাকি? উঠতে পারবেন?'

'পারব আশা করি। অচল হয়ে যাই নি।

একটু তাড়াতাড়ি তা হলে সচল হোন কমরেড। আবার মাউণ্টেড পুলিস আসছে এদিকে। নিন—উঠে পড়ুন, ধরুন আমার হাত—']

'বৌদি।' স্বপ্না ডাকল।

সুজাতার চোখে তখনো স্বপ্নের ঘোর। হাসল একটু।

'তর দাদার লগে আলাপ হইছিল রাজনীতির মধ্য দিয়া। এক জেলায় বাড়ি শুইন্যা ভাবটা বেশি হইয়া গেল, চইল্যা আইলাম এই সংসারে। ভাঙা শরীরটা নিয়া—সংসারের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া সেই সব ভুইল্যা থাকনের চেষ্টা করি। কিন্তু এক-এক সময় কেমন যেন ফ্রাস্ট্রেশন আসতে চায়।'

'মন খারাপ কইর‍্যা কী লাভ বৌদি? বড়দা তো ওই সব ছাইড়্যাই দিছে।'

'হ, ছাড়ছে অনেক দুঃখে। এককালে যারা আছিল পাশাপাশি, একসঙ্গে থাকল, জীবনের সমস্ত কিছু স্টেক করল—তারা অখন এ অর নামে কুৎসা ছড়ায়, কয় দালাল, কয় বিশ্বাসঘাতক! বোঝলাম খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু তাই বল্যা হাল ছাইড়্যা দিতে হইবো? লড়াই শেষ হইয়া গেছে? সব প্রব্লেম্ মিট্যা গেছে দেশের?' বৌদির স্বরে বিষণ্ণতা ঝরে পড়তে লাগল: 'এ তো পার্সোনাল ডিফীট—হার স্বীকার কইর‍্যা সইর‍্যা যাওয়া—এতে আর কী লাভ হইবো?'

স্বপ্না চুপ করে রইল। আবার ছবি ফুটল সুজাতার চোখে।

['সুজাতা!'

'বলো।'

'ওরা মদ খাইয়ে আর্মড পুলিস এনেছে আজ। গুলি চলবে।'

'চলুক। মেরে ফেলবে, তার বেশি তো কিছু করতে পারবে না।'

ঠিক কথা। কয়েকজনকে মেরে ফেলবে, কিন্তু বিপ্লব থামবে না। লক্ষ-কোটি বন্দুকেও না। তুমি জানো, ফ্রান্স সিন্‌ডিক্যালিস্টরা কী বলত ক্লেমাসো সম্পর্কে? ঝাঁটা হাতে নিয়ে যেমন সমুদ্রের ঢেউকে—]

সুজাতা ম্লান গলায় বললে, 'কি রকম হইয়া গেল সমস্ত। অথচ জীবনটারে এইভাবে কখনো দেখি নাই। আমরা যেন ক্যামন হাইর‍্যা যাইতাছি। বে'ডিয়োর নিউজ শুনছস আইজ?'

'শুনছি।

'ক্রাইসিস বাড়্‌তাছে। তর্‌ কী মনে হয়? ভাঙবো?'

'কি জানি।'

'একটা বছরও বত্রিশ পয়েণ্টের উপর স্টিক করতে পারল না। কী কৈফিয়ৎ দিবো লোকের কাছে?'

'অরাই ভাববো।'

'হ, অরাই ভাববো। দোষ চাপাইবো এ ওর ঘাড়ে। এ যদি বিট্রেয়াল না হয়, তাইলে—'

'বৌদি, তোমার আমার ভাবনের কিছু নাই। ভাইবা কিছু করনও যাইবো না। যাও—শোও গিয়া অখন।'

সুজাতা বসে রইল চোখ নামিয়ে। করবার কিছু নেই? নিজেদের এত বড ব্যর্থতা নিয়ে মাথা নামিয়ে সরে যেতে হবে? বলতে হবে, আমরা পারলুম না—নিজেদের লক্ষ্যই আমরা ঠিক করতে পারি নি এখনো?

সুজাতা ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার। 'স্বপ্না, আবার পলিটিক্‌স্ করুম।'

'এই শরীর নিয়া?'

ঠিক। এই শরীর। সুজাতা তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। সামনে নির্জন পথটা নয়, গাছের ছায়া নয়, ঘুমন্ত রাত্রির হাওয়া নয়। অনেক দূরে একটা সমুদ্র দেখা যায়। তার ঢেউ ভাঙছে, ফেনা উঠছে, ডাক শোনা যাচ্ছে রক্তের ভেতরে। একদিন ওর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাঁতার কেটেছে সুজাতা। কিন্তু আজ

সেই সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে, সেখানে যাওয়ার আর পথ নেই তার।

বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার অনুভূতি। ওষুধ খাওয়ার পরে হাঁপানির যে টানটা তখন থেমে গিয়েছিল, সেটা আবার বেড়ে উঠছে মনে হয়।

স্বপ্না আবার বললে, 'বৌদি, যাও শোও গিয়া। আমার আর একটু পড়তে হইবো।'

শিথিলভাবে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা। সেই তখন আর একটা কথা মনে হল তার। এই যে বই-খাতা খুলে নিয়ে রাত জেগে বসে আছে স্বপ্না, তার একটা অর্থ যেন আভাস দিল তার কাছে।

'একটা কথার জবাব দিবি স্বপ্না?'

'কী?'

'টুলুর লগে এর মধ্যে দেখা হইছিল তোর?'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল স্বপ্না। বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল তার।

'না।'

'দেখা না হওনই ভালো—' এক ঝলক মমতা ঝরে পড়ল সুজাতার গলায়: 'একেবারে নষ্ট হইয়া গেছে। তবু দাদায় কইতাছিল—'

'বৌদি, তুমি শোও গিযা।'

না—কাণ্ট্ নয়। পরীক্ষার প্রয়োজনেও না। কী হবে এসব আদর্শে, বিশ্বাসে, পরিশুদ্ধ জ্ঞানের আরাধনায়? স্বপ্না বইখাতাগুলো বন্ধ করে ফেলল।

প্রতুলকে তার অনেকদিন আগেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। সে জানে, প্রতুল এখন এক নৈরাজ্যের আনন্দে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। তার সঙ্গী আলাদা, তার মন আলাদা। সব কিছুকে অস্বীকার করবার, সব দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার, জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলবার সহজিয়া আনন্দটাই বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে।

অথচ, আশ্চর্য—ভাবাই যায় না।

তখনও বাবা এ বাড়ি তৈরি করেন নি। প্রতুলদের পাশের বাড়িতে তারা ভাড়াটে থাকত। প্রায় সাত-আট বছর ছিল। সেই সময়।

এক বয়েসী দুজনে। বোধ হয় মাস তিনেকের বড়ো ছিল টুলু। সহজ পরিচয় —সরল মেলামেশা। তারপর ধীরে ধীরে মনের কাছে এই সত্যটা ধরা পড়ল যে টুলুদা ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভাবাই যাচ্ছে না।

তখন বয়েস কত আর? পনেরোর বেশি নয়।

টুলু গান গাইতে পারত। বিশেষভাবে যে শিখেছিল তা নয়, স্বাভাবিক

স্বর ছিল তার গলায়। স্বপ্না বলেছিল, 'তুমি আমার শক্ত অঙ্কগুলো কষে দাও—আমি তোমায় হারমোনিয়মে সা-রে-গা-মা'র পাঠ দিই।'

টুলু বলেছিল, 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'কী আইডিয়া ?'

'তুই আর আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিই।'

'চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু তারপর ?'

'তুই আর আমি পথে পথে গান গেয়ে বেড়াব।'

'তার মানে ?' স্বপ্না হেসে উঠেছিল : 'পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করতে হবে ? এটা এমন কি চমৎকার আইডিয়া যে—'

'আঃ, থাম্ না—আমাকে বলতে দে। আমরা চারণ-চারণীর মতো—রাজপুতদের হিস্টরি জানিস তো—সেই রকম পথে পথে স্বদেশী গান গাইব। দেশের লোককে মাতিয়ে তুলব। খুব মহৎ কাজ হবে—তাই না ?'

রোমাঞ্চ জেগেছিল। সে আর টুলু। পথে পথে গান গেয়ে ঘুরছে।

'সে তো ভালোই হবে। কিন্তু তার আগে হায়ার সেকেণ্ডারীটা পাস না করলে বাবা তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু বাড়ি থেকে।'

'দূর—তোর যত বাজে ভাবনা! পড়াশুনা করে কিচ্ছু হবে না—শুধু বেকারের দলে লাইন দিতে হবে। জানিস—আজকাল আমার পড়তেই ইচ্ছে করে না একেবারে—'

'স্বপ্না – '

স্বপ্না কেঁপে উঠল।

না, টুলু নয়। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দ। একরাশ রুক্ষ বিশৃঙ্খল চোখ আর পাণ্ডুর মুখের ওপর ঘরের আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে।

'ছোড়দা!'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আনন্দ বললে, 'চুপ।'

'ভেতরে আয়।'

'না। ঘরে রুটি কলা-টলা কিছু থাকে তো দে আমাকে। এখুনি পালাতে হবে।'

সাত

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, একটা পা ঠুকতে ঠুকতে টুলু বললে, 'ধুর, ভালো লাগছে না কিছু।'

একজোড়া অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে হাতে হাত জড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল লেকের দিকে। আড়চোখে তাদের লক্ষ্য করতে করতে শিস দিচ্ছিল মানিক। টুলুর কথাটা তার কানে গেল না।

'মেয়েটা বেড়ে দেখতে মাইরি!'

টুলু আবার বললে, 'কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'চল্ না—ফলো করি। দুজনে বেশ মজে রয়েছে মনে হচ্ছে রে। নিশ্চয় কোথাও নিরিবিলিতে বসবে—' চোখ চিকচিক করতে লাগল মানিকের: 'চাই কি দু-একটা—'

'আঃ, কী বকে যাচ্ছিস তখন থেকে! যাক্ না!'

মানিক কপাল কোঁচকালো।

'হল কী তোর? অমন ভোম্বা মেরে গেছিস কেন?'

'তোকে তো আর থানার লক-আপে থাকতে হয়নি, পুলিস আসতে দেখে কেটে পড়লি। বাপ্‌স—কী মশা রে! মনে হচ্ছিল মশা নয়—চামচিকের বাচ্চা সব। আর কী ঠুকরেছে মাইরি! আর একটা রাত থাকতে হলে গায়ের চামড়াটা সুদ্ধু উপড়ে নিত।'

'ফনে আর কার্তিক তো রয়েছে।'

'ও দুটোর গণ্ডারের চামড়া—' টুলু মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'মশার চৌদ্দপুরুষও ওদের কিচ্ছু করতে পারবে না। বললে বিশ্বেস করবি নে, আমি যখন সারারাত বসে বসে মশা চাপড়াচ্ছি, তখন কার্ত্তিক রাস্কেলটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাচ্ছিল।'

মানিক হাসল: 'ওদের অব্যেস আছে।'

'সে আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার এ-সব পোষাবে না মাইরি। তোদের পাল্লায় পড়ে আমি বখে গেলুম। এবার তোদের দল আমায় ছাড়তে হবে।'

'রিয়্লি!' ট্যারা চোখে তাকিয়ে মানিক জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'একটা কাজকর্ম খুঁজতে হবে।'

'কাজকর্ম! তোমায় দেবার জন্যে—' একটা অশ্লীল উপমা দিয়ে মানিক কথাটা শেষ করল, 'বসে আছে! ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত আর্দালীর চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছে, তোমায় কে কাজ দেবে চাঁদবদন?'

'ভিড়ে পড়ব যে কোনো কলে-কারখানায়।'

'কটা কারখানায় লক-আউট হয়ে আছে, সে খেয়াল রাখো যাদু? লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা দিয়েছে সেদিকে বারোটা বাজিয়ে। যে-সব জায়গা খোলা আছে সেখানেই কি ঢোকবার উপায় আছে তোমার? ওদের ইউনিয়নের লোক না হলে?'

'বিজনেস করব। চায়ের দোকান দেব একটা।'

'কারা তোমার দোকানে চা খেতে আসবে চাঁদ? এই আমরাই তো! ভাবিসনি, বাকী খেয়ে সাত দিনেই তোর গণেশ উল্টে দেব।'

'সব কথায় ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিসনে—বলে দিচ্ছি মানিক।' টুলু বিরক্ত হল: 'না, কিছু একটা করতে ইচ্ছে। রাতদিন দাদা খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করছে—বাড়ি ফিরলেই মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। আর সহ্য হয় না এ সব। ভারী ভুল হয়েছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে।'

'ছাড়লি কেন?'

'কী করব? সরস্বতী পূজোর ফাণ্ড থেকে টাকা মেরে দিয়ে এমন কেলেঙ্কারি হল—'

'টাকা মেরে দিয়েছিলি?'

'তখন হঠাৎ—' বলতে গিয়ে টুলু থামল। একটি মেয়ের মুখ। স্বপ্না। অনেক জল গড়িয়ে গেছে তারপরে। টুলু ভেবেছিল রোগা ওই ছোট মতন মেয়েটাকে সে ভুলে গেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। মনে পড়ে—আর মনে পড়লেই কি রকম কষ্ট হয় একটা। সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল—অথচ এ-রকম না হলেও বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।

মানিক বললে, 'তারপর?'

'তারপর আর কী?' টুলুর ঘোর ভাঙল: 'দেখতেই পাচ্ছিস।'

ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল মানিক।

'নে।'

দুজনে দুটো সিগারেট ধরালো।

'সত্যি বল্ তো মানিক, এভাবে তোর ভালো লাগে ?'

মানিক মুখ ছুঁচলো করে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর :

'এসব কথা তুলে কেন ব্যাজার করে দিস, বল্ তো ? ভালো লাগে কি না সে কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। প্রাণপণ টুকেও শালা দু-বারেও স্কুল-ফাইন্যাল পেরুতে পারলুম না। বাবাকে তো দেখেছিস সারাদিন খেটেখুটেও দু-বেলার সংস্থান করতে পারে না—তিরিক্ষি হয়ে থাকে। জুতো দিয়ে পিটতে আরম্ভ করল। জুতোটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাল্টা বসাতে যাচ্ছিলুম—তার-পরে মনে হল, দূর স্লা—জন্মদাতা তো বটে, গায়ে জুতো তোলাটা কেমন ইয়ে হয়ে যায়। ছাড়লুম বাড়ি। উঠে এলুম মাসীর কাছে। বেশ আছে এরা—বুঝলি ? মেসো ডকে চুরি-চামারি করে—তিনটে মাসতুতো ভাই ওয়াগন ভাঙে।'

'তুইও যাস ?'

'কী করব, বল্। ওদের সংসারে থাকব, খাব, কাজকর্ম না করলে চলে ? তোকে কতদিন বললুম, চলে আয় আমাদের লাইনে, কিন্তু তুই ব্যাটাচ্ছেলে মনে মনে স্রেফ ভদ্দরলোক, কিছুতেই রাজী হলি না। তোর তো ঘরে খাবার ভাবনা নেই—ধেনো আর ফুর্তির খরচটা অন্তত চলে আসত।'

টুলু চুপ করে রইল একটু।

'ওয়াগন ভেঙে সারাজীবন চলবে ?'

'চালালেই চলবে। আমরা তো মাইরি চিনির বলদ—স্রেফ কিছু কমিশন পাই। দেখে আয় না ভুঁড়ো শেঠজীদের, চোরাই মাল বেচে লাল হয়ে উঠছে সব। ওরা যদ্দিন আছে, ততদিন আমরাও আছি।'

'কিন্তু এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই ?'

'সব রাস্তাই তো একদিকে যাচ্ছে রে—চোর নয় কোন্ ব্যাটাচ্ছেলে ! মনে কর্—রেলের কোনো কেতা-দুরস্ত বাবু চুলের ডগা থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত ভদ্দরলোক—ওয়াগনভর্তি লাখ টাকার মালকে চালান করে দিলে সাইডিঙে—বললে, এম্‌টি ওয়াগান। তারপর লরী এনে মাল ধীরে-সুস্থে বের করে নিলেই হল। বল্ —এ-সব ভদ্দরলোকের চলছে না ?'

'ওরা তো গা বাঁচিয়ে চলে। তুই একদিন গুলি খেয়ে মরবি।'

'ব্যাস্—ওই পর্যন্তই। মরবার পরে তো আর কোনো ভাবনা নেই। আমি

বলছি টুলু, চলে আয় আমাদের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে কেমন বেসুরো গাস তুই— ভিড়ে পড়—দেখবি কী থ্রীল—শরীর-মন টান-টান হয়ে থাকবে।'

'তার চেয়ে পলিটিক্স করলে কেমন হয়?'

'ধ্যাৎ!' সিগারেটটায় মানিক এমন টান মারল যে আঙুলের কাছে পৌঁছে গেল তার আগুনটা। 'ওদের মালকড়ি কী আছে? যা দু-চারটে টাকা ছোঁয়ায় ইলেকশনের সময়। একবার পেরিয়ে গেল তো আর পাত্তা নেই মক্কেলদের। তবে এক ধাক্কায় মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে নেহাৎ মন্দ হত না—কিন্তু সে মওকা তো আর তোমায় কেউ দিচ্ছে না।'

টুলু আবার চুপ করে রইল।

সামনে সাদান অ্যাভেনিউ দিয়ে ডবল ডেকার গেল একটা। মানিক হাসল।

'এই দোতলা বাসগুলো যখন পোড়ে না, তখন বেশ লাগে দেখতে।'

'পুড়িয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, দুবার।'

'ও-সব তো পলিটিক্সওয়ালারা করে, তুই কী বলে গেলি ওর ভেতর?'

কৌতুকে চোখ দুটো ঝিকমিক করতে লাগল মানিকের।

'সে বেশ মজা হল, জানিস। ছেলেগুলো খেপেই বেরিয়েছিল মিছিল নিয়ে। একটা দোতলা বাস দাঁড়িয়ে গেল সামনে। বেশ চকচকে নতুন বাস রে— কোথাও চোটফোট খায়নি তখনো। বললুম, 'এগিয়ে আসুন দাদারা—ওই তো রয়েছে সরকারী বাস—দিন ওটাকে জ্বালিয়ে। কাছেই কেরোসিনের একটা দোকান ছিল, আনলুম একটা টিন টেনে। তারপর—' মানিকের চোখ দুটো ক্রমেই উজ্জ্বল হতে থাকল: 'যা জ্বলল না—কী বলব তোকে! ফায়ার-ব্রিগেড আসছিল, খানকয়েক হট খেয়েই হাওয়া।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানিক বললে, 'শালা ঝকঝকে চকচকে কিছু দেখলেই মাথায় আমার আগুন ধরে যায়। ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে এক ভদ্দরলোক যাচ্ছিল, পাশ থেকে এমন এক কনুইয়ের ঘা মারলুম যে হুড়মুড়িয়ে একরাশ ময়লার মধ্যে পড়ে গেল। দু-তিনটে মেয়ে বেশ বাহার দিয়ে বোধ হয় বায়োস্কোপে যাচ্ছিল—এক শিশি কালি ছুঁড়ে দিলুম তাক করে—বুঝলি, ঠিক বোমার কাজ করল—কাঁদতে কাঁদতে সব কটাই দৌড়ুল বাড়ির দিকে। আচ্ছা গোটা কলকাতার সব বড় বড় বাড়ি, সব ট্রাম-বাস যদি একসঙ্গে আগুনে

পুড়তে থাকে আর সব মেয়ে-পুরুষকে যদি কালি দিয়ে নাইয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বেশ হয়—না রে? খুব চমৎকার লাগে—তাই না?'

'কী বিটকেল সব ভাবনা তোর।'

'তুই উল্লুক একটা, মনেপ্রাণে নিপাট ভদ্দরলোক। এ-সব তুই বুঝবি না—' বলতে বলতে মানিকের দৃষ্টি চলে গেল অন্যদিকে, টুলুর কাঁধে একটা থাবড়া মারল সে।

'ওই মেয়েটাকে দেখছিস। ওই যে—গোলাপী শাড়ি পরা?

'হুঁ, দেখছি।'

'কিভাবে জামা-কাপড় পরেছে বল্ তো মাইরি। ওটুকু আর রাখা কেন দিদিমণির? মামলা একেবারে মিটিয়ে ফেললেই তো হয়।'

'তুই গিয়ে বলে আয় না কথাটা।'

'বলতুম। কিন্তু সঙ্গের লোকটা একটু ষণ্ডা চেহারার, তা ছাড়া দলটাও তো নেই আজকে। কিন্তু মাইরি—তুই-ই বল্ না—এমনি করে সেজে লোককে উস্কানি দেবে, আর আমরা একটা সিটি মারলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয় গেল? আমাদের দেখাবে বলেই রাস্তায় নেমেছ, আব আমরা দেখবার জন্যে তাকালেই মানে টোসকা পড়ে যায়? সাধে কি আর ওদের গায়ে কালির বোতল ছুঁড়তে ইচ্ছে করে!'

'তুই বড্ড বকছিস আজকাল। চল্, চা খাওয়া।'

'চা কেন—' মানিক পকেট থাবড়ালো: 'পকেটে কিছু আছে আজ। চল্ না সন্ধ্যের পরে একটু—'

টুলু মাথা নাড়ল।

'না—দু-চারদিন যাক। মা বড্ড কান্নাকাটি করছিল।'

'তুই ভালো ছেলে হওয়ার চেষ্টা করছিস।'

'ক'দিন একটু সামলে চলতে হবে—', টুলু আবার অন্যমনস্ক হল। কাল রাত্রে দাদা ভারী বিশ্রীভাবে স্বপ্নার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতে ভোলা যাচ্ছে না—কোনোমতেই না। বুকের ভেতরে সেই থেকে যন্ত্রণা থমথম করছে একটা। মনে হচ্ছে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেল, সব অন্যরকম হতে পারত, সব অন্যরকম হলে কোনো ক্ষতি ছিল না।

'তা হলে চল্ ব্রীজের ওপারে। ক'দিন ধরে দেখছি দুটো কালো কালো অল্পবয়েসী মেয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব খলবল করে—চনমনে চোখ। ভাব

জমানো যাবে মনে হচ্ছে। শিকার ধরার লাইনে—'

'ধেৎ—এসব ছাড়া কিচ্ছু ভাবতে পারিস নে তুই ?'

'আর কী ভাববার আছে, তুই বল্ ?' মানিক হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল : 'তা হলে চল্ সন্ধ্যেবেলা মাঠের দিকে, ক'দিন ধরে খুব কেত্তন-টেত্তন হচ্ছে। ধম্মো হবে।'

টুলু বললে, 'থাম্—সিগ্রেট দে আর একটা।'

আবার সিগারেট ধরালো দুজনে। আব এতক্ষণে মানিকের একটা কথা মনে হল।

'ভালো কথা, তোকে যে আগে ছেড়ে দিলে ?'

'দাদা তদ্বির করেছিল।'

'ও-রকম দাদা থাকা ভালো মাইরি।' মানিকের নিশ্বাস পড়ল : 'আমার বাবা হলে কী বলত, জানিস ? ধরে নিয়ে গেছে, বেশ হয়েছে। যদি ফাঁসি দেয় আরো ভালো হবে তা হলে।'

'দাদা ভালো না কচু। এমন এক-একটা কথা বলে যে—'

টুলু আবার থামল। সেই স্বপ্না। কিভাবে শুরু হয়ে কোথায় যে থমকে গেল সমস্ত! আর এগুলো মনে পড়ে গেলে কিছুই আর ভালো লাগে না, কিছুই না। রাত্রে যখন ঘুম আসে না, শরীরটা এলিয়ে পড়ে থাকে—মনের সামনে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু করতে থাকে সব, তখন স্বপ্নাকে ভাবলে—ভাবলেই বুকের ভেতরে কী যেন তির-তির করে কান্নার মতো কাঁপে। আচ্ছা স্বপ্না যদি কখনো জানতে পারে যে, সে গুণ্ডামি করে হাজতে গিয়েছিল, তা হলে তখন —

'ও দুটোকে ছাড়ল না, না ?'

'না। তবে হয়তো দু-একদিন পরেই বের করে দেবে।'

'আমার সন্দেহ আছে।' মানিক চিন্তিত হল : 'ওদের ধারণা ফনে ছিন-তাইয়ের দলে আছে।'

'তাই কি ?'

বাঁকা চোখে তাকিয়ে মানিক বললে, 'আমি কী জানি ?'

'তুই জানিস নে ?'

'তোমার মা তো লুকিয়ে-চুরিয়ে হাতখরচা দেয় চাঁদ। ওর খরচ কে যোগায় ? একজন ভদ্দরলোকের একটা হাতঘড়ি গেলে সে পরদিনই আর একটা কিনতে

পারবে, কিন্তু ওকে তো মা-বাপকে খাওয়াতে হবে। ওর বাপ তো এক বছর কারখানার চাকরি খুইয়ে বসে আছে।'

'তবু এসব করে—'

'কী করবে রে রাস্কেল, কী করবে? রাস্তা বাতলে দিতে পারিস?' মানিকের চোখ হঠাৎ দপ করে উঠল: 'আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে খুব ভালো মেয়ে বুঝলি —আমরাও কোনোদিন কুনজর দিইনি, বাড়িসুদ্ধ খেতে না পেয়ে এখন কী করছে জানিস তুই? জানিস কেন সে এখন বড় বড় মোটর-গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায়?'

টুলু চুপ করে রইল।

'ভালো ভালো কথা বলিসনি, শুনলে গা জ্বালা করে।'

'মরুক গে, চল্—চা খাওয়াবি। পকেটে কিচ্ছু নেই।'

'মার কাছ থেকে কিছু পাসনি?'

'চাইতে সাহস হল না। মার মেজাজ ভালো নেই।'

'বললুম তো, চলে আয় না আমার সঙ্গে। পয়সাও আছে, থ্রীলও আছে।' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করল মানিক: 'দেখছিস তো।'

'না—আমি পারব না।'

'তুই একটা কাওয়ার্ড।'

'তা বলতে পারিস।'

'তোর আমাদের সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।'

'তাই ভাবছি। এবার দল ছাড়ব তোদের।'

তারপর কী করবি? ভদ্দরলোক হবি?'

'চেষ্টা করে দেখব।'

মানিক আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসলি যে?'

'পারবি না। বাবার টাকা মেরে দিয়ে, কেলেঙ্কারি বাধিয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসবি। আর—'

সেই সময় একটা মোটর এসে একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। ভেতর থেকে দিদির তীক্ষ্ণ গলা কানে এল: 'টুলু—'

টুলু চমকে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল সিগারেটটা।

দিদি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। পেছনের সীটে টিনটিন আর বাড়ির

কুকুর ক্যাসিয়াস।

দিদি গলা বাড়িয়ে তেমনি তীক্ষ্ণ নীরস গলায় বললে, 'গাড়িতে উঠে আয় টুলু, তোকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি।'

আট

ব্লক 'স, এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ডোর-বেলটা টিপেও মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর মনে হল, দরজার ওপরে কাচ-বসানো ছোট গোল গর্তটির ভেতরে যেন একটি তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। দরজাটা খুলল তারও পরে।

সাবিত্রী বললে, 'ও তুমি ?'

প্রবীর বললে, 'খুব নিরাশ হয়েছ মনে হচ্ছে। আর কাউকে আশা করে-ছিলে নাকি ?'

একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসল সাবিত্রী।

'আশা করতে দোষ কী ? তুমি তো ভুলেই গেছ। কিন্তু দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে—ভেতরে আসবে না ?'

দু ঘরের কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট। একা সাবিত্রীর জন্যে এর বেশি জায়গা দরকার হয় না। বাইরের ঘরে তার বইপত্র, কটি বসবার আসন। অল্প খরচে যেটুকু সাজিয়ে রাখা যায়।

সাবিত্রী বললে, 'একটু বোসো, আসছি।'

একটা টিপয় থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

দুটো পেয়ালা। তার মানে দুজনে চা খাচ্ছিল একসঙ্গে। এবং অনুমান করা যেতে পারে, চা খাওয়াটা এই মাত্র শেষ হয়েছে। আজ সাত বছর ধরে সাবিত্রীর স্বভাব তার জানা। সব জিনিস সে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখতে ভালবাসে। চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা-পিরিচ ফেলে রাখবে সে ধাতই তার নয়। তা হলে এক্ষুনি একটু আগেই আর কারো সঙ্গে চা খাচ্ছিল সে।

অবশ্য সে যে-কেউ হতে পারে। হয়তো তার কলেজের কোনো সহকর্মী এসেছিল, কোনো ছাত্রী আসতে পারে, যে-কোনো আত্মীয়স্বজনেরও আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু দরজার বেল বাজিয়েও দু মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল কেন ? এবং সাবিত্রী দরজা খুলে দিলে কেন মনে হল, তার মুখে-চোখে একটা

ভয়ের ছাপ পড়েছে কোথাও!

নিজের ভাবনার গতিটা লক্ষ্য করে প্রবীর লজ্জিত হল। ছি ছি, গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি সে! অথবা একটা জেলাসির কাঁটা খচ-খচ করে উঠেছে তার মনের ভেতরে? কিন্তু জেলাসির তো কারণ নেই কিছু। সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা তার গড়ে উঠেছে গভীর একটা বন্ধুত্বের মতো। হয়তো যে-কোনোদিন একদিন বলা যেতে পারত: 'এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি' এবং সাবিত্রীও হয়তো বলতে পারত: 'আপত্তি নেই, করো বন্দোবস্ত।' কিন্তু বলা হয়নি। ঠিক বলবার মতো সময়টাই আসেনি, কিংবা মেজাজটাই তৈরি হয়নি, অথবা অবচেতনভাবে এই বাধাটাই প্রবীরের ছিল—সাবিত্রী এম.এস্-সি., কলেজে পড়ায়, তার মতো সাধারণ গ্র্যাজুয়েট একজন করণিককে বিয়ে করাটা তার পক্ষে—

অতএব সময় গড়িয়ে গেছে। সাবিত্রীও তো এগিয়ে এল ত্রিশের দিকে। এখন যদি কাউকে তার ভালো লেগে থাকে, বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং এই মুহূর্তে লাল কালিতে ছাপা একখানা হলুদ রঙের চিঠি হাতে করে সে যদি এসে বলে, 'আসছে সোমবার আমার বিয়ে, এসো কিন্তু—' তা হলে হাসিমুখে অভিনন্দন জানাতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

সাবিত্রী এল। হলুদ রঙের চিঠিখানা অবশ্যই তার হাতে ছিল না।

'তোমার জন্যে জল চাপিয়ে দিয়ে এলুম।'

'আর তুমি?'

'আমি এক্ষুনি খেয়েছি।'

'কার সঙ্গে'—এই প্রশ্নটা এগিয়ে এল মুখের সামনে। সেই জেলাসি। ছি ছি, কোনো মানে হয়!

সাবিত্রী মুখোমুখি বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললে, 'একেবারে ভুলে গেছ মনে হয়।'

'কী করব? আমি থাকি দক্ষিণের শহরতলীতে, তুমি ফ্ল্যাট কিনলে উত্তর মেরুতে। তোমার কাছে আসতে হলে এক মাস আগে থেকে প্রোগ্রাম করতে হয়।'

আবার হাসল সাবিত্রী।'

'আগে হলে আমার কাছে আসবার জন্যে বর্ধমান পর্যন্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেও তোমার আপত্তি হত না।'

'ঠিক কথা। কিন্তু উভয়ত। আগে হলে সপ্তাহে অন্তত দিন তিনেক

দক্ষিণ শহরতলীর আলো-বাতাস তোমার খুব স্বাস্থ্যকর বলে মনে হত।'

'শোধবোধ। কিন্তু কী হয়েছে জানো—ল্যাবরেটরি থেকে প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস সেরে বেরুতে বেরুতে প্রায়ই সন্ধ্যে হয়ে যায়! তা ছাড়া দু-চারজন স্টুডেণ্টও আসে, তাদেরও দেখিয়ে দিতে হয় এক-আধটু।'

'মানে টিউশন? কলেজের মাইনেয় একা মানুষের চলে না? খুব টাকা জমাচ্ছ বোধ হয়?'

সাবিত্রী আবার হাসল: 'সবাই টাকা দেয় না। কিন্তু টিউশন তো করতেই হবে। কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনেছি জানোই তো! সে টাকা শোধ তো করতে হবে।'

'ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলে। ভেবেছিলুম, ধার চাইব।'

'টাকার দরকার তোমার?' সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হল: 'নেবে তুমি? শ'-তিনেক টাকা পেয়েছি ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে—কাছেই রয়েছে। নিয়ে যাও না।'

'যদি শোধ না দিই?'

'দিতে হবে না।'

'এরকম মহাজন তো পাওয়া যায় না।'

'মহাজন ঠিকই বসে আছে।' সাবিত্রীর চোখের তারা নিবিড় হয়ে এল: 'বসে বসে তার দিন কাটে। কিন্তু খাতকেরই দেখা নেই—সাধ্য-সাধনা করেও তাকে পাওয়া যায় না।'

সেই সাবিত্রী। জেলাসির খোঁচাটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সাবিত্রী আবার বললে, 'সত্যি, নাও না টাকা। তুমি টাকা নিলে আমার খুব ভালো লাগবে। তোমাকে তো কোনোদিন আমি কিছু দিতে পারিনি!'

সময়টা ঠিক এখনই। এখনই বলা যায়, শুধু টাকা কেন, টাকার মালিককে পর্যন্ত আমার দরকার। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে বাধাটা একটা সীমার পরে আর এগোতে দেয়নি, এবারও সেইটেই এসে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে।

সাবিত্রীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে প্রবীর।

'সত্যি টাকার দরকার নেই এখন। হলে নিশ্চয় চাইব। তুমি ছাড়া কার কাছে চাইতে পারি আর।'

হাতের চাপটা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। একটা চাপা যন্ত্রণার শব্দ বেরুল সাবিত্রীর মুখ থেকে।

'কী হল, লাগল ?'

'না না—' সাবিত্রী লজ্জা পেলো : 'এমন কিছু নয় ।'

হাত খুলে গিয়েছিল দুজনের। প্রবীরের চোখে পড়ল, সাবিত্রীর বাঁ হাতের তর্জনীতে ফ্লেশ-কালার ব্যাণ্ডেজ একটা।

'কী হয়েছে হাতে ?'

'কিছু না। ল্যাবরেটরিতে একটা টেস্ট্-টিউব ভেঙে গিয়ে—'

'সাবিত্রী ?'

'অ্যাঁ।'

'আমাদের দুজনেরই বয়েস বাড়ছে—না ?'

'বাড়ছে।'

'এরপরে আমরা বুড়িয়ে যাব।'

'তাই নিয়ম।'

'এখন ভাবছি—'

সাবিত্রী দু চোখভরা স্নিগ্ধতা নিয়ে তাকালো।

কিন্তু কী বলা যায় ? সময়টা আবার ফিরে এসেছে। কিভাবে বলা যায় কথাটা ? অথবা বলা যায় না আদৌ ? কতখানি পর্যন্ত মনের দিক থেকে এগিয়ে আছে সাবিত্রী ? সে নিজেও ? টুলুটা বখে যাচ্ছে। চারদিকে থমথম করছে অনিশ্চয়তা। সেও কি তৈরি হতে পেরেছে ?

'দিদি, অগত্যা চা-টা আমাকেই করে আনতে হল।'

ঘরের ভেতরে একটা বোমা ফাটলেও এতখানি চমক লাগত না দুজনের। সাবিত্রী প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, বেকুবের মতো চেয়ে রইল প্রবীর।

চায়ের পেয়ালা হাতে করে আনন্দ।

আনন্দ আবার বললে, 'দেখলুম চায়ের জল চাপিয়ে স্রেফ ভুলে গেছে সাবিত্রীদি, ওদিকে সব জল স্টীম হয়ে আকাশে রওনা দিয়েছে। তাই তোমাদের আর ডিস্টার্ব না করে নিজেই ভুলুদার জন্যে চা করে আনলুম। কিছু মনে কোরো না সাবিত্রীদি, যদিও তুমি এক্ষুনি আমায় চা খাইয়েছ, তবু নিজের জন্যে আর একবার হাফ কাপের লোভ সামলাতে পারলুম না।'

বলে নির্বিকারভাবে চায়ের একটা পেয়ালা নামিয়ে দিলে প্রবীরের সামনে।

প্রবীর এক ঢোঁক গিলল : 'আনন্দ, তুমি এখানে ?'

'একেবারে চলতি অর্থে অতিথি, ভুলুদা। ভোরবেলা উঠে সাবিত্রীদিকে

জাগিয়েছি, আবার আজকে শেষরাতে উধাও হয়ে যাব। তোমাদের গল্পে ডিস্টার্ব করলুম, কিছু মনে কোরো না। আমি আবার গা-ঢাকা দিচ্ছি যবনিকার অন্তরালে।'

'তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না—' সাবিত্রীর ফর্সা গালে লালের ছোপ পড়ল। হাতে হাত মেলানোটা লক্ষ্মীছাড়া আড়াল থেকে দেখেছে কিনা কে জানে! সাবিত্রী বললে, 'বলেছিলি তোর কথা যেন কাকপক্ষীতেও জানতে না পারে। বেরিয়ে এলি যে?'

'ভুলুদার অনারে।' আনন্দ হাসল: 'পাশাপাশি বাড়িতে যখন থাকতুম, তখন অনেক আইসক্রীম আর ডালমুট খাইয়েছে ভুলুদা। ওর জন্যে এক কাপ চাও আমি করে দেব না?'

সাবিত্রীর গালে তখনো লালের আভা। 'সত্যি—চায়ের জল যে চাপিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। ডাকলিনি কেন আমাকে?'

'ডিসটার্ব করাটা উচিত হবে বলে মনে হল না।'

'তুই ভারী ফাজিল হয়ে গেছিস আনন্দ।'

শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়েও আনন্দ সামলে নিলে। আবার ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল, প্রবীর তাকে ডাকল। আনন্দ ফিরে এল।

'বোসো আনন্দ।'

আনন্দ আড়চোখে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'থ্রী ইজ এ ক্রাউড।'

'বেশি জ্যাঠামো করিসনি, চড় লাগাবো একটা।'

ডোর-বেল টিপে দু মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা, গর্ত-বসানো কাচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখের দৃষ্টি, সাবিত্রীর মুখে একটা ভয়ের ছায়া—প্রবীরের কাছে সবগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ বসে পড়ে বললে, 'চা খাচ্ছ না কেন ভুলুদা? একেবারে অখাদ্য হয়নি তা বলতে পারি তোমাকে।'

চায়ে চুমুক দিলে প্রবীর।

'চায়ের কথা ভাবছি না, কিন্তু এ কী চেহারা করেছ আনন্দ?'

'এর চেয়ে ভালো কী করে থাকা যায় প্রবীরদা! তোমাদের পুলিস রাতদিন তাড়া করে ফিরছে যে। তাদের ধারণা দু-তিনটে জোতদারের যে অপঘাত ঘটেছে, তার জন্যে নাকি আমিই দায়ী।'

'কে দায়ী, সে তোমরাই জানো আর পুলিসই জানে! কিন্তু আমাদের পুলিস বলছ কেন?'

আনন্দ নিজের চা-টা শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল একটু।

'তোমাদেরই তো রাজত্ব এখন। যুক্তফ্রন্টের।'

'যুক্তফ্রন্ট সকলেরই—', সাবিত্রী বলে উঠল, 'তোদেরও।'

'আমাদেরও? না। আমরা ওতে বিশ্বাস করি না।'

'কেন করিস নে? তোরা যা করছিস সে পথ ধরে কোথায় পৌছুবি?'

'আমরা কোথায় পৌছুব তার জবাব পরে দিচ্ছি—' চোয়াল ভেঙে যাওয়া গালের ওপর কালিপড়া কোটরের ভেতরে দুটো চোখ দপদপ করে উঠল আনন্দর: 'কিন্তু সাবিত্রীদি—যুক্তফ্রন্ট বলতেও দেশ নয়—চোদ্দটা দল মাত্র। তারপর এর হাঁড়ি ধরে ওর টানাটানি, এর নামে ওর কুৎসার পাঁচালি, শেষে এর মাথায় ওর লাঠি-হাঁকড়ানো। কী হল শেষ পর্যন্ত? অক্সিজেন দিয়েও বাঁচাতে পারবে না এখন। অথচ কী বিশ্বাসই করেছিল দেশের লোক, আর কত স্বপ্নই দেখেছিল আবু হোসেনের মতো!'

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'কিছুই হয়নি বলতে চাও?'

'ষোলো আনার প্রমিজ ছিল, দিয়েছ আধ পাই। এর চাইতে কোন্ অংশে খারাপ ছিল কংগ্রেস? তাদের অন্তত একটা পার্টিগত ইউনিটি ছিল। তোমরা হয়তো তাদের চেয়ে আধ পাই কিংবা এক পাই বেশি দিয়েছ, কিন্তু কোন্ মূল্যে? আগে অন্তত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য ছিল—সংগ্রামের একটা সর্বজনীন রূপ ছিল। তোমরা তাদের মধ্যে তৈরি করেছ ভাঙন—একদল কৃষক নিয়ে আর একদল ক্ষুধিত কৃষকের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এক জঙ্গী শ্রমিক, মালিকের দালালকে নয়—আর এক জঙ্গী শ্রমিককে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে, এই হল তোমাদের যুক্তফ্রন্টের অবদান!'

'বেনামদার জমি দখলের ব্যাপারে দু-চারজন কৃষক খুন হয়েছে হয়তো; ধান-কাটা নিয়ে প্রতি বছর বাংলায় যে সব দাঙ্গা হয়—'

'মন্ত্রীত্বের গদীতে বসে প্রেসের কাছে ও-রকম বিবৃতি দাও দাদা—বেশ ভালো দেখাবে। কিন্তু নিজেরাই ভালো করে জানো যে কত ফাঁকি আছে এ-সবের মধ্যে! কিন্তু তোমাদেরও দোষ নেই। পার্লামেণ্টারি রাস্তায় বিপ্লব করতে গেলে এইরকম অত্যাশ্চর্য ফলই লাভ হবে।'

'কিন্তু তোমাদের সশস্ত্র বিপ্লব এত সহজে আসবে? তোমরা চীনের পথ সামনে রেখেছ, কিন্তু লং-মার্চের দেশ-কালের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত ঘটে

গেছে এখন। এই ভারতবর্ষে ক'ইঞ্চি জমি আছে যেখানে মুক্তাঞ্চল গড়বে তোমরা? ইণ্ডিয়ান আর্মি চিয়াঙের সেই অসন্তুষ্ট বিশৃঙ্খল বাহিনী নয় যে রাইফেল কাঁধে করে তোমাদের সংগ্রামের শরিক হবে। ম্যাকাডাম রোড—হেলিয়োকপ্টার —সাঁজোয়া গাড়ি—মডার্ন মিলিশিয়া—কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে সামনে?'

আনন্দ মুচকে হাসল।

'একটু স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে ভুলুদা। সামনে ভিয়েতনাম রয়েছে।'

হ্যাঁ, ভিয়েতনাম। কিন্তু কিছু বিদেশী আর কিছু ভাড়াটে সৈন্য ছাড়া সেখানে প্রতিজন দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকের মনে মার্কিন জঙ্গীবাদের ওপর অসহ্য ঘৃণা। কিন্তু সেই মানসিক ঐক্য আছে ভারতবর্ষে? যেখানে থেকে থেকে সাম্প্রদায়িকতার নাড়ীতে টংকার বেজে ওঠে, গুপ্তধন পাবার আশায় এখনো লোকে নরবলি দেয়, গো হত্যা বন্ধ নিয়ে দিল্লিতে সব চাইতে বড় আন্দোলন ফেটে পড়ে আর সাধুরা নেয় তার নেতৃত্ব, সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ ছাত্র আর বঞ্চিত কৃষক কতদূর পর্যন্ত এগোবে বিপ্লবের রাস্তায়? রাইফেলই শক্তির উৎস—নিশ্চয়। কিন্তু কটা রাইফেল যোগাড় করতে পারবে তোমরা? আর বাকী সম্বল কি তীর-ধনুক? এবং তাই দিয়ে মোকাবিলা করবে ট্যাঙ্ককে, মেশিনগানকে, বোমারুকে?'

'ভিয়েতনামের গেরিলারা কী করে মোকাবিলা করছে ভুলুদা?'

'কারণ ওদের মধ্যে ট্রেটর নেই। সভ্যতার সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে সেখানকার মার্কিনী ফৌজ শিশু-নারী-বুড়োর ওপর সব রকম ডায়াবোলিক এক্স-পেরিমেণ্ট চালাচ্ছে—কিন্তু একজনের মুখ থেকে একটি গেরিলার খবর বের করতে পারে? এখানে তোমাদের ঘরে ঘরে শত্রু দেখা দেবে। তারা সবাই ট্রেটর নয়, কিন্তু তাদের অন্য মত আছে, অন্য আদর্শ আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী শক্তির চেহারা বাংলা আর কেরল থেকে—অন্ধ্রের কটি অঞ্চল থেকে—তোমরা অনুমানও করতে পারো না। শেষ পর্যন্ত সেই শক্তির চূড়ান্ত রূপ যখন শিক্ষিত সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে—তখনকার অবস্থা ভাবতে পারো? ভারতবর্ষে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা তৈরি হোক, তাই কি তোমরা চাও? দেশের মাটি যদি পায়ের তলায় জায়গা দিত, তা হলে চে গুয়েভারার মতো অত বড় বিপ্লবীকে অমন করে হারাতে হয়?'

একটু চুপ করে রইল আনন্দ। খুব সম্ভব প্রবীরের বক্তৃতার তোড়ে কথা বলবার জায়গা পাচ্ছিল না, নিজের ভাবনাগুলোর খেই হারিয়ে ফেলছিল।

সাবিত্রী বললে, 'কেন তর্ক বাড়াচ্ছ? এর শেষ হবে না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল: 'হ্যাঁ, তর্কের শেষ হবে না ভুলুদা। কিন্তু সত্যটা সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বিপ্লব যখন আসে, তখন সৈনিক আপনিই দেখা দেয়—তখন তার উজ্জ্বল প্রবলতার সামনে সমস্ত কূট-কচাল কুটোর মতো উড়ে চলে যায়। লেনিন তা জানতেন বলেই অক্টোবর বিপ্লবকে জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তোমাদের মতো এই সব মেনশেভিক চিন্তার ভেতরে পাক খাননি। তোমরা আমাদের বলো অ্যাড্‌ভেঞ্চারিস্ট, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ নাড়া খেয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছ সেটা?'

'একটা টেরর তৈরি হয়েছে, তার প্রথম শক। ভয় এবং বিহ্বলতা। সেটা কাটিয়ে উঠলেই প্রতিক্রিয়া। পার্লামেণ্টারি ডিমোক্র্যাসি ভেঙে ফেলতে চাও? চমৎকার কথা। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টা কী, জানো? বীভৎস এক সিভিল ওয়ার। তাতে জমিদারী-পুঁজিবাদী-সাম্প্রদায়িকতাবাদী সব একসঙ্গে হাত মেলাবে। তার শেষ ফল: নৃশংসতম নরহত্যার পালা শেষ হয়ে পাকা ফ্যাসিজমের রাজত্ব। তখন ইন্দোনেশিয়ার মতো তোমাদের চিহ্নও আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কিংবা উল্টোটা। নিশ্চিহ্ন হবে ভারতবর্ষের জমিদার-কুলাক্-হোয়াইট্ গার্ডস। তোমরা যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের লেজুড় আঁকড়ে পড়ে আছো—যে দলেরই হও, হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে উড়ে যাবে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায়। ভুলুদা তোমরা ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে রক্তহীন বিপ্লব ঘটাতে চাও। তুমি কি মনে করো পৃথিবীজোড়া শয়তানদের ওভাবে শায়েস্তা করা যায়! যখনই ব্যালট বাক্স তখনই দল। যখন দল, তখনই দল বাঁচাবার আর বাড়াবার জন্যে নানা লোকের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করছ তোমরা—অ্যাণ্টিসোশ্যালগুলোকে পর্যন্ত সৈনিকের তকমা দিচ্ছ—যারা পরে তোমাদেরই গলায় ছুরি দেবে। তোমাদের যুক্তফ্রণ্টের সাপোর্টার এক জোতদারকে আমরা সাবাড় করেছি। এই লোকটার টাকা কি করে হল জানো?' বলতে বলতে কপালের শিরা ফুলে উঠল আনন্দর, দপদপ করতে লাগল চোখ: 'মাত্র দুশো টাকা ধার দিয়ে কম্পাউণ্ড ইণ্টারেস্টে একটা লোকের বারো বিঘে সে কেড়ে নিয়েছে—সে লোকটা এখন ক্ষেতমজুর, তার বউ গত বছর খেতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এদের সঙ্গে গলাগলি করে তোমাদের রক্তহীন বিপ্লব কবে আসবে জানি না ভুলুদা, কিন্তু আমরা আর এক দিনও দেরি করতে রাজী নই—এক মুহূর্তও না। উই আর নট টু মেনড এনিথিং, বাট উই আর টু এণ্ড এভরিথিং!'

বলতে বলতে ঘরময় পায়চারি করছিল আনন্দ—মনে হচ্ছিল যেন খাঁচার ভেতরে একটা বুনো জানোয়ার অশ্রান্তভাবে ছটফট করছে। কথা শেষ করে সে জানলাটার পাশে দাঁড়ালো, পর্দাটা একটু সরালো, কিছু দেখল, তারপর ফিরে এল দুজনের কাছে।

মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে গেছে তার। হঠাৎ যেন দপ করে নিবে গেছে উত্তেজনাটা।

সাবিত্রীর সামনে এসে একটু হাসল আনন্দ।

'নাঃ, রাতে তোমার রান্না খাওয়া আমার বরাতে নেই দিদি। হয়তো তোমাকেও বিপন্ন করলুম। যে লোকটি এইমাত্র তোমার জানলার দিকে লক্ষ্য রাখছিল, তাকে আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু। সুতরাং এবারে আমার ঝোলাটা দাও—আর কোথাও ঠাঁই মেলে কি না দেখি।'

নয়

থানার দারোগার সামনেও বোধ হয় এমন বিপদে পড়তে হয়নি।

দিদির দু' চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছিল। ভেতরে উত্তেজনা যত বাড়ছে, দিদি ততই ঘেমে উঠছে, ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ছে গলার পাউডার। মাথার ওপরে বারো ইঞ্চি পাখার ঘূর্ণিতেও দিদির ঠাণ্ডা হওয়ার লক্ষণ নেই কোথাও।

'তুই গোল্লায় গেলি—অ্যাঁ? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গুণ্ডার দলে ভিড়লি শেষে?'

'দিদি, এসব বাজে কথা—'

শেষ বোমাটি এতক্ষণ পর্যন্ত দিদির হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ছিল। এইবারে দিদি ফাটিয়ে দিল সেটাকে।

'বাজে কথা এসব? তা হলে তোকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়?'

প্রতুলের মুখ বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে—প্রাণ চমকে উঠল। এ খবরটাও পৌঁছে গেছে? অন্তর্যামী নাকি? কিংবা—

'ছি-ছি-ছি! তোর জন্যে শেষে আমাদের সবাইকে কলকাতা ছাড়তে হবে টুলু? লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে বলতে পারিস?'

'দাদা বলে গেছে বুঝি?'

'তুলু বলবে কেন? কীর্তির ঢাক তো চারদিকে বাজছে। আজকে হাইকোর্টে

ওঁর সঙ্গে মুরারি হালদারের দেখা হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকই তো দারোগাকে বলে তোকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন—দেননি ?'

প্রতুল চুপ।

'উনি তো হাইকোর্ট থেকে ফিরে একেবারে শুয়ে পড়লেন। বললেন, উমা, তোমার ছোট ভাইয়ের জন্যে এ পাড়ায় আর থাকা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চাইতে চলো—শ্যামবাজারের বাড়িতেই ফিরে যাই। তুই শেষে এই করলি টুলু ?' দিদি কেঁদে ফেলল। এতক্ষণ ঘামে গলার পাউডার গলছিল, এবার গালের রঙ গলতে লাগল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদি বললে, 'মা-টা না হয় ইডিয়ট, কিন্তু ভুলু কী করছে ? সে তো দারুণ লেফ্‌টিস্ট, অফিসের ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামায়। সেও তোকে একটু দেখতে পারে না ? আর তুই-ই বা কী ? লেখাপড়ায় এত ভালো ছিলি, এত মাথা ছিল—এমনভাবে শয়তানে তোকে পেয়ে বসল কী করে ?'

'সত্যি দিদি, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম—'

'চুপ কর্‌ লক্ষ্মীছাড়া।' দিদির ভিজে ভিজে চোখে আবার আগুন ধরে উঠল : 'আমি তোমার দলবলকে চিনি নে—না ? লেকের ধারে কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াস তুই ? যে-ছোকরাটা তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল—কে ও ? ভদ্রলোকের ছেলে ? ওই রকম পোশাক-আশাক—ওই চেহারা ?'

কিছু একটা বলবার কথা ভেবে এবং বলে কোনো লাভ হবে না বুঝে প্রতুল এবার চুপ করে রইল। দিদির ধিক্কার আর ক্ষোভের পালা প্রায় দশ মিনিট ধরে একটানা আর একতরফা চলতে লাগল। ফলে প্রতুলের গলা-বুক শুকিয়ে উঠল, ঘাম জমতে থাকল তারও কপালে, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলোতে লাগল মধ্যে মধ্যে, আর থেকে থেকে যেন মনে হতে লাগল পর্দার ওপারে টিন-টিনের একজোড়া কৌতূহলী চোখ বারে বারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। দিদি এ ঘরে প্রতুলকে বসিয়েই টিনটিনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, 'তোমার ছোট মামার সঙ্গে আমার কিছু ডিস্কাশন আছে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। না ডাকলে কক্ষণো আসবে না।'

এবং তা থেকে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। এমনিতেই হয়তো টিনটিন চলে যেত নিজের ঘরে, কিন্তু দিদি তার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। আর টিনটিন

নিঃশব্দে মায়ের আদেশ পালন করছে। ভেতরের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে বলে দিদি কিছু টের পাচ্ছে না, কিন্তু পর্দার জোড়ের ভেতর দিয়ে মধ্যে মধ্যে স্কার্টের ঝলক, দুটো ছোট ছোট পা এবং একজোড়া চোখের আভাস প্রতুলের দৃষ্টি এখন আর এড়িয়ে যাচ্ছে না। মেয়েটা খুব ভালো আড়ি পাততে পারে দেখা যাচ্ছে।

অন্য সময় হলে শব্দ করে হেসে উঠত সে। কিন্তু সামনে এখন দিদি বসে আছে হাইকোর্টের জজের মতো, আর তাকে নিয়েই বিচারটা চলছে। অগত্যা মুখের পেশী শক্ত করে প্রতুল বসে রইল।

দিদি বললে, ‘হাজার হোক তুই আমার ভাই। তোকে আমি এভাবে বয়ে যেতে দিতে পারি না। এবার তার ভার আমাকেই নিতে হবে।’

প্রতুল কান খাড়া করল।

‘কালকে দশটার আগে চলে আসবি এখানে। ওঁর সঙ্গে বেরুবি।’

‘মণীশদার সঙ্গে?’—প্রতুল থতমত খেলো: ‘কোথায় বেরুব?’

‘ওঁর অফিসে। হাইকোর্ট পাড়া।’

এবার বিস্ময়ে হাঁ করল প্রতুল।

‘আমি কী করব সেখানে গিয়ে?’

‘অলস মগজেই শয়তানের কারখানা তৈরি হয়— ইংরিজি বচনটাকে উমা বাংলায় অনুবাদ করল, গলার স্বর কঠোর হতে থাকল তার: ‘হাইকোর্ট পাড়ায় অ্যাটর্নিদের অফিস, আর সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন ওঁর। তাঁদের কোনো অফিসে তোকে ঢুকিয়ে দেবেন বলে কয়ে।’

প্রতুলের হৃৎকম্প দেখা দিল।

‘আমি—আমি ওসবের কী জানি?’

দিদি ভ্রূকুটি করল: তোকে তো আর অ্যাটর্নিগিরি করতে বলছে না কেউ। দলিলপত্র গুছিয়ে রাখবি, চিঠিপত্র নকল করবি আর এর মধ্যে শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখে নিবি। তোর বুদ্ধি আছে, উন্নতি করতে পারবি।’

‘কী উন্নতি?’ প্রতুল বেকুবের মতো প্রশ্ন করল একটা।

এইবারে উমাকেও একটু অস্বস্তি বোধ করতে হল। অ্যাটর্নি অফিসে ফাইল গোছালে, চিঠিপত্র নকল কিংবা টাইপ করলে উন্নতিটা কী এবং কতদূর পর্যন্ত হতে পারে সেটা চট করে বোঝানো গেল না। এবং এই বেয়াড়া জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত বিরক্ত হল সে।

'রোজগারপত্র কর্‌বি, রেস্‌পন্‌সিব্‌ল হবি, ভদ্র-সমাজের যোগ্য হবি—আর কী উন্নতি হবে এর চেয়ে ? না কি রাস্তায় রাস্তায় হল্লাবাজী করে না বেড়ালে পেটের ভাত হজম হয় না ?' দিদি আবার ভুরু কোঁচকালো : 'তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। উনি তো আছেনই, সব তোকে পাখিপড়া করে শিখিয়ে দেবেন।'

হৃৎকম্পন দেখা দিয়েছিল, এখন সেখানটিতে যেন প্রকাণ্ড একটা বরফের চাঙাড় চাপিয়ে দিলে কেউ। মণীশদার পাল্লায় পড়া ! একা দিদিই যে-কোনো মানুষকে ঘায়েল করবার পক্ষে যথেষ্ট, তার সঙ্গে মণীশদা জুটলে বেঁচে থাকবার সমস্ত ইচ্ছে যেন চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মণীশদার সঙ্গে গল্প করতে পারে, তর্ক চালাতে পারে। কিন্তু প্রতুল চিরকাল লোকটিকে দেখলেই পালাবার রাস্তা খুঁজেছে। হয় আইন আর মোকদ্দমার গল্প (শুনতে শুনতে দমবন্ধ হয়ে আসে), নইলে কি ভাবে অ্যাল্‌-সেসিয়ান কিংবা বুলটেরিয়রকে তত্ত্বাবধান করতে হয় তার উপদেশ, আর না হলে চেঞ্জে গিয়ে কোথায় ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে উঠতে হয়—কী কী ডিশ দেয়—কুক্‌-বেয়ারাদের কত টিপ্‌স্‌ দিতে হয়—তার বাইরে আর কোনো জগৎ নেই মণীশদার। রসিকতা অবশ্য করে, সেটা কেবল বামপন্থী রাজনীতিকে খোঁচা দিয়ে, দাদাকে চটাবার জন্যে।

দিদির বক্তৃতা একটিমাত্র—কী করে শিশুদের মানুষ করতে হয়। দিদি নাকি চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছে—মা'র মতো ব্রেনলেস্‌ অপদার্থ সে নয়, ছেলেমেয়েকে কি ভাবে যে ট্রেনিং দিতে হয়, টিনটিনের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করছে সে। ওগুলো এক রকম শুনতে মন্দ লাগে না। আর দিদি চলে যেতে বলার পরেও টিনটিন এই যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তাতে তার সার্থক ট্রেনিং মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মণীশদা ! দিদি এই লোকটাকে কী করে ভালবেসে বিয়ে করেছিল দিদিই জানে—কিন্তু দশ মিনিটের বেশী মণীশদার সঙ্গে থাকলে মৃত্যুযন্ত্রণা। সেই মণীশদা তাকে হাইকোর্ট পাড়ায় নিয়ে গিয়ে পাখি-পড়া করে শেখাবে !

প্রতুল যেন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। হতাশ গলায় বললে, 'দিদি, একটু জল খাব।'

'জল কেন ?' এবার সত্যিই দিদি জেগে উঠল উমার ভেতরে : 'তোর জন্যে খাবার করছে, নিয়ে আসছে এখুনি।'

আর খাবার। এই ফ্ল্যাট থেকে এখন বেরুতে পারলে হাড়ে বাতাস লাগে।

'না দিদি। খাবার না হলেও চলবে, একটু জল চাই।'

'বোস্—বোস্, কাটলেট করতে দিয়েছি তোর জন্যে। না খেয়ে যাবি কেন?' উমার গলা কোমল হয়ে এল: 'রাগ করেছিস এসব তোকে বললুম বলে?'

'রাগ করব কেন?' প্রতুল দুর্বল স্বরে বললে, 'আমার ভালোর জন্যেই তো বলেছিস।'

'সেইটেই বুঝে ছাখ্। বয়েস তো অনেক হল, এসব ছেলেমানুষি করলে আর চলে? ওদের ওই কুসঙ্গগুলোকেও তোকে ছাড়তে হবে। দাঁড়া, জল এনে দিই। কিন্তু জল খাবি, না কোল্ড ড্রিঙ্ক?'

'জল।'

'বরফ দিয়ে আনব?'

'না না, শুধুই জল।'

দিদি জল আনতে গেল। একবারের জন্যে প্রতুলের মনে হল, পালানো যাক। এই ফাঁকে তিন লাফে রাস্তায় গিয়ে পড়ি—তারপর ভাইফোঁটার দিন ছাড়া দিদির ফ্ল্যাটের ত্রিসীমানা কে মাড়ায়। কিন্তু প্রতুল উঠতে পারল না। মণীশদার খপ্পরে পড়তে হবে, সেটা নিদারুণ বিভীষিকা সন্দেহ নেই, তবু—তবুও কোথায় একটা যন্ত্রণা কাল থেকে বিঁধে চলেছে তাকে। হাইকোর্টে যাওয়ার কথাটা পরেও ভাবা যেতে পারে, কিন্তু দাদা কালকে স্বপ্নার কথাটা মনে না করিয়ে দিলেও পারত।

দিদি জল আনল। গ্লাসটা সামনে রেখে বললে, 'কাটলেট আমিই ভেজে আনছি, একটু বোস্। কুকিং রেঞ্জটা নতুন, ওতে আর চাকরবাকরকে হাত দিতে দিই না।'

এবার নিশ্চিন্তে পালানো যায়। কিন্তু তবুও পালানো যায় না। সমস্ত মনটায় বেসুরো বাজছে। জীবনটা অন্য রকম হলেও হতে পারত। যা থাকে কপালে বলে কাল থেকে হাইকোর্টেই বেরুবে নাকি মণীশদার সঙ্গে?

'ছোট মামা!'

পর্দা সরিয়ে প্রায় পা টিপে টিপে টিনটিনের আবির্ভাব। উত্তেজনায় জল-জল করছে চোখমুখ।

'সত্যি ছোট মামা, তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

টিনটিনের সামনে লজ্জা পাওয়াটা উচিত কিনা প্রতুল ঠিক বুঝতে পারল না।

'তুই আড়াল থেকে সব কান পেতে শুনছিলি ?'

টিনটিন ঝুপ করে প্রতুলের একেবারে পাশটিতেই বসে পড়ল ডিভানে।

'তুমি কিন্তু তাই বলে মাম্মীকে কিছু বলে দেবে না ছোট মামা।'

'তা বলব না। কিন্তু কাজটা ভালো হয় নি টিনটিন।'

টিনটিন কানই দিলে না কথাটায়। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'কী হয়েছিল, বলো না ছোট মামা।'

'তুই ছেলেমানুষ, এত সব খবরে তোর কী দরকার ?'

'বলো না। মারামারি করেছিলে, তাই না ?' টিনটিনের স্বরে কেবল আবদার নয়, রীতিমতন উৎসাহ ফুটে বেরুল: 'আমার বেশ ভালো লাগবে শুনতে।'

প্রতুল চমকে গেল। টিনটিনের চোখ দুটো চকচক করছে। গালের রঙ লাল।

'ছি ছি, এসব শুনতে তোর ভালো লাগে ?'

একটু চুপ করে রইল টিনটিন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল তার।

'একটা কথা তোমায় চুপি চুপি বলব ছোট মামা ?'

'কী কথা ?'

'কাউকে বলবে না ? কক্ষণো না ?'

'আগে শুনেই নিই, প্রতিজ্ঞা করব তার পরে।'

'না—' টিনটিন আরো অন্তরঙ্গ আর আরো উত্তেজিত হল: 'বলো, কাউকে বলবে না ?'

'আচ্ছা বলব না।'

'জানো, আমার এক বন্ধু আছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

প্রতুল আকাশ থেকে পড়ল একেবারে।

'তোর বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ? সে কি রে। অত বাচ্চাদের কখনো ধরে ?'

'না—সে বাচ্চা নয়। তার বয়েস কুড়ি বছর হল। তার নাম ডন।'

'ডন !' প্রতুল একটা খাবি খেলো: 'সায়েব ! তোর বন্ধু !'

'তুমি কিছু বোঝো না ছোট মামা—' টিনটিন বিরক্ত হয়ে প্রতুলের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মারল: 'সায়েব হবে কেন ? ডন হল সাউথ ইণ্ডিয়ান—নেটিভ ক্রিশ্চান। সে কী বলছিল জানো ? ও ইট ওয়াজ সাচ্ এ থ্রীল—

সাচ্ অ্যান্ এক্স্‌পিরিয়ান্স্! জানো ছোট মামা—' টিনটিনের মুখের চেহারা যেন বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ: 'জানো—এভ্‌রিথিং ইজ সো বোরিং—বোরিং! ডন বলেছিল—'ইট ওয়াজ এ রিলিফ, ওয়েলকম রিলিফ!'

মস্তান দলের প্রতুলও নার্ভাস বোধ করতে লাগল এবার।

'কেন ধরেছিল ডনকে

'বিশেষ কিচ্ছু না। একটু ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিল বেশি মাত্রায়, তারপর ঝগড়া করেছিল একটা পুলিস সার্জেণ্টের সঙ্গে।'

'এইসব বন্ধুর সঙ্গে তুই মিশিস টিনটিন?'

'তুমি জানো না—ডন কী লাভ্‌লি ছেলে। ওর পপ সং শুনলে কিংবা নাচের স্টেপিং দেখলে তুমি থ হয়ে যাবে। জানো—ওর কথা শুনে আমার যে কি রকম এক্সাইটমেণ্ট হচ্ছে—কী বলব। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে আমিও জেলে যাই।'

দিদি আর কোন্ বিভীষিকা, মণীশদাই বা কতটা হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিতে পারে! টিনটিনের কথা শুনে প্রতুলের মনে হতে লাগল সে দুঃস্বপ্ন দেখছে!

প্রতুল বলে ফেলল: 'ড্রিঙ্ক করে?'

'দুৎ—ওসব ছেলেদের মানায়। আমি অন্য কিছু করব।'

অভিভূত হয়ে প্রতুল বললে, 'কী করবি?'

'ধরো—যদি টুপ করে একদিন বাপীর গাড়িটা নিয়ে বেরুই, আর রাস্তার একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—কেমন হয়?'

'চমৎকার হয়।'—ছোট মামার শিরদাঁড়া বেয়ে এবার বরফগলা জল নামতে লাগল: 'কিন্তু তুই—তুই গাড়ি চালাতে পারিস? এই একফোঁটা মেয়ে?'

'কেন পারব না? ডনের গাড়ি রয়েছে—সে-ই তো শিখিয়েছে আমায়। ছোট মামা—সব বোরিং লাগে, সব। বই, সিনেমা, স্কুল, আমাদের ক্লাব—অ্যাট্ টাইম্‌স্ ইউ ফীল সাচ্ অ্যান্ আন্নুই! ছোট মামা, আমি গাড়ি করে যদি একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—'

প্রতুল এইবার একটা আর্তনাদ করে উঠত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দিদির ডাক এল: 'টুলু!'

'কিচ্ছু বোলো না মাম্মীকে—কিচ্ছু বোলো না—' কানের কাছে যেন তীব্র বেগে একটা শিস টেনে চকিতে মিলিয়ে গেল টিনটিন। আর সোফার ভেতরে প্রতুল একেবারে জমাট বেঁধে বসে রইল।

আনন্দ পেছনের স্পাইরাল সিঁড়িটা বেয়ে নেমে গেল। অপেক্ষা করল না আর।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজন। মাত্র আট-দশ মিনিট আগেও ঘরের আবহাওয়াটা রাজনীতির তর্কে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তৈরি হয়েছিল খানিকটা প্রবল উত্তাপ—এখন শান্ত বিষণ্ণতা থমথম করতে লাগল সেখানে।

আস্তে আস্তে সাবিত্রী বললে, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই সাবিত্রী। কালটাই এই রকম।'

'কিন্তু ছেলেটা এ পথ বেছে না নিলেই পারত।'

'ওদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে। টগবগ করছে ভেতরটা। পথের বিচার করবার আগে ছুটে বেরুবার তাড়াটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।'

'যাঁরা এইসব খাঁটি সোনা ছেলেদের ঝড়ের ভেতরে বের করে আনলেন, তাঁরা এদের চালাতে পারবেন ঠিকমতো? একটা দুর্দান্ত শক্তিকে তাঁরা জাগিয়েছেন —সেই শক্তিকে সংগঠন করবার, তাকে কাজে লাগাবার মতো স্থির-ধীর পরিকল্পনা তাঁদের আছে তো? এর মধ্যেই তো এরাও কতগুলো টুকরো ভাগে ছড়িয়ে পড়েছে।'

বিমর্ষভাবে হাসল প্রবীর।

'ডিনামাইটের পলতেয় যাঁরা আগুন ধরিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব তাঁরাই জানেন। শোধনবাদ—নয়া-শোধনবাদকে তাঁরা নরকে পাঠাচ্ছেন—নিশ্চয়ই পাঠাতে পারেন। কিন্তু এর দুটো পরিণতি আছে। যদি ভুল হয়, তা হলে তৈরি হবে সুইসাইড স্কোয়াড—সে দারুণ অপচয়ের চেহারা কল্পনাই করা যায় না। আর নইলে আসবে বিপ্লব, একেবারে সাইক্লোনের মতো চলে আসবে। আমরা মনে-প্রাণে কামনা করব—থাকুক মতভেদ, আসুক সেই বিপ্লব, কারণ আনন্দর মতো ছেলেদের উত্তেজনার বলি হতে দেওয়া যায় না।'

আবার নৈঃশব্দ্য। প্রবীর দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সাবিত্রী আঙুলের স্টিকিং প্লাস্টারটার ওপর আর একটা হাত বুলিয়ে চলল অন্যমনস্কভাবে।

দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীর বললে, 'আজ উঠি।'

'বসবে না আর একটু?'

'থাক আজকে। রাত হয়ে যাবে।'

'আবার কবে আসবে? তুমি সত্যিই আমাকে ভুলে যাচ্ছ প্রবীর।'

'ভুলে যাচ্ছি না সাবিত্রী—' প্রবীর আবার ক্লান্ত মুখে হাসল: 'আসলে আমাদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়ছি চারদিক থেকে। তুমিও তো ল্যাবরেটরি আর টিউশনের বাইরে আর বেরুতে পারছ না। কিন্তু শীগগিরই আমি আসব। তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আজ থাক।'

গভীর চোখ তুলে সাবিত্রী তাকালো। কী কথা প্রবীর বলতে চেয়েছিল, হয়তো বুঝেছে, হয়তো মনের মধ্যে আভাস পেয়েছে তার। কিন্তু আজ থাক। আনন্দ সব অন্যরকম করে দিয়ে গেছে।

সাবিত্রী বললে, 'একটু দাঁড়াও। আমি চট করে শাড়িটা বদলে নিই—তোমার সঙ্গে এগিয়ে যাব খানিকটা।'

'আচ্ছা, এসো কাপড় বদলে।'

ভেতরে ঢুকেই মিনিট দেড়েকের মধ্যে বেরিয়ে এল সাবিত্রী। তার হাতে রুমালে জড়ানো একটা জিনিস, দু চোখে ভয়ের বিহ্বলতা।

ফিসফিস করে সাবিত্রী বললে, 'এটা ভুলে ফেলে গেছে আনন্দ।'

জিনিসটা মুঠোর মধ্যে ধরেই বুঝতে পারল প্রবীর। খুলে দেখবারও দরকার হল না। দুরু দুরু করে উঠল বুকের ভেতর।

'এ তুমি নিজের কাছে রেখো না সাবিত্রী, এত বড় রিস্ক নেওয়া উচিত নয় তোমার। আমাকে দাও—আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—' বিহ্বল হয়ে সাবিত্রী বললে, 'তুমিও তো বিপদে পড়তে পারো।'

'আমার কোনো ভাবনা নেই—' প্রবীর হাসতে চেষ্টা করল: 'শুনলে না, আনন্দ বলে গেল, দরকার এখন আমাদেরই?' প্রবীর জড়ানো রুমালটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে ফেলল: 'তবে এটা সঙ্গে নিয়ে আর বাসে ফেরা যাবে না—ট্যাক্সির খরচা হবে কিছু।'

সাবিত্রী বিবর্ণ মুখে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব—অন্তত বালিগঞ্জ পর্যন্ত।'

'আমাকে পাহারা দিয়ে?' প্রবীর প্ল্যাস্টার করা আঙুলটার কথা ভুলে গিয়ে আবার সাবিত্রীর হাতটা টেনে নিলে: 'যদি ধরাই পড়ি—তুমি তো বাঁচাতে পারবে না, উলটে বিপদ বাড়াবে। পাগলামি কোরো না।'

'যদি আনন্দ চাইতে আসে ওটা?'

'আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বোলো কাউকে। সেটুকু বিশ্বাস আমাকে করো।'

সাবিত্রী শীর্ণ স্বরে বললে, 'আমার ভীষণ ভাবনা থাকবে। কাল একটা টেলিফোন করবে আমার কলেজে? করবে তো?'

স্নিগ্ধ চোখে একটু চেয়ে থেকে প্রবীর বললে, 'করব।'

। ১০ ॥

বোধির সীমা কতদূর পর্যন্ত যায়? যতদূর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার সীমা। কিন্তু যুক্তি তাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে আরো অনেক—অনেক বেশি, সেখানে আর এক বৃহত্তর জগতের কথা ভাবতে পারে, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাকে স্পর্শও করা যায় না; এই ভাবেই মানুষের উর্ধ্বায়ন, প্রত্যক্ষের বাইরে তার মুক্তি, এই ভাবেই জানে সে ভাবলোককে—আত্মার জগৎকে। আত্মা তো প্রত্যক্ষের বিষয় নয়—কিন্তু যুক্তি বলে, সমস্ত মানসিকতার সমন্বয়ই হল আত্মা—কাণ্টের মতে—

স্বপ্না আবার নোটগুলো থেকে মাথা তুলল। ট্র্যান্সেনডেণ্টাল ওয়ার্লড্ খুব ভালো। কোনো পরিশুদ্ধ যুক্তির ওপর আশ্রয় করে সেখানে পৌঁছুতে পারলে কোথাও আর কোনো দুঃখ থাকত না। কিন্তু বাস্তব জগৎটাই এত নিষ্ঠুর!

এই সকালটা—বাইরে বাতাস-লাগা গাছের পাতাগুলো—প্রথম রোদে সাদা সাদা মেঘের টুকরো ছড়ানো নীলনির্মল আকাশ—সব কেমন মগ্নতার মধ্যে ডুবে আছে। একটু আগেই রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল: 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।' সে ডাক যে পাঠিয়েছিল পাতা-দোলানো হাওয়া তার খবর আনে, আকাশ বহন করে তার বার্তা। অভিজ্ঞতা তাকে জানে না, কিন্তু পরিশুদ্ধ জ্ঞান তার উপলব্ধি বয়ে আনে হৃদয়ে। কে সে? ইটার্নাল ইগো?

কাণ্টের মতো করে যদি ভাবা যেত। যদি রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত প্রাণকে মেলে দিয়ে বলা যেত: 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ!'

এই বাড়ির মেয়ে হয়েও স্বপ্না কোনোদিন রাজনীতি ভাবে না। তার ভালোই লাগে না। তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায়। আজকাল

খবরের কাগজ যা হয়েছে, খুললেই সমস্ত মন বিরস হয়ে ওঠে। সবাই উত্তেজিত, সবাই অসহিষ্ণু, সবাই তিক্ত। কোথাও এমন জায়গা পাওয়া যায় একটা যেখানে শান্তি, স্তব্ধতা, গভীরতা?

এ বাড়ির মেয়ে হয়েও সে এ বাড়ির নয়। কারো সঙ্গে তার মেলে না। বাবা ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। বড়দা চব্বিশ ঘণ্টা ছটফট করে অস্বস্তিতে। বৌদি ভাঙা শরীর নিয়েও ফেলে-আসা মিছিলের দিনগুলোর কথা ভাবে— যেন আকাশ থেকে টেনে এনে খাঁচায় তাকে আটকে দিয়েছে কেউ। স্কুলে চাকরি করতে যায় সেখানে টীচারদের ভেতরে রাজনীতির তর্ক। বাসে করে ফেরে—সেই একই কচকচি। আর ছোড়দা—

রাত্রে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো, কিছু খাবার চেয়ে নিলে, তার পরেই কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। কোন্ আগুনের সমুদ্র সাঁতরে কোথায় যে পৌঁছুতে চায়, সে-ই জানে।

সব ছেড়ে—এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে, আনন্দ একদিন বলেছিল, 'বনে যখন আগুন লাগে, তখন পাখির বাসাও নিস্তার পায় না, স্বপ্না। তুই যা চাইছিস সেটা পেতে গেলে সব বদলে দিতে হবে। আগে মরা গাছ আর বিষাক্ত ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো পুড়িয়ে দিই—তারপরে না হয় স্নিগ্ধ তপোবন গড়ে দেব তোদের জন্যে।'

ঠাট্টা।

না—তপোবন সে চায় না। তার নিজের আলাদা ছায়া আছে, আলাদা ভাবনা আছে, সব যন্ত্রণা, সব ক্রোধ, সমস্ত বিদ্বেষের একান্তে একটি ছোট্ট জায়গা পেলেই তার কুলিয়ে যেত। আবার রবীন্দ্রনাথ। চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে/ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে,/তাহারে জড়ায়ে ঘিরে—'

বাবার গলা কানে এল। উপনিষদ পড়ছেন:

'নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা—'

কঠোপনিষৎ। আত্মতত্ত্বকে তর্ক দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র নচিকেতার মতো সত্যজিজ্ঞাসু শিষ্যই তা লাভ করতে পারে। কাণ্টও অনেকটা এইভাবেই বলেছেন। বাবা আজকাল আর তর্ক দিয়ে বুঝতে চান না—তিনি

আত্মতত্ত্ব সন্ধান করছেন। কিন্তু স্বপ্নার ভালো লাগল না। বাবাও তো সারাটা জীবন রাজনীতি করে কাটালেন, আদর্শ তাঁর ছিল, কিন্তু ভাবের বাষ্পও ছিল না তাঁর ভেতরে। গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা তিনি কখনো মেনে নেননি—গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগেই তাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' তিনিই সব কিছুকে প্রকাশ করেন, তাঁর উদ্ভাসেই সব বিভাত হয়—বাবা এখন আত্মসমর্পণ করছেন। এ তাঁর উপলব্ধি নয়, তিনি হেরে যাচ্ছেন, কোথাও দাঁড়াতে পারছেন না। দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা, আজকের রাজনীতি। ছোড়দার ওপরে অনেক আশা-ভরসা ছিল। স্রেফ দেউলে হয়ে গেলেন—এখন আত্মায় পরম চৈতন্যকে লাভ করে চাইছেন 'শান্তিঃ শাশ্বতী'। মনে হল, বাবা উপনিষদ পড়ছেন না—কাঁদছেন।

স্বপ্না হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। মানে হয় না—কোনো কিছুরই মানে হয় না। একটা প্রচণ্ড স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে সবাইকে—সেই বন্যা সময়ের, সেই বন্যা ইতিহাসের; কাউকে দাঁড়াতে দেবে না, থামতে দেবে না এক সেকেণ্ডের জন্যে। কান্ট-স্পিনোজার বাঁধা ঘাট সেই বন্যায় ভেঙে ভেসে যাবে—আকাশ থেকে আশ্রয়ের জন্যে জ্যোতির্ময় হাত বাড়িয়ে দেবে না উপনিষদ, রবীন্দ্র-নাথের মহাবটে নোঙর বেঁধেও নিষ্কৃতি নেই—বন্যার টান সে বটকে উপড়ে নিয়ে যাবে।

তার পরে কোথায়?

একেবারে অকূলে? কিংবা নতুন কোনো মহাদেশে?

যেখানেই হোক-স্বপ্নার জায়গাটুকু কোথাও মিলবে না। যদি মেলবার হত, তা হলে টুলুদাই কি এমন করে—

'পিসিমা।'

ঘরে নীলাঞ্জন। নীলু। যেন বেঁচে গেল স্বপ্না। এতক্ষণ ধরে এই সব ভাবনাগুলো এক-একটা করে ভারের মতো চেপে বসছিল তার মনের ওপর—যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আনছিল তার।

'কি রে নীলু?'

নীলু আস্তে আস্তে এসে স্বপ্নার চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। চুপ করে রইল তার পরে।

'কী, লেবেনচুষের পয়সা দিতে হইবো?'

নীলু ঘাড় নাড়ল; না—লজেন্স্ তার দরকার নেই।

'কী হইল তর্? কথা কস্ না ক্যান?' স্বপ্না হাসল। নীলুর এলো-মেলো নরম চুলগুলোর ভেতরে স্নেহভরা দুটি আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললে, 'তাইলে? বোক্‌ছে নাকি কেউ?'

'না পিসি, কেউ বকে নাই—' আবার একটু চুপ করে থেকে আরো ভীরু আরো ম্লান গলায় নীলু বললে, 'পিসি, আইজ রাত্তিরে আমারে তোমার ধারে শুইতে নেবা?'

'ক্যান?' স্বপ্না আবার হাসল: 'হঠাৎ আমার ধারে শোওনের কী হইল? মায়েরে ছাইড়া তুই থাকতে পারবি আমার কাছে?'

'পারুম—' নীলুর গলা এবারে কান্নায় ভিজে উঠল: 'পারুম। আমি আর মায়ের ধারে শুমু না পিসিমা—কোনোদিন না।'

নীলুর চুলের ভেতরে স্বপ্নার আঙুল শক্ত হয়ে গেল।

'কী হইছে রে? এই নীলু, হইছে কী?'

প্রাণপণে কান্নার একটা দারুণ উচ্ছ্বাসকে সামলে নিলে নীলু। ধরা গলায় বললে, 'রোজ রাত্তিরে বাবায় আর মায় ঝগড়া করে। বাবায় বকে, মায় কান্দে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার টুপ করে একফোঁটা জল ঝরে পড়ল নীলুর চোখ থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্বপ্না। তারপর কাছে টানল নীলুকে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে চোখ।

'মায়েরে ছাইড়া আমার কাছে শুইলে তোর কষ্ট হইবো না নীলু?'

নীলু জবাব দিল না। কষ্ট যে কত বেশি হবে, সেকথা তার মতো আর কে জানে! সে এখন বড় হয়েছে, স্কুলে প্রশ্নের অঙ্ক কষতে হয় তাকে, তবু রাত্রে মাকে জড়িয়ে না শুলে, মায়ের বুকের ছোঁয়াটুকু না পেলে, মা'র কি রকম ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা গালে-মুখে আদর ছড়িয়ে না দিলে তার ঘুম আসে না। তবু সে থাকতে পারছে না মা'র কাছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মা-বাবা একটু একটু করে চাপা গলায় ঝগড়া আরম্ভ করে, বাবা রেগে উঠতে থাকে—ইংরিজিতে বাংলায় মা-বাবা তর্ক করতে থাকে, বাবা আরো কী বলে, তারপর মা কাঁদতে থাকে।

মা'র বুকে মুখ গুঁজে, ঘুমের ভান করে সেই কান্না টের পায় নীলু। কান্নায় মা'র বুকটা ওঠে-পড়ে, কখনো বা গরম একটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে নীলুর

গলায়। তার পরে মা'র বুকের ভেতর সাঁ-সাঁ করে শব্দ হতে থাকে, বাগানে ঝাউ গাছটায় বাতাসের দোলা লাগলে যে-রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম—মা-র হাঁপানি ওঠে—মা ছট্‌ফট করে। বাবা পাশ ফিরে কি রকম কাঠ হয়ে থাকে, ঘুমোয় কিনা কে জানে, কিংবা এক-একদিন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানলার ধারে চেয়ারে বসে থাকে, অন্ধকার ঘরে একটা সিগারেটের লাল আগুন জ্বলে, কখনো বাবা জোরে সিগারেটটা টানে—আগুনটা যেন বাড়ে, বাবার মুখখানা অচেনা আর অদ্ভুত দেখায়, নীলুর ভীষণ—ভীষণ ভয় করতে থাকে।

কিন্তু এর একটা কথাও পিসিমাকে বলা যাবে না। নীলু চুপ করে থাকল।

বলবার দরকার ছিল না, স্বপ্না বুঝতে পারছিল। বড়দা রাজনীতির ব্যাপারেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে এখন। বাবার সঙ্গে এদিক থেকে মিল আছে তার। বাবা অবসাদের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে উপনিষদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন—বড়দা রাত-দিন জ্বলে যাচ্ছে যন্ত্রণার দহনে। বাবা দেখছেন, তাঁর সব বিশ্বাস—সমস্ত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে, বড়দা দেখছে যা তার কাছে দুই আর দুইয়ে চারের মতো সহজ ছিল, তা যেমন জটিল তেমনি অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

বাবা সব নিজের ভেতরে টেনে নিয়েছেন নীলকণ্ঠের মতো; কিন্তু বড়দা জ্বলছে—নিজের ওপরে তার রাগ, যারা রাজনীতি করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের ওপর। আর ভাঙা শরীর নিয়ে, সংসারে জড়িয়ে গিয়ে বৌদি এখন ছট্‌ফট করে—ভাবে এমনি করে ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না—আবার আমি সেই সব দিন, সেই জীবনের মধ্যে ফিরে যাব। সেদিন রাত্রেই তো বৌদি—

স্বপ্না ডাকল: 'নীলু।'

'উঁ?'

'বাবা-মায়ের মধ্যে ওই রকম কথা কাটাকাটি হয়ই। মন খারাপ করতে নাই।'

'না—মন খারাপ করি নাই।'

'ওই সব শুনতেও হয় না পোলাপানের।'

'আমি তো শুনি না পিসি।' নীলু ফিসফিস করে বললে, 'আমার ভয় করে।'

'আইচ্ছা, আমি বৌদিরে কইয়া দিমু অখন।'

'না—কিছু কইবা না—' ভয়ের ছায়া পড়ল নীলুর মুখে: 'মায়ে রাগ কোরবো।'

স্বপ্না আবার আঙুল বুলোতে লাগল নীলুর চুলের ভেতরে। জবাব দিল না।

'রাত্তিরে আমারে কিন্তু তোমার ধারে শুইতে নিবা।'

'আইচ্ছা, হইবো অখন।'

নীলু অনিশ্চিতভাবে চলে গেল ঘর থেকে।

এই এক আশ্চর্য দুর্ভাগ্য—স্বপ্না ভাবল। আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা, আমাদের বিস্বাদ বিরক্ত দিনগুলো কিভাবে যে ছোটদের আচ্ছন্ন করে দেয়! আমরা টেরও পাই না, কিন্তু একটু একটু করে বিষ ছড়াতে থাকে ওদের মধ্যে, বিমর্ষতা, হতাশা আর নিরানন্দের ভেতর দিয়ে ওরা বাড়তে থাকে। তারপর একদিন দেখি ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে—আমরা ফুল ফোটাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কখন ওদের শিকড়ে কীটের সংসার বাসা বেঁধেছে।

সকালটা আরো বিশ্রী হয়ে গেল। বইখাতাগুলো গুছিয়ে উঠে পড়ল স্বপ্না।

স্বরাজ বেরিয়ে গেছে বাজার করতে। আজও তেমনি বিশ্রী মেজাজ নিয়ে ফিরবে। সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলবে, 'হাটসুদ্ধ চোর হইয়া গেছে—অ্যাকটা জিনিস হাত দিয়া ছোওন যায় না—না খাইয়া মরতে হইবো এর পর।'

বাবা উপনিষদ রেখে খবরের কাগজে মন দিয়েছেন। কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় কি না, তারই সন্ধান করছেন খুব সম্ভব। মা পুজোয় বসেছেন। আজকাল পুজো করতে মা'র আরো বেশি সময় লাগে। যে ঠাকুর-দেবতাকে বড়দা ছোড়দা অট্টহাসিতে উড়িয়ে দেয়, সেই ঠাকুরের কাছেই মা'র হয়তো প্রার্থনা চলছে এখন। ঠাকুর যেন আপদে-বিপদে আনন্দকে রক্ষা করেন।

এই সব মাদের নিয়েই যত মুশকিল। তবু ছোড়দা এখনো অস্বস্তি বোধ করে।

সেদিন রাত্রে বলেছিল, 'মায়ের লগে একবার দেখা করবি না ছোড়দা?'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলেছিল, 'আইজ থাকুক। পরে আসুম অন্য সময়।'

বিপ্লবী ছোড়দাও মাকে ভয় পায় এখনো।

স্বপ্না রান্নাঘরে উঁকি মারল। উনুনে ডাল চড়ানো। বৌদি নেই।

এল বড়দার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের টুলটার ওপরে বসে নীলুর শার্টে বোতাম লাগাচ্ছে সুজাতা। নীলু আবার পড়তে চলে গেছে—বাইরে থেকে

গুনগুন করে পড়ার আওয়াজ আসছে তার।

'বৌদি!'

চোখ না তুলেই সুজাতা বললে, 'আয়।'

চেয়ারে বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই স্বপ্না বললে, 'অ্যাকটা কথা আছিল তোমার লগে।'

সুতো টানতে টানতে সুজাতা বললে, 'ক।'

'কিছু মনে করবা না বৌদি।' গলার স্বর নামিয়ে স্বপ্না বললে, 'রাত্তিরে তোমরা ঝগড়া কোরতে চাও করো, কিন্তু বাচ্চা পোলাডার সামনে সীন ক্রিয়েট—'

সুজাতা চোখ তুলল। ভুরু দুটো কুঁচকে এল তার।

'নীলু কিছু কইছে তোর ধারে?'

'নীলুর কওনের কী আছে?' স্বপ্না সোজাসুজি জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেল: 'এইগুলিন চাপা থাকে?'

সুজাতা সেলাইটা নামিয়ে রাখল। তার পর স্বপ্নার মাথার পাশ দিয়ে তাকালো দেওয়ালের দিকে। সেখানে পাশাপাশি দুটো ছবি একভাবে বাঁধিয়ে সাজিয়ে রাখা। একটি রবীন্দ্রনাথের, আর একটি লেনিনের।

'বাবার কানে গেছে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল সুজাতা।

'জানি না। না গেলে যাইবো।'

'যাউক।' সুজাতা তেমনি শুকনোভাবে বললে, 'এইভাবে আর চোলতে পারে না।'

স্বপ্না প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'বৌদি, কী কইতে আছ?'

সুজাতা বললে, 'স্বপ্না—ইউ মাস্ট্ ফেস্ ফ্যাক্ট্স্। স্বরাজরে বিয়া করছিলাম বৌ হইয়া ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকনের লইগ্যা না? একসঙ্গে কাজ করতে চাইছিলাম—অ্যাজ কম্রেড্স্। তবু দাদার ফ্রাস্ট্রেশন আসতে পারে, তার ইচ্ছা হইলে ডি-পলিটিক্যালাইজ্ড্ হইয়া যাক্, কিন্তু আমি এইভাবে থাকতে পারুম না।'

'কী করতে চাও?'

'অ্যাক্টিভ পলিটিক্স্।'

'এই শরীর নিয়া?'

'চিরদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আবার পথে বাইর হইয়া পোড়লেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবো। স্বপ্না, দিস্ ইজ্ গ্যাংগ্রীন, দিস ইজ ডেথ্। আমি আর এই লাইফ স্ট্যাণ্ড কোরতে পারতাছি না।'

'আর বড়দ, কী কইবো ?'

'তার পছন্দ না হয়, আমারে বিদায় কইর‍্যা দিবো। আমাগো সিভিল ম্যারেজ হইছিল, কারো কোনো ক্ষতি হইবো না।'

চেযারের মধ্যে স্বপ্না কাঠ হয়ে গেল।

'বৌদি।'

'কী করুম্ তাই ক। অনেক স্ট্রাগ্‌ল করছি নিজের লগে। আর সহ্য হইতাছে না। পরশু ময়দানের র‍্যালীতে কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ আসবো। যাইতে চাইলাম, তবু দাদার আপত্তি। কইলাম আমি যামুই, যা হওনের তা হইবো।'

'স্বপ্নার কপালে ঘাম জমে উঠল। বঝতে পাবছে কোথা থেকে হঠাৎ এমন করে যন্ত্রণা জেগে উঠেছে সুজাতার ভেতরে।

এতদিন ধরে আস্তে আস্তে এই সংসাবটার মধ্যে মিশে যাচ্ছিল বৌদি, এখানকার এই ধরা-বাঁধা জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল এর ভেতরে। তারপরে একদিন আর যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকত না সুজাতারও, সক্রিয রাজনীতির দিনগুলো তারও কাছে স্মৃতি হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়েব জানলা গেছে খুলে। পথ মেলে নি, কিন্তু মুক্তির খবর পৌঁছে দিয়েছে আনন্দ—আবাব আকাশের জন্যে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে সুজাতার।

হ্যাঁ, আনন্দই। নিজে ঘর ছাড়ল, আরো অনেককে ঘরছাড়া করবে।

স্বপ্নার ভয় করতে লাগল।

'আমাদের জন্য তোমার কষ্ট হইবো না বৌদি ?'

সুজাতার চোখের পল্লব দুটো নেমে এল। নিশ্বাস পড়ল একটা।

'হইবো। কিন্তু রেভোল্যুশন তো অন্যের উপর বরাত দিয়াই আসবো না ঠাকুরঝি। দাম সকলেরেই দিতে হইবো—ঘরে বইস্যা আমরা তার মুনাফা নিমু—এমন কথা ইতিহাসে লেখে নাই।'

'আর মা-বাবা ?'

ক্ষীণ রেখায় হাসতে চেষ্টা করল সুজাতা।

'ওনাগো কাছে যে অ্যাফেক্শন পাইছি, সেকথা ভুলতে পারুম না। বাবার জন্তও খুব মন খারাপ হইবো। কিন্তু—'

সুজাতা যেন লঘু হতে চাইল একটুখানি : 'ওনারাও আস্তে আস্তে বৌডারে ভুইল্যা যাইতে পারবেন। তবু দাদায়ও বেশিদিন দুঃখু রাখবো না—আবার বিয়া কোরবো, একটা ডোমিস্টিকেটেড্ মাইয়া ঘরে আইন্যা সংসারে সকলেরে সুখী কোরবো।'

একবারের জন্ত নীচের ঠোঁটে দাঁতের চাপ দিল স্বপ্না।

'আর নীলু? নীলুর কী হইবো?'

সেলাইটা হাতে তুলে নিয়েছিল সুজাতা, ছুঁচটা আঙুলে বিঁধে গেল কি? সঙ্গে সঙ্গে মুখের রঙ বদলে গেল তার, ভেসে উঠল যন্ত্রণার ছায়া।

সেলাই আবার নামিয়ে রেখে চকিতে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা।

'এই যে, ডাইল চড়াইয়া আসছি সেই কখন। ধইর‍্যা গেল বুঝি।'

চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। যেন পালিয়ে গেল।

তখন বাইরে সাইকেলের বেলের আওয়াজ উঠল। স্বরাজ ফিরেছে বাজার করে।

॥ এগারো ॥

"Let every class-conscious worker, remember what great tasks of the people's struggle now rest on his shoulders. Let him not forget that he represents the needs and the interests of the entire peasantry as well, of the entire mass of the toiling and exploited, of the entire people, against the enemy of the entire people"—

উনিশশো পাঁচ সালে লেনিনের ডাক। তারপর ৯ই জানুয়ারীর রক্তস্নান। সেই রক্ত দিয়ে বিপ্লবকে মুছে ফেলা যায়নি। দমন, পীড়ন, নির্বাসন, নির্যাতন যত বেড়েছে—শক্তি বেড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ঝড় উতরোল হয়েছে যত বেশি, বজ্র গর্জেছে, সাগর ক্ষেপেছে—গোর্কী দেখেছেন ঝড়ের পাখিরা ততই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ভেতরে।

ক্রমে ক্রমে আরো মিলেছে, আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সব দ্বিধা-সংশয়-বিভ্রান্তি-

গুলো পার হয়েছে একে একে।

সমস্ত কৃষকের স্বার্থে, সব শোষিত শ্রমিকের প্রয়োজনে, সমগ্র জনসাধারণের জন্যে সমস্ত মানুষের সব শত্রুর বিরুদ্ধে। বিপ্লবের নিয়মই তাই। অন্তত প্রবীর তার সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে এই পর্যন্ত বুঝেছিল।

অথচ কী আশ্চর্য এই ভারতবর্ষের ইতিহাস! এই বাংলা দেশের!

যখন মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিগুলো সব এক হয়েছে, হাতে হাত মিলিয়ে, পথের নিশানা নিশ্চিত করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন চাকাটা ঠিক উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। শ্রমিকের সংহতি ভাঙছে, কৃষক কৃষকের বিরুদ্ধে হানাহানিতে নেমেছে, ছাত্র, মধ্যবিত্তের সংগ্রামী শক্তি এ ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে কোথায় মেলে? অত্যাশ্চর্য আজকের এই বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব!

প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সহজ এবং সোচ্চার। আমরাই মাত্র নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বিপ্লবী। বাকী সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। সুতরাং হাতে-কলমে এবং মুখে পরস্পরের মুণ্ডপাতই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবার রাজপথ—অটো বান্!

আনন্দরা অট্টহাস্য করে বলবে, 'দুই আর দুয়ে চার হয়—পার্লামেণ্টারী পলিটিক্সে এ ছাড়া কী হবে! গদি পেতে গেলে ভোট চাই—অতএব সমর্থক বাড়াতে হবে। দলটাই যখন প্রথম কথা, তখন বিপ্লবকে ময়দানের বক্তৃতার জন্যে শিকেয় তুলে রাখলেই চলে। এর মধ্যে ভাঙো ইউনিয়ন—দু' মণ ধান আর চার ছটাক জমির ভাগাভাগি নিয়ে মাথা-ভাঙাভাঙি শুরু করো কৃষকদের ভেতরে। এসব ধোঁকাবাজির দিন ফুরিয়েছে—ধরো অস্ত্র, নিপাত করো শত্রু—আনো বিপ্লব।'

ভালো কথা। কিন্তু অব্‌জেক্‌টিভ্ কন্‌ডিশুন?

ধরো কোথাও কিছু তরুণ-বিপ্লবী তাদের দুজন 'শ্রেণী শত্রু'কে খতম করল। তারপর গা-ঢাকা দিল তারা। তারও পরে এল কৃষকের ওপর পুলিসের পীড়ন। সেই পীড়নের প্রতিক্রিয়া কী? কৃষক আরো একতাবদ্ধ হল, বিপ্লবের সম্ভাবনা তীব্র হল আরো? কিংবা জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হল, পেছিয়ে গেল, যেখানে ঘাঁটি তৈরি হচ্ছিল মনে হয়,—সেখানে পায়ের নিচে মাটিটাই পেছল হয়ে গেল?

বাইরে থেকে গিয়ে ক্ষুধিত মানুষকে নাড়া দেওয়া কঠিন নয়—ক্রোধের পটভূমি তার তো আছেই। কিন্তু সে ক্রোধের আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখবার—

তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার—তাকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে অনেক বিস্তৃত আয়োজনের দরকার নেই? সে অবস্থা তৈরি আছে তো?

অথবা, আনন্দরা তা তৈরি করছে। আর ইন্ধন তো দেশ জুড়ে আছেই—কয়েকটা মশালই দাবানল জ্বালিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধ শুরু হলে ড্রাগনের বীজের মতো মাটি থেকেই হয়তো সৈনিক জন্ম নেয়।

না—কিছু ভাবা যাচ্ছে না। প্রবীর কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

"পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলা কংগ্রেসের যে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন—"

পাশের বাড়ির রেডিয়ো। খবর বলছে। আবার বিস্বাদ বিরক্তির তরঙ্গ একটা। প্রবীর উঠে তৎক্ষণাৎ জানলাটা বন্ধ করে দিলে। রেডিয়োর আওয়াজ একটু কমে গেল বটে—কিন্তু শব্দভেদী বানের মতো ঠিক কানে আসছে। না শোনবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলে যেন আরো বেশি করে শোনা যায়—মনকে যতই সরিয়ে নেবার চেষ্টা চলে, ততই সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

নিজের কপালটা টিপে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার করে ওঠবার ইচ্ছে জাগল তার। আমরা—এই প্রবীর ব্যানার্জিরা—আমাদের মতো আরো অসংখ্য অগণিত যারা—আমাদের শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষের মন্ত্রে বিষিয়ে তুলছ কেন? তোমরা যারা নেতা—যারা ইতিহাসের পাঠ নিয়েছ—যারা ভবিষ্যৎকে অনেক স্বচ্ছ, অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখতে পাও, তোমরা কেন আমাদের নিশ্চিত, কোনো গঠনমূলক প্রোগ্রাম দিচ্ছ না? এই যে আমরা চোখ বেঁধে কানামাছি খেলছি, এতে কী লাভ, কার লাভ?

অদ্ভুত অবস্থা একটা। এই সেদিনও এক হয়ে—এক দাবিতে ইউনিয়নের স্বার্থে দাঁড়িয়েছি আমরা। অথচ আজ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে এ-ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছি। আমরা তো কেউ দালাল হয়ে যাইনি—মালিকের কাছে গোপন দাসখৎ লিখে দিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্যোগ নিইনি। তবু আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি—সেদিনের একান্ত বন্ধুর সঙ্গে আজ মুখ দেখাদেখি বন্ধ। চীন আর সোভিয়েটের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিতে পারে—তাই বলে আমাদের স্বার্থও বদলে গেল?

"Of the entire people, against the enemy of the entire people—" এই সেই একতার নমুনা? কোন্ পাকে ঘুরছে বিপ্লবের চাকা?

দূর ছোর!—নেতারাই বুঝবেন। ভাবতে গেলে মাথা ঘুরতে থাকে। তবু

বিভ্রান্ত বুদ্ধির প্রশ্ন থামে না : আমরা এগোচ্ছি, না পিছিয়ে যাচ্ছি ? আর এই-ই যদি, তা হলে পার্লামেণ্টারী রাজনীতির পথ নেবার কী দরকার ছিল ? সোজা নামলেই হত সংগ্রামে—তা হলে অধৈর্য, ক্রুদ্ধ আনন্দরা এমন করে ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যেত না।

অফিস ক্যান্টিনে শৈলেশকে বলেছিল, 'একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা যায় না ?'

শৈলেশ যথারীতি তার আধপোড়া চুরুটটা ধরিয়ে আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বসেছিল। মাথায় তেল দেয় না—ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলগুলোতে এখানে-ওখানে ধূসর ছায়া। অসময়েই পাক ধরেছে। বামপন্থী আন্দোলনেব স্থত্রে ছু'বার জেল খেটেছে। মুখে, কপালে অনেকগুলো ক্লান্ত রেখা।

মোটা ফ্রেমের চশমাব ভেতর দিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকালো শৈলেশ।

'কিসের কো-অর্ডিনেশন ?'

'অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল ডিফারেনসেস—আমাদের সাধারণ স্বার্থে—'

'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব ?'

'পার্টি থেকে আর কোনো জিনিসকে আজ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।'

সেই এক কথা। পার্টি—পার্টি। প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে পাড়ায় যদি ডাকাত পড়ে, তা হলেও পার্টি লীডারশিপের কাছ থেকে ডিকটেশন আনতে হবে যে, অন্য দলের সঙ্গে এক হয়ে আমরা ডাকাত তাড়াতে পারি কি না ?'

শৈলেশের-ঠোঁটের ওপর দিয়ে আলতোভাবে একটুখানি সিনিক হাসি বয়ে গেল। চুরুটটাকে ধরাতে ধরাতে বললে, 'ফল্স্ অ্যানালজী।'

'মোটেই না। তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ। দলীয় চিন্তায় তফাত থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনে কেন আমরা কমন প্ল্যাটফর্ম গড়তে পারি না ?'

শৈলেশ উত্তরে ইংরিজী একটি বচন আওড়ালো। পূর্ব পূর্ব—পশ্চিম পশ্চিম। দুই মেরু কখনো একসঙ্গে মিলতে পারে না।

'রুডিয়ার্ড কিপলিং'? শেষকালে ওই ডাই-হার্ড ইম্পিরিয়ালিস্টকে কোট করতে হল ?'

আবার হাসল শৈলেশ : 'চা খাবে ?'

তার মানে আলোচনা করতে চায় না। এখন যেন কোনোমতে জাত বাঁচিয়ে চলা। রাজনীতির মধ্যেও কাস্ট-সিস্টেম। আমরাই বিপ্লবের সঠিক পথ ধরেছি। বাকীরা অচ্ছুৎ।

তার মানে, ফ্রন্ট গড়াটা ট্যাকটিক্যাল। আমরা তখনই জানতুম, তেলে আর জলে মিশ খায় না।

অথচ কত বড় সুযোগটা এসে গিয়েছিল। প্রমাণ করবার সময় এসেছিল—

টুলু এসে ঘরে ঢুকল—থেমে গেল বিরক্তিকর ভাবনাগুলো। ভালোই হল। এসব ভাবতে গেলেই যন্ত্রণা। ঘাড়ের পেছনে শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে —তারপর মাথার ভেতরে যেন একতাল লোহা জমাট বাঁধে এসে।

টুলু এসে বসে পড়ল চেয়ারে। প্রবীর তাকালো তার দিকে।

'এতক্ষণে ছুটি মিলল ?'

ক্লান্তভাবে টুলু বললে, 'হ্যাঁ। পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার আগে বেরুনো যায় না অফিস থেকে।'

কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রবীর চেয়ে রইল টুলুর দিকে। দিদির হাতযশ আছে বলতে হবে। কি বক্তৃতা সে টুলুর কাছে দিয়েছে, তা টুলুই জানে। তার পর থেকেই হঠাৎ যেন বদলে গেছে ছেলেটা। আজ তিন-চারদিন ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে মণীশদার সঙ্গে—হাইকোর্ট পাড়ায়। মণীশদার কোন্ বন্ধুর অফিসে কেরানীর কাজ শিখছে।

দিদি সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ করল প্রবীর। টুলু হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুড়ে এরকম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে উঠবে—এ কল্পনাই করা যায় না। দিদি যে ম্যাজিক করতে পারে, এ খবরটা আগে জানা ছিল না তার।

'খুব বোরিং লাগে, না ?'

টুলু শ্রান্ত রেখায় হাসল : 'কী করা যায়, দাদা। কাজ তো করতেই হবে।'

টুলুর দিকে তাকিয়ে এখন তার অতীতটাকে মনে আসে না—পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এই যে কতগুলো বাজে ছোকরার সঙ্গে সে ভিড়ে পড়েছিল, এ কথাটাও ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক—এত বুদ্ধি ছিল, এত মাথা ছিল তার পড়াশোনায়! আজ নথিপত্রের স্তূপে দম-আটকানো হাইকোর্ট পাড়ার এক অফিস ঘরে—দেড়শো-দুশো টাকার ভবিষ্যৎ সামনে রেখে সে ফাইল গোছাচ্ছে—ভাবতেও ভালো লাগে না।

কথাটা টুলু নিজেই তুলল।

'পড়াশোনাটা আবার শুরু করলে কেমন হয় দাদা?'

'আমি তো লক্ষবার বলেছি তোকে। তুই-ই তো পাল্টা তর্ক করছিলি—বলছিলি কী হবে, চাকরি জুটবে না। তোর মাথায় ব্যবসার প্ল্যান ঘুরছিল।'

'না—একটা কাজে যখন ঢুকেইছি—' টুলু নিশ্বাস ফেলল: 'তখন অন্তত স্কুল-ফাইন্যালটাও পাস না করলে বেয়ারাগিরির ওপরে আর উঠতে পারব না।'

'সে তো নিশ্চয়। কিন্তু প্রাইভেটে ছাড়া—'

'এই বয়সে কি আর স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়, দাদা? আমার চাইতে ছোট টিচার পড়াতে আসবে যে। একটা কোচিং ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাব সন্ধ্যের পর।'

'কিন্তু এতক্ষণ অফিস করে—'

'সে হয়ে যাবে দাদা। একটু কষ্ট করতেই হবে কয়েক মাস। ভালো একটা কোচিংয়ের জায়গা আছে গড়িয়াহাটের মোড়ে। অফিস-ফেরত সেখানে পড়াশোনা করে বাড়ি ফিরব।'

'খুব কষ্ট হবে।'

'ও কিছু না। খেয়ে নেব রাস্তায়।'

সত্যিই দিদি ম্যাজিক জানে, প্রবীর ভাবছিল। হঠাৎ যেন প্রাণপণে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে টুলু। হয়তো টুলুর মতো যারা, এই রকমই তাদের স্বভাব। যত জোরে বাইরের দিকে ছুটে গিয়েছিল, তত জোরেই ছুটে আসতে চাইছে ভেতর দিকে। প্রবীর এত সহজে অভ্যেস বদলাতে পারত না—অনেক সময় লাগত তার। কিন্তু একটা খটকা তবুও লেগে রইল কোথাও। যারা এত সহজে ফিরে আসে, তাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথও কি—

ভাবছিল—টুলুও। বিশ্রী লেগেছে হাজতে যাওয়াটা। বিশ্রী লেগেছে তার জন্যে দাদার তদ্বির করে বেড়ানো—মুরারি হালদারের কাছে যাওয়া, আসবার সময় দারোগার কাছে প্রায় নাকে-কানে খৎ দিয়ে আসা; বিশ্রী লেগেছে দিদির কাছে খবর পৌঁছোনো; রতন আর ফণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে—যে পথে চলেছে তার শেষে পৌঁছে হয় তাকে ওয়াগন ভাঙতে হবে নইলে ফণীদের সঙ্গে নেমে পড়তে হবে ছিনতাইয়ের কাজে—শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি মারলেই চলবে না। তারপর স্বপ্নাকে মনে হলে—

হয়তো তবুও রাজী হত না। কিন্তু টিনটিন! যাকে দিদি নিজের হাতে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করছে—সে! ভাবতেও বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে।

কী বলতে চায় টিনটিন ? এ সব লেখাপড়া—গান-বাজনা—বাড়ির এই জীবন কিছুই তার ভালো লাগে না ? তার অ্যাডভেঞ্চার চাই—ছোট মামার মতো সে একবার জেলে গিয়ে স্বাদ বদলাতে চায় ?

'ডু ইয়ু নো—ইটস সো বোরিং—সো বোরিং।'

টিনটিনকে সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু বুঝেছে, তা থেকে অন্তত একটা জিনিস গোপন নেই। দিদি যতই উপদেশ দিক, টিনটিনের কাছে সেই ছোট মামাই এখন নায়ক হয়ে উঠেছে—যার জন্যে ভদ্র সমাজে দিদির মুখ দেখানো শক্ত হয়ে উঠেছে।

টিনটিনকে মনে হলেই আবার তার শিরদাঁড়া বয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নামে। ডন কে—তারা কারা, সে জানে না। কিন্তু টিনটিন যে পথে যেতে চাইছে, সেটা কোন্ পথ ? আর সেই পথ দেখাচ্ছে সে নিজেও ?

ভাগনীকে তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কিন্তু ভাগনীর আয়নায় যেন নিজের চেহারাটাই ফুটে উঠেছে তার। এর পরে টিনটিন কী জানতে চাইবে তার কাছে ? কেমন করে ছোরা বসাতে হয় ? কিভাবে বোমা তৈরী করে ? তার পরে বলবে তোমার বন্ধু রতন, ফণী, কাতিকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও ?

টুলুর গলা দিয়ে সেদিন কাটলেট নামতে চাইছিল না। বলেছিল, 'তাই হবে দিদি, আমি কাল থেকে মণীশদার সঙ্গেই বেরুব।'

হ্যাঁ, আমাকে বদলাতে হবে। শুধু আমি নিজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না—আমার অশুভ ছায়া পড়ছে আশপাশে। আমি নিজেও টের পাইনি—কখন আমি ছেলেমানুষ টিনটিনকেও বিষিয়ে তুলছি।

এই ভালো। সকাল নটায় বেরিয়ে যাওয়া। ছটায় বেরিয়ে কোচিং ক্লাস। সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরা। খেয়েদেয়ে যতক্ষণ পারি পড়াশুনো। সময়টা একেবারে নিশ্ছিদ্র, জমাট। কোথাও ফাঁক নেই এতটুকুও। রতন, প্রমোদ, ফণী, কাতিক—কারো কথা মনেও পড়বে না তখন।

টুলু চোখ তুলল।

'স্কুল-ফাইন্যালের পরে তো আরো পড়তে পারি দাদা।'

'নিশ্চয়। বাধা কিসের ?'

'কলেজে আর ভর্তি হব না—সায়েন্স পড়াও চলবে না। 'আমি তো এই ভাবেই বি.এ. পর্যন্ত পাস করতে পারি, দাদা।'

'এম. এ.ও পাস করতে পারিস—' প্রবীর হাসল : 'তোর তো আমার মতো

অভিনারী ট্রেন নয়. কোথাও আটকাবে না। রাত্রে ল কলেজ হয়—যদি এগিয়ে যাস, নিজেই অ্যাটর্নি হতে পারবি একদিন।'

টুলু হাসল: 'সে স্বপ্ন দেখা দাদা। অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন।'

'কিছুই দেরি হয়নি। জীবনে কোথাও কখনো দেরি হয় না। তোর চাইতেও বেশি বয়সে পড়াশুনো ধরে অনেকে ডক্টরেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।'

টুলু চুপ করে রইল। হঠাৎ কতকগুলো রঙিন ছবি ঝলমল করছে তার সামনে। যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। এতদিন চলেছিল একটা ঝোঁকের মাথায়, আজ আবার আর একটা দিক রূপকথার মতো হাতছানি দিচ্ছে তাকে। 'আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি—দারুণ ভালো হয়ে যাচ্ছি—' এই উত্তেজনা, এই রোমাঞ্চ ধক্ ধক্ করতে লাগল তার বুকের মধ্যে।

এই উত্তেজনার স্বাদে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে টুলুর মনে হল, আমি সংকল্পকে আরো কঠিন করতে পারি, ভালো হওয়ার জন্যে আরো বেশি জীবনপণ সাধনা করতে পারি। এখন আমার অসাধ্য আর কিছুই নেই। বাবা আমার ওপরে অনেক ভরসা রাখতেন। স্বপ্না বলেছিল—

'দাদা।'

'কি রে?'

'এই সঙ্গে সপ্তাহে দু'দিন শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিংও শেখা যায় না?'

প্রবীর হাসল: 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন—সব হবে। কিন্তু একসঙ্গে এত বেশি চাপ সইবে না।'

বাইরের দরজায় কড়া নড়ল। বোঝা গেল, মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলেন। আর তার পরেই শোনা গেল আশ্চর্য হয়ে মা বলছেন: 'আপনি?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ চলে এলুম—অনেকদিন তো দেখা হয় না। তা সব খবর ভালো?'

এই ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। চেয়ারের ওপর নড়ে উঠল টুলু। ওই ভরা গভীর গলার স্বর চিনতে ভুল হয় না। শিবপ্রসাদ ঘোষাল এসেছেন। স্বপ্নার বাবা।

মা বলছিলেন, 'হ্যাঁ, চলছে একরকম। কিন্তু খোঁজ-খবর তো নেন না।'

'কী করে আর নেব, আমি তো বুড়ো মানুষ বৌমা। তা ছাড়া—' একবার থেমে গেলেন. তারপরে বললেন, 'আজ একটু বিশেষ কাজে আসতে হল। ভুলু

আছে বাড়িতে ?'

'আছে বইকি, আসুন—আসুন—'

ওরা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠছেন, শিবপ্রসাদের জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। টুলু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল : 'আমি আমার ঘরে যাচ্ছি, দাদা।'

'সে কি রে ! জ্যাঠামশাই আসছেন—একবার দেখা করে—'

'আজ থাক দাদা—আজ থাক—' টুলু আর অপেক্ষা করল না। মাঝের দরজা দিয়ে চকিতে অদৃশ্য হল পাশের ঘরে।

পরক্ষণে বারান্দার দিকের দরজার চৌকাঠে শিবপ্রসাদের ছায়া পড়ল। প্রবীরও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, 'আসুন জ্যাঠামশাই, আসুন।'

॥ বারো ॥

যে চেয়ারটায় টুলু বসেছিল, তাতেই বসলেন শিবপ্রসাদ। তারপরেই তাঁর দৃষ্টি সোজা চলে গেল সামনের দেওয়ালের দিকে। শুকনো একছড়া মালা ঝুলছে প্রবীর-প্রতুলের বাবা প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনলার্জ করা ছবিটার ওপর। নিশ্বাস ফেললেন একটা। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'আমার চাইতে চার বছরের ছোট ছিল প্রভাত, অথচ কত আগে চলে গেল !'

চাপা হতাশার স্বর বাজল গলায় ? প্রবীর বুঝতে পারল না। বাবার আগে চলে যেতে পারলেই খুশি হতেন শিবপ্রসাদ ? সন্দেহ নেই, অসম্ভব ক্লান্ত আর ভারগ্রস্ত তাঁর চেহারা। আনন্দের জন্যে ? অনেক আশা করেছিলেন তার ওপর, সেই নিষ্ফলতার যন্ত্রণা ?

এইখানেই বাবার সঙ্গে তাঁর মিল। টুলু যখন স্কুলে সেই কেলেঙ্কারিটা করবার পর দু মাসের জন্যে নিরুদ্দেশ হল, তখন বাবাও হঠাৎ এই রকম নুয়ে পড়েছিলেন—যেন পঁচিশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না—এমন কি এত প্রিয় খবরের কাগজও পড়তে পারতেন না—কোলের ওপর মেলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। কেবল মা'র কান্নাকাটি একটু সরব হয়ে উঠলে দাঁতে দাঁত চেপে এক-আধবার বলে বসতেন : 'কী চাও তোমরা—কী চাও ? আমি সুইসাইড করি ?'

মিনিট দুই পরে প্রবীর সচেতন হল, লজ্জিতও হল তার সঙ্গে। কোনো মানে হয় ? এতদিন পরে শিবপ্রসাদ এসেছেন, অথচ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ

করে বসে আছে সে? এটা কোন্ দেশী ভদ্রতার নমুনা?

'কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?'

অন্যমনস্কতা থেকে শিবপ্রসাদও জেগে উঠলেন। হাসলেন শীর্ণ রেখায়।

'ভালোই আছি। এই বয়েসে আর এর চেয়ে কী ভালো থাকব, বলো।'

এড়িয়ে-যাওয়া জবাব। অথবা বলতে হয় তাই বলা। ভালো তিনি নেই: তাঁর চোখ-মুখ, তাঁর চেহারা তা বলে না।

'বাড়ির দোতলার কাজ আরম্ভ করলেন?'

শিবপ্রসাদ মাথা নাড়লেন।

'আমাকে দিয়ে আর হবে না। ছেলেরা যদি পারে, করে নেবে।'

ছেলেরা। আনন্দ সম্পর্কে এখনো আশা রাখেন তা হলে! কিন্তু আনন্দ আর ঘরে ফিরবে? চারদিন আগেও তো সাবিত্রীর ফ্ল্যাটে আনন্দের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। যদি ফেরে ঝড় বয়ে নিয়ে ফিরবে, যদি না ফেরে তাহলে ঝড়ের মধ্যেই হারিয়ে যাবে। অন্তত দোতলা তৈরি করবার জন্যে সে আসবে না—এ কথা নিশ্চিত।

ঘরের বাতাসটা আবার গভীর হতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা এলেন।

'চা খাবেন দাদা?'

শিবপ্রসাদ আবার হাসলেন। এ হাসিটা কোমল।

'ভুলে গেলেন? আমি তো সকালে একবার ছাড়া চা খাই না।'

'ঠিক—মনে ছিল না।' মা বললেন, 'তা হলে সরবৎ করে দিই একটু লেবু দিয়ে?'

সন্ধ্যাটা গরম। আজ বাতাস নেই—চারিদিক গুমোট হয়ে আছে। শিবপ্রসাদের মনে হল, এখানে আসবার সময় পথেই তার তেষ্টা পেয়েছিল। এখন বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঠ।

বললেন, 'আচ্ছা, তা দিতে পারেন।'

মা চলে গেলে শিবপ্রসাদ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মেঝের দিকে। যে-কথাটা বলতে এসেছেন, এখনো যেন সেটাকে ভালো করে গুছিয়ে তুলতে পারছেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ভুলু, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ ছিল। খুব জরুরী।'

প্রবীর আশ্চর্য হল একটু। তার সঙ্গে কী পরামর্শ থাকতে পারে ওঁর? এতদিন পরে?

'বলুন।'

'একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে।'

আনন্দ ধরা পড়েছে নাকি? ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

'কী হয়েছে জ্যাঠামশাই?'

আবার ইতস্তত করতে লাগলেন শিবপ্রসাদ।

'স্বরাজের সঙ্গে তোমার দেখা হয়?'

'অফিস পাড়ায় দেখি কখনো-কখনো।'

'কোনো কথা হয়েছে এর ভেতরে?'

'না, বিশেষ কিছু নয়।' প্রবীর ভাবছিল জ্যাঠামশাই আনন্দর কথাই তুলবেন, কিন্তু এর মধ্যে স্বরাজ এল কী করে?

'ও তো এক সময় বিশেষ বন্ধু ছিল তোমার।'

প্রবীর ভুরু কোঁচকালো: 'বন্ধু এখনো আছে, তবে দেখা-সাক্ষাৎ নিয়মিত হয় না। কিন্তু এসব কথা কেন জ্যাঠামশাই?'

'বলছি—' একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'ওর বিয়ের কথাটা তোমার মনে আছে বোধ হয়।'

প্রবীর আরো আশ্চর্য হল: 'কেন মনে থাকবে না? রেজিস্ট্রির সময় তো আমি একজন উইটনেস ছিলুম।'

শিবপ্রসাদ শ্রান্তভাবে বললেন, 'ওরা একসঙ্গে রাজনীতি করত, তারপরে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করল। তুমি তো জানো, আমি খুশিই হয়েছিলুম। বৌমা ভালো মেয়ে, বি.এ. পড়ছিল, বুদ্ধিমতী। এখনকার ছেলেমেয়ে রাজনীতি করবে—খুব স্বাভাবিক, আমার জীবনের দশ আনাও তো তাই করেই কেটেছে। তারপর নীলু এল, বৌমার একটা শক্ত অপারেশন হয়েছিল তখন—তোমাকেও অনেকবার হাসপাতালে দৌড়োতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সবই মনে আছে। কিন্তু এসব—'

'বলছি—বলছি। সেই জন্যেই তোমার কাছে আসা।'

আবার দ্বিধা করতে লাগলেন। একটা যন্ত্রণা বিঁধছে বুকের ভেতর, কথাগুলো বলতে কষ্ট হচ্ছে, সইয়ে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে।

সরবতের গ্লাস নিয়ে মা এলেন। হাত বাড়িয়ে নিলেন শিবপ্রসাদ, বড় করে চুমুক দিলেন একটা।

'আঃ, বাঁচালেন। বুকটা শুকিয়ে গিয়েছিল একেবারে।'

মা বললেন, 'কিছু খাবেন দাদা ?'

'পাগল নাকি ? এই বয়েসে, এই সময় ? এতেই যথেষ্ট।'

মা চলে গেলেন। না ডাকলে মা কোনো দিন কোনো কথার মধ্যেই দাঁড়ান না। বাবার ট্রেনিং। ধমক দিয়ে বলতেন, 'সব ব্যাপারে কেন নাক গলাও ইডিয়টের মতো ? তোমার কাজ রান্নাঘরে– গো দেয়ার।' বাবা বুঝে নিয়েছিলেন কোনো সিরিয়াস আলোচনায় মা'র মতো অশিক্ষিতার কোনো ভূমিকা নেই।

সরবৎ শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন শিবপ্রসাদ। যেন খানিকটা সজীব হয়েছেন এতক্ষণে। একবার পরিষ্কার করে নিলেন গলাটা।

'এতদিন পরে ওদের মধ্যে একটা মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং—'

প্রবীর চমকে উঠল।

'সে কি ! ওদের তো খুব লাভিং কাপল বলে—'

শিবপ্রসাদ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

'ঠিক। আমরাও তাই জানতাম। আসলে কী জানো—তোমাদের লেফ্ট্ পার্টির ভেতরে এই সব মতভেদ, নিজেদের ভেতরে এই সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি—এগুলো এখন ডোমেস্টিক লাইফের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু হয়েছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না জ্যাঠামশাই।' প্রবীর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল: 'স্বরাজদা কি আজকাল আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় ? মাসখানেক আগেও একদিন আমাকে বলছিল, আয়্যাম ফেড আপ উইথ পলিটিক্স্—একটা মীটিং অ্যাটেণ্ড করার চাইতে এনি ননসেন্স্ হিন্দী ফিল্মও আমি প্রেফার করব।'

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাগে, দুঃখে। ওটা রাজনীতির ওপর বিরাগ নয়, নিজের বিকার। পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। বৌমাকে তো জানো, শরীর ভেঙে গিয়ে বাইরে বেরুনো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই পলিটিক্স্ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল।'

'তর্কাতর্কি !'

'যতদূর বুঝতে পারছি, স্বরাজের এই ডিপ্রেশনটা বৌমার একেবারে সহ্য হয় নি। এই নিয়ে একটা অশান্তি ছিলই। কিন্তু দিন দুই আগে—'

আবার একটা যন্ত্রণার ঢেউকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন শিবপ্রসাদ। একটু থেমে গিয়ে বলে চললেন 'বৌমা ময়দানের একটা মীটিং-এ যেতে চেয়েছিল,

স্বরাজ আপত্তি করে। শেষে একটা বিশ্রী ঝগড়া। বিলিভ্ ইট অর নট—বৌমার অমন চেহারা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। চোখ দুটো পাগলের মতো, গাঁয়ের আঁচল খসে পড়েছে, আমি সামনে দাঁড়িয়ে—অথচ আমায় যেন দেখতেও পাচ্ছে না। আর সেই চিৎকার: আয়্যাম নট ইয়োর স্লেভ, তুমি রেনিগ্রেড্—বাট আই মাস্ট গো। শেষে ফেণ্ট হয়ে পড়ল।'

সমস্ত জিনিসটা যেন বিশ্বাসের বাইরে। প্রবীর বোকার মতো শিবপ্রসাদের পীড়িত শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। সুজাতা বৌদির স্নিগ্ধ চেহারাটাই চোখের সামনে ভাসছে এখন। সেই বিয়ের পর। চোখ দুটো ঝকঝক করছে জীবনের পূর্ণতায়। স্বরাজের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে জোরালো আলোচনা চলছিল, 'সুজাতা বৌদি দু' পেয়ালা চা এনে রাখল সামনে।

'অনেকক্ষণ ধরে চ্যাচাচ্ছ দুজন। গলা ভিজিয়ে নাও।'

'থ্যাঙ্ক ইউ বৌদি, থ্যাঙ্ক ইউ। তোমাদের এরকম নজর আছে বলেই বিপ্লবের প্রেরণা এত বেশি করে পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী—'

'নজরুল কোট করে আর চেঁচিয়েই বিপ্লব আসবে?'

'আমরা বাঙালী। কণ্ঠই ভরসা। চিৎকারের চোটেই বুর্জোয়া আর ইম্পিরিয়ালিস্টদের হার্টফেল করাব।'

'অত সস্তায় নয়। আমরা মেয়েরা শুধু তোমাদের গলাবাজীর বিপ্লবে চা যোগাব, ভুলেও ভেবো না সেকথা। যদি চলতে না চালাও, আমরাই চালাব।'

হা হা করে হেসে উঠল স্বরাজ।

'ওটা নতুন কথা নয় সুজাতা। তোমরাই তো আমাদের চালাচ্ছ পিতা আদমের কাল থেকে। নইলে জ্ঞানবৃক্ষের ফলই বা কে খেতো—এত দুর্গতিই বা আসত কোত্থেকে!'

'ভালোবাসা। স্নিগ্ধতা। উজ্জ্বলতা। কিন্তু একটা সত্যের আভাস কি সেদিনও ছিল? তোমরা যদি চলতে না চালাও আমরাই চালাব।'

শিবপ্রসাদ আবার গলা পরিষ্কার করলেন। প্রবীর সজাগ হল সঙ্গে সঙ্গে।

'এখনো এই অবস্থা চলছে জ্যাঠামশাই?'

'আরো গড়িয়েছে—' শিবপ্রসাদের চোখ আবছা হয়ে এল: 'বৌমা কাল চলে গেছে ওর দাদার কাছে—বারাসাতে। যাওয়ার সময় আমাকে প্রণাম করে বলে গেল, আমাকে ক্ষমা করবেন বাবা, আপনাদের বাড়ির বৌ হবার মতো

যোগ্যতা নেই আমার।'

'স্বরাজদা ?'

'চুপ করে বসে আছে। কথা বলা বন্ধ করেছে সকলের সঙ্গে—' বলতে বলতে শিবপ্রসাদের চোখে জল এল: 'আমি নীলুর দিকে তাকাতে পারছি না ভুলু। আর তোমার জেঠিমা—'

ঘরের বাতাস থমথম করতে লাগল। একটা কথাও বলা গেল না।

সময়। এখন অন্যরকম সময়। সে তার পাওনা দাবি করছে। অনেক কিছু মিটিয়ে দিতে হবে আমাদের। তাতে যদি বুকের পাঁজরা গুঁড়িয়ে যায়, যাবে। কাল মিটিয়ে নেবে তার হিসেব, একবিন্দুও ছেড়ে দেবে না সে।

শিবপ্রসাদ একটু সামলে নিলেন। মুছে ফেললেন চোখ।

'কোথায় যেন আমাদের সব ভুল হয়ে গেছে। এতদিন ধরে যেগুলোকে বিশ্বাস করে এসেছিলুম সেগুলোকে আর ধরতে পারছি না মুঠোর ভেতরে। আমাদের সময় শেষ হয়ে এল, নতুনভাবে কিছুই করবার নেই আর। কিন্তু যাবার আগে অন্তত সংসারটা যদি—' বলতে বলতে থামলেন একবার: 'কী করা যায় বলো তো ভুলু?'

মনের আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও। শেষে ডুবতে ডুবতে যেন এক মুঠো ঘাসের মতো প্রবীরকেই আঁকড়ে ধরেছেন।

প্রবীর বললে 'ওজন্যে ভাববেন না জ্যাঠামশাই। এক-আধটু ঝগড়ার ব্যাপার—বৌদি দুদিন পরেই ফিরে আসবে।'

শিবপ্রসাদ মাথা নাড়লেন।

'আমার বয়েস হয়েছে ভুলু। এ সে জিনিস নয়।' আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইলেন প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটার দিকে, যেন মনে মনে ঈর্ষা করছেন তাকে। অনেক দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচে গেছে লোকটা। মরে বেঁচেছে। তারপর আবার বললেন, 'তোমাকে বলতে আমার সংকোচ হয়, কিন্তু তুমি তো বৌমার বারাসতের বাড়ি চেনো। যাবে একবার? তাকে বলতে পারো যে অন্তত নীলুর দিকটা কনসিডার করেও—'

'নিশ্চয় যাব জ্যাঠামশাই—' মনে মনে শীর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল প্রবীর, বুঝতে পারছিল সুজাতার সঙ্গে এই দেখাটা খুব সহজ হবে না। ভেদটা মনের নয়, ধর্মের। এবং সেইটেই সব চাইতে দুস্তর। কিন্তু এসব বলে শিবপ্রসাদের দুঃখ বাড়ানো যায় না। তার বদলে বলতে হল, 'আপনি ভাববেন না জ্যাঠা-

মশাই, রাগ পড়ে গেলে বৌদি নিজেই ফিরে আসবে।'

শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না। বসে রইলেন চুপ করে।

'তার আগে স্বরাজদার সঙ্গেও কথা বলব একবার ?'

'যাবে আমার বাড়িতে ? অনেকদিন তো যাওনি।'

'এসব ব্যাপার বাইরে আলোচনা করাই ভালো জ্যাঠামশাই, বাড়িতে ঠিক সুবিধে হবে না। আমি অফিসপাড়াতেই কাল ধরব স্বরাজদাকে।'

'যা ভালো বোঝো কোরো, আমি আর ভাবতে পারছি না—' নিশ্বাস ফেলে শিবপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন: 'শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে বার বার—সব ভুল হয়ে গেছে কোথাও। দু রাত ঘুমুতে পারিনি, শেষে তোমার কথাই মনে পড়ল। তুমি তো ওদের দুজনকেই চিনতে—হয়তো—'

'আমি বলছি জ্যাঠামশাই, কিছু ভাববেন না আপনি।'

একটু হাসতে চেষ্টা করলেন শিবপ্রসাদ, তারপর বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন দরজার দিকে। আর সেই সময় হঠাৎ প্রবীরের মনে হল, এর মধ্যে একবারও তিনি আনন্দের কথা বলেননি।

টুলুরও না।

ডনের টু-সীটার ছুটছিল। হু হু করছে ময়দানের হাওয়া। সেই বাতাসে উড়ছিল টিনটিনের হর্সটেল চুল।

টিনটিন বললে, 'ডন, এবার আমাকে স্টিয়ারিং দাও। আমি একটু চালাব।'

ডন বললে, 'ওহো, নো। তুমি একটু বেশি বীয়র খেয়েছ আজকে। নেশা হয়েছে তোমার।'

'না, কিচ্ছু হয়নি।'

ডন একটা ইংরিজি শপথ আওড়ালো।

'উহুঁ, তুমি অ্যাকসিডেন্ট করবে।'

'না হয় হবে অ্যাকসিডেন্ট। হোয়াট উড্ বী কোয়াইট এ থ্রীল্!'

'দুঃখিত—মাই বাডি। অত কস্ট্‌লি থ্রীলে আমি রাজী নই। আমার আরো কিছুদিন বাঁচা দরকার।'

টিনটিন চটে উঠল।

'তুমি একটা কাওয়ার্ড। নামিয়ে দাও আমাকে গাড়ি থেকে।'

'দেব নামিয়ে। তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে।'

'আমি এখন বাড়ি যেতে চাই না।'

'টিনটিন, তোমার নেশা হয়েছে।'

'হ্যাং ইট—হ্যাং ইযোর বীযর। এর পর একদিন হুইস্কি খাব এক বোতল, একটা রিভলভার যোগাড করব। অ্যাণ্ড দেন ডন—আই উইল শুট্ ইউ।'

ডন জবাব দিল না—ভয ধরে যাচ্ছিল তার। গাড়িটাকে সার্কুলার রোড দি'যে ঘুরিয়ে সে রওনা হল দক্ষিণেব দিকে।

আর তীক্ষ্ণ স্বরে টিনটিন বলে চলল, 'না—আমি বাডি যাব না। ইট্‌স্ বোরিং—সো বোরিং। ডন, সাম ডে আই মাস্ট শুট্ ইউ—আই মাস্ট শুট্ ইউ—'

॥ তেরো ॥

বাসবিহাবীর মোড়ে, আধ মাইল লম্বা শাট্‌ল্ বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছিল টুলু। সামনেই একটি অল্পবযসী মেয়ে। পুরনো অভ্যাসে মেয়েটিব ঘাড-গলার দিকে বার বাব চোখ পডতে যাচ্ছিল, একবাব পাশের দিকে মাথা ফিরিযেছিল মেযেটি, মনে হয়েছিল বেশ মিষ্টি মুখখানা, তার চুল থেকে চাপা একটা সুগন্ধিও বযে আসছিল। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল টুলু, যেন একান্তভাবে জপ করতে চাইছিল : এ-সব নয, এ-সব নয়। অনেক হযেছে ইয়ার্কি-ফাজলামো, যাকে বকে যাওয়া বলে তার কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। কযেকবার টেনে নিয়ে গেছে বাজে জাযগায়। তবু ভাগ্য ভালো, চোলাই মদের আড্ডায় ভেডাতে পারেনি আর। ওইখানেই কোথায বেধেছে, মানিক, ফণী কিংবা কার্তিকের বন্ধুত্ব যেমনই হোক—বাকী লোকগুলোর সঙ্গে ভাঁড়ে করে ওই দুর্গন্ধ মদগুলো গিলতে—

প্রবৃত্তি হয়নি, সাহসও না। ওই গন্ধ মুখে নিযে বাডি ফিরব? মা'র সামনে দাদাব সামনে? নেশাটা ধরেনি, কিন্তু আর কিছুই তো বাকী ছিল না। আরো কদিন গেলে হয়তো মানিকের সঙ্গে রওনা হত ওয়াগন ভাঙতে কিংবা ফণীই তাকে টেনে নিয়ে যেত ছিনতাইয়ের দলে। ঠিক এমন সময় দিদি এল। বেঁচেছে সে।

না, আর ওসব ভাবব না। কোনো বাজে কথা না, কোনো কুচিন্তা নয়। তাকিয়ে দেখব না কোনো মেয়ের দিকে। যদি কখনো সময় আসে—টুলুর বুকের

ভেতরে হঠাৎ হাতুড়ি পড়তে লাগল : তখন যাব স্বপ্নার কাছে। তার আগে আমাকে অন্তত প্রাইভেটে বি-এটা পাস করতে হবে, চাকরিতে—

অবশ্য মধ্যে মধ্যে অফিসে যেন দম আটকে আসতে চায়। শুকনো কাগজপত্র, ফাইল আর দলিলের স্তূপ, টাইপরাইটারের আওয়াজ, ফাই-ফরমাস—মাথা ঘুরতে থাকে। বুড়ো হ্যাংলা চেহারার হেড ক্লার্কটার ডিসপেপসিয়া আছে, একটু এদিক-ওদিক হলেই খ্যাচ-খ্যাচ করে ওঠে। খুন চেপে যায় কখনো কখনো, ইচ্ছে হয় এক ঘা মেরেই বসি বুড়োকে। সন্ধ্যেনাগাদ যখন ছুটি মেলে, তখন পিঠের ওপর যেন একমণী বোঝা চেপে আছে একটা।

অ্যাটর্নী ঘোষ সায়েব মণীশদার বন্ধু। তাঁর ব্যবহার অবশ্য ভালো। মাঝে মাঝে হেসে পিঠ-টিঠ চাপড়েও দেন। উৎসাহ দিতে থাকেন।

'খাটো হে, একটু খাটো। বুঝতেই পারছ এক রেস্‌পন্‌সিব্‌ল কাজ এ-সব, শিখে নিতে সময় লাগবে।'

কোচিং ক্লাসে এখনো ভর্তি হওয়া হল না। সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার একটা বড় মামলা চলছে হাইকোর্টে। ঘোষ সাহেব অসম্ভব ব্যস্ত দারুণ কাজের চাপ। কিন্তু লেখাপড়াটা আরম্ভ করতে পারলে ভালো হত। যাহোক একটু নিশ্বাস ফেলা যেত এই দমচাপা আবহাওয়া থেকে।

সাতটা বাজে। লাইনটা শাট্‌ল্ বাসের আশায় দাঁড়িয়ে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু টুলুর বিরক্তি লাগছিল। এর চাইতে জোরে জোরে পা চালালে এতক্ষণে যাদবপুরে পৌঁছে যেত।

কাঁধের ওপর কার হাত পড়ল পাশ থেকে। টুলু চমকে তাকালো। মানিক।

'কি রে, ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি? পাত্তা নেই যে আর।'

'সময় পাচ্ছি না। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়।'

'ও—অফিস।' মানিক ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল : 'ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই কাজের লোক হয়ে গেছিস। তা কী করছিস এখানে?'

'দেখতেই পাচ্ছিস। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ি ফিরব।'

'এখন কী হবে বাড়ি ফিরে? আয়।'

'না ভাই, এখন আর আড্ডা নয়। ভারী খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে তো খাওয়াব। আয়—আয়—'

হাত ধরে হ্যাচ্‌কা মারল একটা।

টুলুর বুক কেঁপে উঠল। আবার সেই সঙ্গ। অনেক কষ্টে লোভ এড়িয়েছে।

গড়িয়াহাট ব্রীজ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত সে চোখ বুজে থাকে—প্রাণপণে ভাবে ওদের সঙ্গে যেন আর তার দেখা না হয়—কোনোমতেই না। সে এখন ভালো হতে চাচ্ছে—এখন তার নিজেকে বদলাতে হবে।

মানিক বললে, 'বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কী? আমি কি তোকে খেয়ে ফেলব? চল্—চল্—দু ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরলে তোর চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে না।' বলে আবার হ্যাঁচ্‌কা মেরে হাতখানেক টেনে সরিয়ে নিলে। মানিকের শেষ কথাটায় সামনের মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। আশপাশের আরো কজনের দৃষ্টি ঘুরে এল এদিকে।

নাঃ—এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে এতগুলো লোকের সামনে বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে একটা। যা আল্‌গা মুখ, কী বলে বসবে শেষ পর্যন্ত ঠিক নেই তার। বিশেষ করে মেয়েটির কানে যাচ্ছে কথাগুলো।

টুলু বেরিয়ে এল লাইন থেকে। জোর পায়ে এগোতে এগোতে বললে, 'জ্বালালি!'

'দৌড়োচ্ছিস কেন ঘোড়ার মতো?' মানিক তৎক্ষণাৎ এসে সঙ্গ নিলে। তারপর চোখ টিপে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী?'

'রসভঙ্গ করে দিয়েছি।'

'মানে?'

'মেয়েটার গা ঘেঁষে বেশ দাঁড়িয়েছিলি। তা মাইরি—'

একটা বিশ্রী কিছু বলতে যাচ্ছিল, টুলু প্রায় ধমকে উঠল।

'খারাপ কথা ছাড়া কিছু আর মুখে আসে না—না? মেয়ে দেখলেই নোলা লক লক করে?'

'লে ব্বাবা!' মানিক দাঁড়িয়ে পড়ল: 'তুই স্লা যে ভগ্নীপোতের পাল্লায় পড়ে একেবারে পাটভাঙা ভদ্দরলোক হয়ে গেলি আচম্‌কা। একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে রে টুলু।'

'হোক বেশি। আমাকে ছেড়ে দে। আমি বাড়ি ফিরব।'

'ফিরো চাঁদ, ফিরো। বাড়ি গিয়ে মা'র কোলে শুয়ে ঝিনুক-বাটিতে দুদু খেয়ো।' বলে শক্ত করে আবার হাত চেপে ধরল টুলুর: 'তার আগে চল্ ওই চায়ের দোকানে। দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী দরকারী কথা আবার? আমি তোদের দল ছেড়েছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' মানিক বাঁকা চোখে তাকালো : 'কিন্তু তুমি দল ছাড়লেই দল তো তোমায় ছাড়তে পারে না। হচ্ছে—সে-সব হচ্ছে। তার আগে চল্ তোকে কিছু খাওয়াই। খিদে পেয়েছে বলেছিলি।'

পরিত্রাণ নেই, কামড়ে ধরেছে জোঁকের মতো। খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু বিরক্তিতে তার খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই আর। অথচ বোঝাই যাচ্ছে মানিক তাকে ছাড়বে না। বিস্বাদ আর ক্লান্ত মন নিয়ে সে মানিকের সঙ্গে ঢুকল চায়ের দোকানে।

দোকানটা কুলীন নয়। টিনের চাল, বেড়ার ঘর। মিস্ত্রি-মজুর, অল্প পয়সার সাধারণ মানুষ এখানকার খরিদ্দার। সস্তায় চা, সস্তায় খাবার। মাংসভাজার তীব্র গন্ধ আসছে রাস্তা পর্যন্ত। ভেতরটা জমাট।

দুজনে ভেতরে ঢুকে এসে কোণার দিকে নিরিবিলি একটা ছোট টেবিল বেছে নিলে। টুলু হাতের ব্যাগটা ঠেস দিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে।

মানিক বললে, 'বাঃ, চকচকে একটা ব্যাগও কিনেছিস দেখছি।'

'ফাইল কেস।'

'ও-সব বুঝি নে। কী আছে ওতে? টাকা?'

'না—কাগজ-পত্তর।'

'ধুস!' মানিক ভুরু কোঁচকালো : 'কী খাবি?'

'তোর যা ইচ্ছে।'

'চপ?'

'আচ্ছা।'

দুটো করে চপের হুকুম দিয়ে মানিক বললে, 'বুঝলি টুলু, এবার একটু দেশের কাজ-টাজ করব ভাবছি।'

'কী করবি বললি?' টুলু খাবি খেলো একটা।

'দেশের কাজ। পলিটিক্স্।'

'পলিটিক্স্!' টুলু একটু হাঁ করে রইল : 'বাস জ্বালানো? সে তো ফাঁক পেলেই করছিস।'

'দূর—ও তো মজা। ও-সব না। ওরা আমায় বলছিল।'

'কারা?'

'আমাদের ও-তল্লাটে যারা ঝাণ্ডা-ফাণ্ডা নিয়ে বেড়ায়—জিন্দাবাদ আর কবর দিন বলে চ্যাচায়। ওদেরই জন-দুই আমাকে খুব বোঝাচ্ছিল—জানলি? বললে

কেন এসব করছ, এখন ইনকিলাব আসছে, তোমরা কী বলে দেশের যুব—যুব—যুবশক্তি, কেন মস্তানি করে বেড়াও—সামিল হয়ে যাও। খারাপ কাজ-টাজ ছাড়ো, এসো আমাদের সঙ্গে।'

'তুই রাজী হয়ে গেলি ?'

'দাঁড়া না—' অসংখ্য দাগধরা ময়লা টেবিলটায় আঙুল বাজাতে বাজাতে মানিক বললে, 'অত সস্তায় ? বললুম, কী দেবেন দাদারা, সেইটে আগে বলুন। ভোটের সময় ওদের হয়ে চিল্লিয়েছি, ভলেন্টারী করেছি, দিনে চার টাকা আর দু'বেলা মাংস-পরোটা দিত। সেই রেট দেবেন তো ! বললে, ও-সব নয়, ওর চেয়ে বেশি দেব। গুণ্ডাবাজী ছাড়ো, ইনকিলাবের জন্যে জান লড়িয়ে দাও। সময় এসে গেছে—ইনকিলাব হয়ে যাক, সবাইকে কাজ দেব, খাবার দেব, ভালো হয়ে বাঁচবার পথ করে দেব।' হঠাৎ মানিকের চোখের ওপরে ছায়া নামল : 'মাইরি, তোর কী মনে হয় রে ? ভালো লাগে না শালা ওয়াগন ভাঙতে। চোরে চোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা আছেই, কিন্তু বিশ্বেস তো নেই—কোন্‌দিন এক ব্যাটা আর-পি হয়তো দিলে ধাঁই করে রাইফেল চালিয়ে। সেদিন মাইরি কাঁকুড়গাছি ইয়ার্ডে আমার মামাতো ভাইয়ের কান ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে গেল একটা। আচ্ছা ওরা সত্যি কথা বলে, সব বদলে দেবে ? খাটব, খেতে পাব ?'

টুলু বললে, 'জানি না।'

'তোকে বলছি ভাই, যদি একটা বাঁধা রোজগার থাকত না, ঠিক একটা বিয়ে-থা করে একটু অন্যরকম হয়ে যেতুম। অবিশ্যি এক-আধটু চোলাই না হলে আমার চলবে না। বৌ তাতে রাগ করবে না—কী বলিস।'

'বোধ হয় করবে না—' টুলু ক্লান্তভাবে হাসল। একটু অন্যরকম হয়ে যাওয়া ! সে-কথা তো সে নিজেও ভাবছে। তার না হয় দিদি আছে, মণীশদা আছে, দাদা আছে, মা'র চোখের জল আছে আর বাড়ির কথা ভেবে একটা লজ্জার জায়গাও আছে। কিন্তু মানিকের তো এসব বালাই নেই—সেও জীবনকে বদলাতে চায় ?

ঘোর-লাগা চোখে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিল মানিক। টুলু আবার বললে, 'তুই স্বপ্ন দেখছিস মানিক ?'

'মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে রে। দুর শালা, কী মানে হয় এভাবে বেঁচে থাকার ? বাবা ব্যাটাচ্ছেলেই ঠিক বলত, আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেছি।'

'নিজের বাপকে গাল দিলি ?'

'থাম্, বকিসনি। ওরা সত্যি কথা বলে ? আমরা ওদের সঙ্গে মিশে জান লড়িয়ে দিলে ইনকিলাব এসে যাবে ?'

'আমি বলতে পারব না। আমার দাদাকে জিজ্ঞেস করিস। এসব নিয়ে ও মাথা ঘামায়।'

'তোর দাদাকে মাইরি আমার ভাল্লাগে না। এমন করে তাকায় যে, মনে হয় আমাকে নয়—একটা কাঁকড়া-বিছে দেখছে।'

খাবার এল। মানিক বললে, 'নে, খা।'

টুলু বিরক্তিটা ভুলতে লাগল আস্তে আস্তে। কোথায় যেন মানিকের সঙ্গে মনের সুর মিলতে শুরু হয়েছে তার। এক ভাবনা—একটা স্বপ্ন। মাইরি, কোথায় চলেছি আমরা, কী মানে হয় এর ? এরকম না হয়ে জীবনটা আর কিছু হলে ভালো হয়, খুব ভালো হয়।

মানিক বললে, 'ভাবছিস কী, খা।'

দুজনে খেতে শুরু করল। মানিক খুশি হয়ে বললে, 'বেশ করে এরা খাবার-গুলো। ঝাল-মাংসটা আরো বেড়ে হয়। চাটের সঙ্গে যা জমে ?'

'তা জমুক।' টুলু আবার আলোচনাটার জের টানল: 'তা হলে তুই পলিটিক্স্ করবি ঠিক করেছিস।'

'ভাবছি।'

'কী করতে বলছে ?'

'বলছিল, সোনারপুরের ওদিকে কোথায় গাঁয়ে যেতে।'

'কী করবি সেখানে গিয়ে ?'

'ওরা বলছিল, বেনামদার জমি দখল করতে হবে। দিতে হবে চাষী ভাইদের।'

'তুইও জমির ভাগ পাবি নাকি ?'

'ধ্যাৎ—আমি জমি দিয়ে কী করব ? আমাদের সাতপুরুষ লাঙলে হাত দিয়েছে কখনো ?'

'তা হলে তোর কী লাভ ?'

'সকলের লাভ। ইনকিলাবের রাস্তা তৈরি হবে।' মানিকের চোখ ঝকঝক করে উঠল: 'আরো মজা আছে রে। লেগে যেতে পারে।'

'কী ?'

'দাঙ্গা। খুনোখুনিও হতে পারে।'

টুলু চমকালো। মুখ থেকে নামিয়ে ফেলল চামচেটা: 'খুনোখুনির মধ্যে যাচ্ছিস ?'

'আরে এ তো আর দুশমনী করে মানুষের পেটে চাকু চালানো নয়। এ হল দেশের কাজ। দুশো-পাঁচশো—দু-দশ হাজার জান চলে না গেলে ইনকিলাব আসে ?'

টুলু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তুই খুনোখুনির লোভে যাচ্ছিস না তো ?'

'না রে—না। ওদের কথায় সেই থেকে কিরকম যেন লাগছে। ভাবছি—দেখিই না, অন্য কোনো রাস্তা আছে কিনা।'

'যাবি ঠিক করেছিস ?'

মানিক বললে, 'দেখি।'

'আর ওয়াগন ভাঙা ?'

'সে তো আছেই হাতের পাঁচ। কিন্তু ওদের কথাতেই চট করে কিছু করব না। ভাবতে হবে আর একটু—বুঝলি ?'

কিছুই বলা যায় না—টুলু ভাবল। হয়তো সত্যিই সময় বদলাচ্ছে। কাল টুলু ভেবেছে, আজ মানিক ভাবছে। এর পরে ফণী, কার্তিক, প্রমোদ—সবাই ভাববে। আমাদের কাজ নেই, আমাদের পয়সা নেই, আমরা ভালো হতে পারি নি। আমরা যা-তা হয়ে গেছি। ঝকঝকে তকতকে কিছু দেখলে আমাদের পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—কাদা ছিটোতে ইচ্ছে করে ধোপ-দুরস্ত জামা-কাপড়ে—ইচ্ছে হয় মেয়েদের গায়ে কালি ছড়িয়ে দিই। আমাদের কেউ পয়সা দেয় না বলে আমরা যেভাবে হোক পয়সা কামাই, কেড়ে-কুড়ে নিই; আমাদের কোনো আনন্দ নেই বলে আমাদের ফুর্তি বেপরোয়া। মাঝে মাঝে যখন কিছু ভালো লাগে না, কিছুই না—তখন তেতে উঠবার জন্যে মারামারি বাধিয়ে দিই—বোমা-পটকা ফাটিয়ে গুলজার করে তুলি। কিন্তু লাগিয়ে দাও আমাদের কাজে, দেখিয়ে দাও রাস্তা, করো খেটে-খাওয়ার ব্যবস্থা—দেখি, আমরা অন্যরকম হতে পারি কি না।

হয়তো এইভাবেই মানিকও কিছু ভাবছিল। চা এসেছিল, তাতে চুমুক দিতে দিতে মানিকের আর একটা দরকারী জিনিস মনে পড়ল তখন।

'এই টুলু, একটা সত্যি কথা বলবি ?'

'কী ?'

'থানার দারোগার কাছে তুই কী বলেছিস ?'

টুলুর মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল একটা।

'একথা কেন ?'

'কারণ আছে। জবাব দে। থানার দারোগার কাছে তুই মুচলেকা দিয়ে এসেছিস, না ?'

টুলু একবার ঠোঁট চাটল। নিজের কাপুরুষতার জন্যে লজ্জা হচ্ছিল তার। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিছুই তো বলিনি। কেবল আর কখনো বাজে দলে থাকব না, কোনো হাঙ্গামা-হুজুতের মধ্যে যাব না—এইটে লিখে সই করে দিয়েছি।'

'আর কিছু না ?'

মানিকের চোখের দৃষ্টি, তার বলবার ভঙ্গিটা—শিরশির করে উঠল টুলুর বুকের ভেতর। কী বলতে চায় মানিক ?

'আর কী বলব ?'

'তুই জানিস, ফণের লুকিয়ে-রাখা আট-দশটা বোম পুলিস খুঁজে বের করেছে ?'

'তার আমি কী করব ?'

'কার্তিককে গো-বেড়েন দিয়ে কাল ছেড়ে দিয়েছে, কেস আছে ওর নামে। পরে তারিখ পড়বে। কে যেন জামিন দিয়েছে ওর। ফণেকে ছাড়বে না। বোমগুলোর জন্যে ওর জেল হবে বোধ হয়। আর ফণে কী বলেছে, জানিস ? বোমের খবর পুলিসকে নিশ্চয় টুলু শালাই দিয়েছে। নইলে খোঁজ পাওয়ার তো কথা নয়।'

গলায় চা আটকে বিষম খাওয়ার জো হল টুলুর। মানিক তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল তার দিকে।

'সত্যি কথা বল্। হাজত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে নেমকহারামি করেছিস তুই ?'

অবিশ্বাস আর ঘৃনা ঠিকরে পড়ছে মানিকের চোখ থেকে। টুলু যেন ডুবে যাচ্ছিল।

'না, আমি বলিনি। কখনো না। বিশ্বাস কর্ তুই। আর আমি যদি বলেই দিতুম, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওগুলো বের করে আনত। পনেরো-

ষোলো দিন দেরি হবে কেন ?'

'তা ঠিক—' একটু কোমল হল মানিকের দৃষ্টি, আবার টকটক করে টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে লাগল সে: 'কিন্তু তোর ওপর যাতে কারুর সন্দো না হয়, সেই জন্যেই হয়তো ইচ্ছে করে দেরি করেছে ওরা!'

'না মাইরি, কখনো না—' টুলু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: 'আমি দল ছাড়তে পারি, কিন্তু হারামী করব ? কী করে এসব বিশ্বাস করিস তুই ?'

'আমার বিশ্বেস-অবিশ্বেসে কিছুই আসে-যায় না—' চিন্তিতভাবে মানিক বললে, 'কিন্তু ফণে শালাকে বোঝাতে পারলে হয়। কাতিক উল্লুকটাও রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ফণের ছিনতাইয়ের দলের কেউ আবার তোকে আচম্‌কা চাকু মেরে না বসে, তাই ভাবছি।'

আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল টুলু: 'আমাকে চাকু মারবে ?'

'দেখি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি কি না। তবে দিন কয়েক একটু সাবধান হয়ে চলিস। আসলে এই কথাটা বলবার জন্যেই তোকে ডেকে-ছিলুম। দাঁড়া, আগে এদের বিল মিটিয়ে দিই, তারপর তোকে আমি সঙ্গে করে বাসে তুলে দেব। এই তল্লাটে এখন একা তোকে ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয না। কিন্তু বার বার তিনবার। সত্যি বলছিস, হারামী করিসনি তুই ?'

'না—না—না—'

জোর করে বলবার চেষ্টা করল টুলু, কিন্তু স্বর ফুটল না ভালো করে। সবটা যেন একরাশ দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে মিশে গেল।

ঠিক একই সময় চৌরঙ্গীর আর একটা চায়ের দোকানে নিঃশব্দে চুরুট খাচ্ছিল স্বরাজ। রাশি রাশি ধোঁয়ায় মুখটা তার একবার ফুটে উঠছে, আর একবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীর বললে, 'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ? এর একটা উপায় তো করতেই হবে।'

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে এতক্ষণে আবার কথা বলল স্বরাজ।

'কোনো উপায় নেই ভুলু। এখন এ-ই হবে। কালটাই এইরকম।'

॥ চৌদ্দ ॥

কথাটা জানা, কথাটা অনেকবার বলা: কালটাই এই রকম। স্বরাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল প্রবীর। সামনের রাস্তাটা ছোট, তবু

এই পাড়ার সান্ধ্য ট্র্যাফিকের স্রোত বইছিল সব রকম শব্দ তুলে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ওধারের বাড়িটার দোতলা থেকে মধ্যে মধ্যে উঠে আসছিল পিয়ানোর সুর—আবার ভেসে যাচ্ছিল চল্‌তি গাড়ি আর মানুষের কলরবের মধ্যে।

ঠিক, সময়টাই এই রকম। কলরবে, গর্জনে, শব্দের সংঘাতে সব সুরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীর কাছে সেদিন সে গিয়েছিল কয়েকটা কোমল আর মধুর মুহূর্তের সন্ধানে—একটা কথা বলতে চেয়েছিল, হয়তো বলাও যেত। কিন্তু দেখা দিল আনন্দ। তখন নিজেকে যেমন লোভী তেমনি নির্লজ্জ মনে হল তার। না, একথা সে কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে, আনন্দরাই ঠিক পথ বেছে নিয়েছে, সারা ভারতবর্ষের ক্রুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলোকে এত সহজেই মোকাবেলা করা যাবে না, আরো অনেক এগিয়ে—অনেক ব্যাপ্ত হয়ে—অনেক মতকে সংহত করে তবেই চুড়ান্ত আঘাত হানা যাবে। কিন্তু সে তো তর্কের কথা। তার আগে এত বড ত্যাগ, এমন সাহসকে শ্রদ্ধা করবে না—অন্তত অতখানি গোঁড়ামী প্রবীরের নেই। তাই আনন্দই সেদিন তার স্বার্থপর সন্ধ্যাটাকে বজ্রবিদ্যুতে ভরে দিয়ে গেল।

কিন্তু স্বরাজ আর সুজাতা। সেসব দিনগুলোকে সে তো দেখেছে। আর নীলু। শিবপ্রসাদের দু'চোখে সেই অন্ধকার। খারাপ লাগছিল, খুব খারাপ লাগছিল তার।

প্রবীর বললে, 'স্বরাজদা, আর এক কাপ চা?'

স্বরাজ নড়ে উঠল। একটা হাতে মাথা রেখে টেবিলের ওপর যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সে।

'অ্যাঁ, চা? হোক।'

চা বলে দিয়ে আবার কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল প্রবীর।

'স্বরাজদা, অকারণেই বাড়িয়ে তুলছ তুমি। এ নিছক মান-অভিমানের ব্যাপার। জাস্ট গো টু সুজাতা বৌদি, অ্যাণ্ড আই থিংক—'

বাঁ হাত নেড়ে বিরক্তিভরে কথাটা থামিয়ে দিলে স্বরাজ। বললে, 'কমিউনিস্ট পার্টির একটা স্টেজে কমরেড বাট্‌লিওয়ালা আর তাঁর স্ত্রী নার্গিস বাট্‌লিওয়ালার কথা মনে আছে তোর?'

'শুনেছি।'

'কেরালার টমাস আর—'

'এ সবের কোনো মানে হয় না স্বরাজদা—' প্রবীর বিরক্ত হল। 'তোমাদের ব্যাপার অত সিরিয়াস কিছু নয়। ইচ্ছে করলেই এগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারো।'

'তাব মানে, সুজাতাকে অ্যাকৃটিভ্ পলিটিকসে ছেড়ে দেব ?'

'অত ভাবছ কেন ? বৌদির শরীর আর আগের মতো নেই যে, এ-সব স্ট্রেন সে সহ্য কবতে পারবে। তা ছাড়া এখন সংসাবে জড়িয়ে পড়েছে, ওভাবে কাজকর্ম করতেও পারবে না। এক আধটা মীটিঙে যদি যেতে চায—যাক না।'

হঠাৎ স্বরাজের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কেন যাবে মীটিঙে ? কী হবে গিয়ে ?'

'কী আশ্চর্য, তুমি—'

স্বরাজ বিস্বাদ গলায় বললে, 'থামো ভুলু। কিসের পলিটিক্স্ ? কাদের জন্যে পলিটিক্স্ ? ভারতবর্ষের জন্যে ? কিচ্ছু হবে না ভারতবর্ষের। যাই করো, যতই করো—শেষ পযন্ত টিকে থাকবে শোভিনিজ্ম্ ? কোন প্রভিনসে অয়েল রিফাইনারী হবে কি হবে না তাই নিয়ে চলবে লাইন ওপড়ানো, স্টেশন জ্বালানো। লড়াই চলবে, মহারাষ্ট্রে মহীশূরে, অন্ধ্র তামিলনাড়ুতে, পাঞ্জাবে হরিয়ানায়—দেখবে দু'দিন বাদে সারাদেশ জুড়ে চলবে খেয়োখেয়ি, বল্কানাইজেশন। তার ওপরে ধর্ম আছে, নানা সেনা আছেন, গোরক্ষা রয়েছে, আর তার ওপর রয়েছে কয়েকশো পলিটিক্যাল পার্টি। আরো কিছুদিন যাক, ভেঙে পড়ুক সেণ্টারের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেণ্ট, তখন অনিবার্য সিভিল ওয়ার এবং পাকাপাকি হয়ে বসবে ফ্যাসিজম। কিচ্ছু ভেবো না, তখন তোমাদের মত ঘোর লাল, মাঝারি লাল, ফিকে লাল,—সবাইকে লাইন করে দাঁড করিয়ে দিয়ে মেশিনগান চালাবে। হিটলারের জার্মানী, মুসোলিনীর ইতালী কিংবা ফ্রাঙ্কোর স্পেন— দ্যাট ইজ ইয়োর ফিউচার। দেন থার্ড ওয়াল্ড ওয়ার— ব্যাস নিশ্চিন্ত।'

ও-পাশের টেবিলে তিন-চারটি ছেলে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল, তারা উৎকর্ণ হল। একজন চাপা গলায় কী বলল, বাকী ছেলেরা হেসে উঠল একসঙ্গে।

স্বরাজ একবার উগ্র চোখে তাকালো সেদিকে, প্রবীর লক্ষ্যও করল না।

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'অকারণে তুমি পেসিমিস্ট হচ্ছ। ভিয়েৎনাম—'

'স্টপ দ্যাট্। ভিয়েৎনাম—ভিয়েৎনাম। ওই এক নামই জপ করতে পারো তোমরা, কিন্তু ক্যান ইউ প্রোডিয়ুস ওয়ান হো চি মিন, ওয়ান জেনারেল গিয়াপ ? এক-হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারো ইম্পিরিয়লিস্ট অ্যাগ্রেশনের বিরুদ্ধে ? পারো না, কোনো দিন পারবে না। ইণ্ডিয়া ইজ এ ডিফারেণ্ট কানট্রি—ইটস্ রটন টু দ্য কোর

এখানে প্রতি তিনজনে একটা করে পলিটিক্যাল পার্টি। প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টির কাজ হল অন্যকে ভিলিফাই করা—এর ওর মাথা ভাঙা। আসল কথা কী জানো? ভারতবর্ষ কখনো বিপ্লব করেনি, যুদ্ধ করেনি, বাইরের আঘাতের মুখোমুখি হয়নি। ইংরেজের ওপর অভিমান করে অহিংসার মাটির পাত্রে ভাত খেয়েছে, দু-চারটে ইংরেজ মেরে বোমা-বন্দুকের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নাম করে যত এগিয়েছে, বিট্রে করেছে তার চেয়েও বেশি। আর গোকুলে বাড়ছে ক্যাপিট্যালিস্ট বংশ, এক-একটা ফ্যামিলির ইনকাম দাঁড়াচ্ছে দৈনিক লাখ টাকা করে। শ্রমিক আন্দোলন, স্ট্রাইকের ভোঁতা অস্ত্রটা মারছে এখন নিজের কপালে, কৃষক ফলিডল খাচ্ছে। এক দোজ নকশালবাড়ি চ্যাপ্‌স—দে মেণ্ট সাম বিজ্‌নেস। কিন্তু তারাও ওভারজেলাস—ভারতবর্ষের গোবরগাদাকে ভাবছে বারুদের স্তূপ, সেখানে তারা এক্সপ্লোশন ঘটাবে। উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু তারাও ক'টা দলে ভাগ হয়েছে হে? চারটে, পাঁচটা, ছটা?'

অন্য টেবিলের ছেলেরা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজা থেকে একটা মন্তব্য শোনা গেল: 'যত দলেই ভাগ হোক—গোবরগাদার গুব্‌রে পোকাদের উড়িয়ে দেবে নিশ্চয়। বাদ যাবেন না দাদারা, ভয় নেই।' অর্থাৎ ওদের সহানুভূতি নকশালবাড়ির দিকে।

ছেলেরা রাস্তায় নেমে গেল। বাঁকা একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল স্বরাজের মুখে।

'ওই গুব্‌রে পোকাই উড়িয়ে দিতে পারবে। ওই পর্যন্তই তোমাদের দৌড়।'

প্রবীর ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। নৈরাজ্যবাদ—মেণ্টাল অ্যানার্কি। পার্টি ভাঙাভাঙির সূত্র ধরে স্বরাজ একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। এ এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউন। তর্ক করা বৃথা, শুধু কথাই বাড়বে।

'স্বরাজদা, এ-সব থাক। কিন্তু তুমি সুজাতা বৌদির ব্যাপারে—'

চা দিয়েছিল একটু আগে, ফ্যানের হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে যেন খেয়াল হল স্বরাজের। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সুজাতা। সেই জন্যেই আমি বলেছিলুম, সুজাতা, তোমার যা খুশি তা করতে পারো, তুমি যদি অ্যাক্টিভিটি চাও বস্তির ছেলেদের বিনিপয়সায় পড়াতে পারো, বাট ডোণ্ট গো ইনটু পলিটিক্স্। ননসেন্স—শীয়ার ননসেন্স।'

'তা হলে দেশের জন্যে কিছু করবার নেই?'

'না—ইট্‌স ডুম্‌ড্।'

'ভুম্‌ড্‌ ?'

'হ্যাঁ। কংগ্রেসের একটা বুর্জোয়া চক্ষুলজ্জা ছিল, লেফ্‌ট পলিটিক্‌সের সে বালাইও নেই। বাড়ি গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও ভুলু, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, তোমাদের নেতারাই ভারতবর্ষকে ভারত মহাসাগরের কয়েক হাজার মীটার জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে। নেতা—নেতা—নেতা! দোজ পেট্রিয়টস অ্যাণ্ড দেয়ার পলিটিক্‌স্‌! "It has been called patriotism to flatter those in power at the expense of the people—to mislead first and then betray—" কার লেখা বলতে পারো ?'

'না, জানি না।'

'জেনেও দরকার নেই তোমাদের। লাভই বা কী ? কিন্তু হ্যাঁ—সুজাতা। আমি চাই না, সুজাতা রাজনীতি করে। আই হেট্‌ পলিটিক্‌স্‌, হেট্‌ ইয়োর পলিটিশ্যনস্‌, হেট্‌ ইয়োর বম্বাস্টিং স্লোগ্যানস। তাই সুজাতা যখন মিটিঙে যেতে চায়, হব নবিং করতে চায় রাজনীতি নিয়ে, তখন আমার মাথাব ভেতরে আগুন ছুটে যায়।'

চা খেতে গিয়ে প্রবীর দেখল সেটা কখন ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। এক চুমুকেই তাব সবটা গিলে ফেলল সে। অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে স্বরাজকে। মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে যাবে। কেমন ভয় ধরে গেল তার।

'চলো, স্বরাজদা, উঠি।'

'চলো।'

দুজনে রাস্তায় নামল। সামনের বাড়িতে পিয়ানো বাজছে তখনো, কোনো জনপ্রিয় ইংরিজি ছবির সুর। কিন্তু সুরটা ফুটতে পারছে না সম্পূর্ণ—চারদিকের কোলাহলে হারিয়ে যেতে চাইছে। কালটাই এই রকম। সব সুর এখন হারিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণির ভেতরে।

রাস্তায় হাওয়া। সারাদিনের গুমোটের পর উতরোল হয়ে এসেছে দক্ষিণ সাগরের উদারতা। একটা পানের দোকানে রেডিয়ো বাজছে। সন্ধ্যার খবর।

'দু'দল সমর্থকের সংঘর্ষের ফলে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে, সাতজন আহত হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে আরো জানা যায় যে, কয়েকটি বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়—'

একবারের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল স্বরাজ: 'শুনলি ? এই হচ্ছে বামপন্থী ঐক্যের চেহারা। লীডারশিপ!' আবার ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটল: 'তুই

এখনো খুব অপটিমিস্ট—তাই না ?'

চব্বিশ পরগণার কোন দূর গ্রাম থেকে আগুনের হলকা এসে দক্ষিণ বাতাসের শীতলতাকে গ্রাস করল। প্রবীর চুপ করে রইল একটু।

'এর পরেও রাজনীতিতে উৎসাহ থাকে তোর ?'

'অনেক ভুলের মধ্য দিয়েই পথ তৈরি হয়।'

'কপিবুক আউডে কোনো লাভ নেই ভুলু, ইউ নো হোয়াট ইজ হোয়াট। এই পলিটিক্‌সে আমি সুজাতাকে যেতে দেব ? তার চেয়ে সে রোজ হিন্দী ফিল্ম দেখুক, আমি আপত্তি করব না।'

'কিন্তু স্বরাজদা, রাজনীতির ভেতর দিয়েই তোমরা একসঙ্গে মিলেছিলে।'

'আজ রাজনীতির মূর্খতা মিটিয়েই আমরা মিলে থাকতে চাই। কিন্তু দেয়ার ইজ দ্য বোন অব কনটেনশ্যন। সুজাতা এখনো নেতাদের বিশ্বাস করে, তাদের বাণী তার কাছে বেদবাক্য ! সে বলে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি একটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশ্যন। অবস্থাটা কী জানিস ? আমরা যেন দুটো ধর্মের মানুষ, ঘোর কমুনাল, চব্বিশ ঘণ্টা এ ওর বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছি। এ চলতে পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না ভুলু। চলে যাক সুজাতা, ওর নেতাদের বাণী শুনে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখুক, শরিকী বোমাবাজিতে খুন হয়ে যাক। আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি একা থাকব, সুখেই থাকব '

'আর নীলু ?'

'এখন কাঁদবে। আর একটু বড় হলে মাকে ভুলে যাবে। অনেক ছেলেরই তো অল্প বয়সে মা হারিয়ে যায়।'

'তুমি কী বীভৎসভাবে নিষ্ঠুর হয়ে গেছ স্বরাজদা।'

'নিষ্ঠুর হইনি—' নিষ্ঠুরভাবে স্বরাজ বললে, 'চলে গিয়ে ও-ও বেঁচেছে, আমিও বেঁচেছি। আর কিছুদিন এ-ভাবে দুজনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চললে আমি পাগল হয়ে যেতুম।'

পাগল হতে আর বাকী কতখানি—প্রবীর ভাবল। সেই স্বরাজদা। ছাত্র-নেতা। মিছিলের আগে আগে। বক্তৃতা দিচ্ছে এক হাতে মাইক চেপে ধরে, আর এক হাত মুঠো করে পাকিয়ে—সেই রুদ্ধ মুষ্টিতে বজ্রের শপথ।

'কমরেডস, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা আমাদের করতে হবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি, টেনে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে দেব প্রতিক্রিয়া-

শীলদের মুখোশগুলো। ধনতন্ত্র আর জঙ্গীবাদকে চিরকালের মতো কবর দেব মাটির তলায়। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ। ইন্‌কিলাব—'

'জিন্দাবাদ—' ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট কাঁপিয়ে প্রলয়রোল।

'তুমি সুজাতা বৌদির কাছে যাবে না?'

'না।'

'কিন্তু জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা—'

'বাবা সারাজীবন অনেক দুঃখ সয়েছেন, তাঁর আরো সইবে। মা বাবার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এ ভারও তিনি বইতে পারবেন। ও-সব ছেড়ে দে ভুলু।' স্বরাজ একটু হাসল: 'এর চাইতে দেশে এখনো ইংরেজ রাজত্ব থাকলে অনেক ভালো হত—না রে? আমরা সবাই মিলে গলা ছেড়ে অন্তত সেই সাধারণ শত্রুকে গাল দিতে পারতুম, নিজেদের মধ্যে এ-ভাবে খেয়োখেয়ি হত না।'

প্রবীর নিশ্বাস ফেলল: 'জানি না।'

তার মন অন্য কথা ভাবছিল। সাবিত্রী আর সুজাতা বৌদি একই কলেজের ছাত্রী ছিল না এক সময়? সাবিত্রী সায়ান্সে, সুজাতা আর্টসে। বোধ হয় বছর-খানেকের সিনিয়র ছিল সুজাতা। একসঙ্গে কলেজে ইউনিয়নও করত। সাবিত্রী একটু আল্‌গাভাবে ছিল, তাই মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে কলেজে চাকরি নিলে, আর সুজাতা—একবার সাবিত্রীকে বলা যায় সুজাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে? বলা যায়?

হঠাৎ স্বরাজের গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার কাছে।

'ওই সামনের বাসটা ধরতে হবে ভুলু। এখন আর কথা নয়—বাড়ি ফেরা দরকার।'

'তুমি যাও স্বরাজদা। আমার একটা কাজ আছে।'

'এখন আবার কী কাজ?'

'আছে একটু। তুমি এগোও।'

স্বরাজ আর দাঁড়ালো না। বাস ধরবার জন্যে দৌড়ে এগিয়ে গেল।

সাবিত্রীকে বলা যাক। আজ—এই রাত্রেই। বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হোক, ক্ষতি নেই। সে টুলু নয়—মা তার জন্যে ভাব্‌বেন না।

তার ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগছে। সাবিত্রীর সঙ্গে একবার দেখা না হলে আজ রাত্রে তার ঘুম আসবে না।

। পনেরো ।

শঙ্কর মাছের ল্যাজের তৈরি চাবুকটা সাত-আট বছর আগে কেনা হয়েছিল পুরীতে। এতকাল ওটা দেওয়ালেই শোভা পাচ্ছিল, কোনোদিন কাজে লাগতে পারে এ-রকম চিন্তাই কারো মনে জাগেনি। আজ উমা সেইটেই খুলে নিলে দেওয়াল থেকে। রাগে টকটক করছে মুখের রঙ, চোখের কপিল তারা দুটো থেকে ছিটকে পড়ছে আগুন। দাঁতে দাঁতে কিশকিশ করে হাঁপানো গলায় বললে, 'এই চাবুক দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেব তোর। আই 'ইল স্কিন ইয়ু অ্যালাইভ!'

আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যাচ্ছিল টিনটিন। বললে, 'না।'

'খুন করে ফেলব তোকে নচ্ছার মেয়ে। ভেবেছো কী! বাইরে গিয়ে তুমি ড্রিংক করে—'

'বা রে, কোথায় ড্রিংক করেছি ? আমি তো একটু বীয়র ছাড়া—'

'একটু বীয়র। কী বলা হয়েছিল তোমায় ? জাস্ট অকেজনালি এক-আধটু বীয়র খাওয়ার পারমিশন দেওয়া হয়েছিল তোমায়, তার বদলে তুমি টিপ্‌সি হয়ে বাড়ি ফিরবে ? এইটুকু মেয়ে—এর মধ্যে এত বখে গেছ তুমি ? আজ তোকে খুন করে ফেলব।'

এবার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল টিনটিন। মুখ ফ্যাকাশে, একটু-একটু কাঁপছে ঠোঁট দুটো। বাঘিনীর মতো এগোচ্ছিল উমা, চাবুকটা উঠে এল এবার।

'না, আমাকে কক্ষণো মারতে পারো না তুমি, কক্ষণো না—' হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল টিনটিন।

আচমকা চিৎকারে উমা থমকে দাঁড়ালো।

'কেন মারব না, শুনি ?'

'আমি তো গোড়াতে খেতে চাইনি—' টিনটিন অস্বাভাবিক জোর নিয়ে এল গলায় : 'তুমি আর বাপীই তো আমাকে ডিনারের পর পেগ দিয়েছ—বলেছ, এ-সব ম্যানার্স, সোসাইটিতে মিশতে গেলে এগুলো শিখতে হয়। এখন বুঝি সব দোষ আমার ?'

উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার ভয়ের ছায়া তারই মুখে।

ছেলেমানুষ হলেও টিনটিন বুঝতে পারছিল, মাম্মী একটু থমকেছে। তেমনি জোরের সঙ্গে বলে চলল, 'আমি তো খেতেই চাইনি, বিচ্ছিরি তেতো লাগত। তোমরাই তো শেখালে।'

উমা আবার জ্বলে উঠল : 'টেবল্ ম্যানার্স শেখাতে চেয়েছি, মাতাল হতে বলেছি সেই জন্যে ?' উমা নিজের ম্যানার্স ভুলে গিয়ে বাঙালী মতে চিৎকার ছাড়ল একটা : 'হারামজাদা, বজ্জাত মেয়ে কোথাকার !'

'মাম্মী—ইয়ু আর সো ভাল্‌গার।' টিনটিনের মুখে ঘৃণার চিহ্ন দেখা দিল।

'ভাল্‌গার !' পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গিয়ে উমা গর্জন করল : 'ইয়ার্কি দেওয়া হচ্ছে আবার ? আমি যদি আজ তোকে খুনই না করে ফেলি—'

'না।' আবার টিনটিনের সেই অস্বাভাবিক জোরালো প্রতিবাদ : 'আমাকে তুমি মারতে পারবে না। আমাদের কিটেন ক্লাবে বীয়র ছাড়া আর কিছু দেয় না। সবাই-ই তো তাই খায়।'

'তা খায়। তুই কতটা খাস ? ক' বোতল ?'

'বেশি তো খাই না।'

'বেশি না খেলে নেশা হয় ? এর মধ্যেই মাতাল হতে শিখেছ—গোল্লায় যাচ্ছ ? আমি ভেবেছিলুম, তোকে আমি একটা আইডিয়াল মডার্ণ গার্ল করে তুলব, আর তুই—'

শাঁৎ করে চাবুকের একটা জোরালো ঘা পড়ল টিনটিনের কাঁধের ওপর।

যন্ত্রণায় শিউরে উঠল টিনটিন, চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

'আমাকে মারলে তুমি, চাবুক মারলে আমায় ? তুমি বীস্ট্—তুমি বীস্ট্। নিজের বেলায় মনে থাকে না ? পার্টিতে গিয়ে তুমি মাতাল হও না ? বাপী এক-একদিন বাইরে ডিনারের পর ক্রল করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে না ? যত দোষ আমার বেলায় ?'

উমা থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল চাবুকটা।

'আমরা বড়রা যা করব, তুইও তাই করবি ?'

'কেন করব না ? তোমরাই তো শিখিয়েছ।'

টলতে টলতে সরে এল উমা, ধপ করে বসে পড়ল সোফার ওপর। যেন পায়ের তলা থেকে মেঝেটা কেউ টেনে সরিয়ে নিয়েছে তার। ধরা গলায় বললে, 'শেষে তুই এত বড় কথা বলতে পারলি টিনটিন ! এত করে তোকে ট্রেনিঙ দেবার চেষ্টা করলুম, আর তুই এইরকম বেয়াড়া আর নচ্ছার হয়ে গেলি !

আয়্যাম রুইণ্ড—আয়্যাম ক্রাশ্‌ড্‌—আমি সুইসাইড করব।'

দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল উমা। চাবুকের ঘায়ে তখনো গলার কাছটা জ্বালা করছিল টিনটিনের, কিন্তু মাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে দেখে জয়ের আনন্দের সঙ্গে এইবার একটু সহানুভূতিও বোধ হল তার।

আস্তে আস্তে সরে এল উমার কাছে।

'ও মাম্মী, ডোণ্ট ব্রেক ইয়োর হার্ট! আচ্ছা, মাই ওয়র্ড অব অনার—এর পর থেকে আমি খুব কম করে খাব। জাস্ট্‌ লাইক এ গুড্‌ গ্যাল। প্লীজ মাম্মী—অমন করে কেঁদো না, আমার মনে ভারী কষ্ট হচ্ছে।'

পাকামো করে পিঠ চাপড়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, উমা একটা ঝট্‌কা মারল তার হাতে। আবার সেই ভাল্‌গার 'বাঙালী' গালাগাল দিয়ে বললে, 'দূর হয়ে যা হারামজাদী—দূর হয়ে যা সামনে থেকে। তোর আর মুখ দেখব না আমি। আসুক তোর বাপী, আর তোকে কলকাতায় রাখব না—হাজারীবাগের সেই স্কুলটায় ভর্তি করে দেব, মাদাররা কম্পাউণ্ডের বাইরেও বেরুতে দেবে না! চলে যা আমার সামনে থেকে—চলে যা বলছি! ও আয়্যাম রুইণ্ড—আয়্যাম ক্রাশড্‌।'

টিনটিন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। হাজারীবাগের সেই স্কুল! এর আগে মাম্মী আর বাপী মধ্যে মধ্যে এক-আধবার ঠাট্টা করেছে স্কুলটাকে নিয়ে। সে তো স্রেফ জেলখানা। সেখানে গিয়ে থাকতে হবে কলকাতা ছেড়ে, কিটেন ক্লাব ছেড়ে, ডনকে ছেড়ে! ওয়েল—ওয়েল, তা হলে মাম্মীর আগে তাকেই সুইসাইড করতে হবে!

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন—দূর হ বলছি! তোকে হাজারীবাগে পাঠিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

'আমি যাব না হাজারীবাগে।'

উমা সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল, ব্যাপার বুঝে টিনটিন ছুটে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। উমা খুব সম্ভব আবার চাবুকটা কুড়িয়ে নিত, ঠিক এই সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল।

মণীশ? উমা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল বিস্ফোরণের জন্যে। আজ স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝপড়া হয়ে যাবে তার। সে-ই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছে মেয়েকে। এখন দেখুক, একফোঁটা মেয়ে কিভাবে বখে যাচ্ছে, উদ্ধত হয়ে উঠছে, মুখের ওপর তুরুক্‌ জবাব দিয়ে বলছে, 'তোমরাই তো শিখিয়েছ আমাকে!' মনে মনে

গাছকোমর বাঁধল উমা—একেবারে বাঘিনীর মতো।

আবার ডোর বেলে আওয়াজ। কিন্তু মণীশ? কই, গাড়ির শব্দ তো পাওয়া গেল না!

বাইরে থেকে বেয়ারা ডাকল: 'মেমসাহেব?'

চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে উমা বলতে চেষ্টা করল: 'কে এসেছে?'

'ছোট মামা।'

তার মানে টুলু। উমা বললে, 'একটু বসতে বল্—আমি আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সামনে যাওয়া যায় না এখন। এতক্ষণ রাগারাগি আর কান্নাকাটি করে নিশ্চয় মুখ-চোখের চেহারাটা ভারী বিশ্রী হয়ে আছে।

'বসতে বল্ ছোট মামাকে, আমি আসছি।'

খবর সামান্যই দেবার ছিল। অফিস থেকে বেরুবার মুখে মণীশদার সঙ্গে দেখা। গাড়ি করে বেরুচ্ছিল। বললে, 'ভালোই হল টুলু। বাড়ির টেলিফোন লাইনটা খারাপ, অনেক চেষ্টা করেও কানেক্‌শন পাচ্ছি না। তুই একটা খবর দিবি। জরুরি একটা ট্রান্‌জ্যাক্‌শনের কাজে আমাকে এক্ষুণি যেতে হচ্ছে দমদমে। ফিরতে রাত হবে। যাওয়ার পথে তোর দিদিকে একবার বলে যাস।'

বলবার ছিল এইটুকুই। কিন্তু আজ আর দিদি বসতে বলল না তেমন করে। কি রকম গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে আছে। একবার কেবল আলতোভাবে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি একটু?'

'থাক এখন। বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা।'

টুলু পথে বেরিয়ে এল। রাস্তায় হাওয়া। গাছের পাতার শব্দ। ওপাশ দিয়ে ওরা সব জোড় বেঁধে ঢুকছে লেকের দিকে। সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর এদিকটায় বড় বড় বাড়ি আর ছায়ার শান্তি। দু-চারজন লোকের চলাফেরা। কেবল কালীবাড়িটার সামনে বিরাট ভিড়। দল বেঁধে মেয়ে-পুরুষেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোন্ এক সিদ্ধপুরুষ নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন ওখানে।

সেও যাবে নাকি একবার? নিজের ভাগ্যটা গণিয়ে আসবে?

দূর—বাজে কথা ওসব। কোনো মানে হয় না। টুলুর মন ছট্‌ফট করে উঠল একবার। কিছুই হচ্ছে না, কিছুই করা যাচ্ছে না। কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া কবে যে হবে! অ্যাটর্নি অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মেরুদণ্ডটা

যেন ভেঙে যেতে চায়। দাদাই ঠিক বলেছিল। তাড়াতাড়ি করে কিছুই— কিন্তু বুড়ো হেড ক্লার্কটাকে কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না। এক-একদিন মেরে বসতে ইচ্ছে হয় বুড়োকে।

লেকের দিক থেকে হাওয়া, ছায়া, পাতার শব্দ, মধ্যে মধ্যে মাথার ওপরে ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ি—এরই ভেতরে ক্লান্ত শরীর ডুবিয়ে হেঁটে চলছিল প্রতুল। আরো একটা চাপা অস্বস্তি। সন্ধ্যার পরে, এই দিকটা দিয়ে হাঁটতে গেলেই চাড়া দিয়ে ওঠে সেটা। মাণিক বলছিল, ফণী আর কার্তিক—

মিথ্যে—সব মিথ্যে। গৌরবাবু দারোগার কাছে কারো নামে একটা কথাও বলেনি সে। বোমার খোঁজ কোথা থেকে পেয়েছে পুলিসই জানে। ওদের আর কী—মাথামোটা ইডিয়ট সব—যে হোক কাউকে সন্দেহ করতে পারলেই হল। টুলুর মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। শয়তানের সঙ্গই এইরকম—একবার তার জালে জড়িয়ে গেলে তার হাত থেকে বুঝি আর নিস্তার মেলে না।

একটি ছোটখাটো চেহারার মেয়ে তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, ছাড়া ছাড়া আলো-ছায়ায় প্রতুল লক্ষ্য করেনি তাকে। সে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার দ্বিধা করল, একবার ভাবল থাক, তারপর ছোট্ট করে ডাকল: 'টুলুদা!'

তৎক্ষণাৎ থেমে গেল প্রতুল। পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

স্বপ্না পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

'টুলুদা, চিনতে পারছ না?'

ফণী নয়, কার্তিক নয়, ছোরা হাতে কোন বিভীষিকা নয়—তার চাইতেও বড় আতঙ্ক। এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা না হলেই সব চেয়ে সুখী হত সে।

সহজ, স্বাভাবিক গলায় স্বপ্না বললে, 'কী, কথা বলবে না নাকি?'

এতক্ষণে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল প্রতুল।

'মানে, অন্ধকারে—ঠিক চিনতে পারিনি।'

'কিংবা চিনতে চাও না।'

'না—না—মানে আমি—'

'কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই—' স্বপ্না বিষণ্ণভাবে হাসল: 'তুমি তো ভুলে যেতেই চাও। আমিই পেছন থেকে ডেকে তোমাকে বিরক্ত করলাম।'

'স্বপ্না, তুমি জানো না—' অস্পষ্টভাবে প্রতুল বলবার চেষ্টা করল, 'মানে, তোমার কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে। একদিন তুমি আমার জন্যে—

অথচ আমি—'

'কেন বিব্রত হচ্ছ টুলুদা?' স্বপ্না স্নিগ্ধ গলায় বললে, 'তোমায় কিচ্ছু বলতে হবে না। এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছ—না? খুব ক্লান্ত?'

'আমি অফিসে চাকরি করছি, তুমি জানো?' হঠাৎ যেন পায়ের তলায় মাটি পেলো প্রতুল। আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা। তা হলে স্বপ্নাও জানে যে সে এখন বদলে যাচ্ছে, সে আর অপদার্থ একটা মস্তান নয়।

স্বপ্না বললে, 'শুনেছি। সেদিন বাবা এসেছিলেন তোমাদের বাড়িতে, তিনিই বললেন ফিরে গিয়ে।'

'আমি সেদিন জ্যাঠামশাইয়ের সামনে যেতে পারিনি। সাহস হয়নি আমার।'

'বাবাকে তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি। বাবা যে কতখানি ক্ষমা করতে পারেন, তা তুমি জানো না—' কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিল: 'একদিন এসো আমাদের বাড়িতে।'

'না—সে আমি পারব না।'

'কোন ভাবনা নেই তোমার—' হঠাৎ স্বপ্না টুলুর হাত চেপে ধরল: 'কাউকে ভয় করতে হবে না।'

স্বপ্নার হাতের ছোঁয়ায় টুলু শিউরে উঠল। একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা জনচারেক। কার্তিক সকলের আগে।

টুলুর দিকে তাকিয়ে, সাপের মতো একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে বললে, 'এই যে শালা। আজ ক'দিন ধরে তোকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

॥ ষোলো ॥

নিদারুণভাবে চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে গেল স্বপ্না। টুলুর মুখ শুকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'অ্যাই কার্তিক, কী হচ্ছে? জামা ছাড়্ বলছি।'

'জামা ছাড়ব মক্কেল এমনিতেই? খুব ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস, না-রে শালা?'

জামা ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টা করে টুলু বুঝল, লাভ হবে না, জামাটাই ছিঁড়বে মাঝখানে থেকে। স্বপ্না সঙ্গে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে, এই কথা

ভেবে লজ্জায় দুঃখে তার চোখে জল আসছিল। নিজে খুব দুর্বল সে নয়, অন্য সময় হলে এখন সোজা একটা ঘুষি বসিয়ে দিত কার্তিকের মুখে। কিন্তু স্বপ্না! তা ছাড়া দলে ওরা জন চারেক, আর মানিক বলছিল—

ঠাণ্ডা একটা ভয় শিরশিরিয়ে ছড়িয়ে গেল বুকের ভেতরে। সব ব্যাপারটাকে বেশ হাল্‌কা একটা রূপ দেবার চেষ্টা করল সে। 'স্বপ্না, ইয়ে—কিছু মনে কোরো না, মানে এরা আমার পুরোনো বন্ধু, মাঝে মাঝে এক-আধটু ঠাট্টাফাট্টা করে। এ হল কার্তিক—এরা—'

কথাটা শেষ করতে পারল না টুলু, তার আগেই বানরের মতো দাত খিঁচিয়ে উঠল কার্তিক।

'ঠাট্টা! ব্যাটা কুত্তার ছা—ব্যাটা হারামী। নিজের জান বাঁচাবার জন্যে দারোগার কাছে ফণেকে ফাঁসিয়ে এসেছিস, নইলে পুলিস মালের খোঁজ পায় কী করে? আজ শালা এইখানে তোর লাশ ফেলে না যাই তো আমার নাম কার্তিক সমাদ্দারই নয়।'

দলের বাকি তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে একটা ব্যূহের মতো তৈরি করে ফেলল। কার্তিকের একটা হাত ঢুকে গেল পকেটের ভেতর, সেখানে বড় একটা আলুর গায়ে সেফ্‌টি রেজরের একটি ব্লেড্‌ গাঁথা। বেশি কিছু করবার দরকার নেই, বার কয়েক আলতোভাবে মুখের ওপর আলুটা বুলিয়ে নিলেই চমৎকারভাবে বদন বিগড়ে যাবে।

কিন্তু হাতটা পকেট থেকে বেরুবার আগেই সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে টুলু আর কার্তিকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্না। কোমল গলায় ডাকল: 'কার্তিকদা, আমার একটা কথা শুনুন আগে।'

খরখরে গলায় হেসে উঠল দলের একটা ছেলে।

'লে মাইরি! এ শালার ময়না যে আবার দাদা বুলি ছাড়ছে রে!'

কার্তিকের হাতটা কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়েছিল পকেটের মধ্যে। হঠাৎ চড়া গলায় একটা ধমক দিয়ে উঠল কার্তিক।

'চুপ কর্, উল্লুক। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দে।'

দলের তিনটে ছেলের চোখ গোল হয়ে উঠল। এ-রকম তো কথা ছিল না। দু' মিনিটের মধ্যে মামলা মিটিয়ে দিয়ে সটকে পড়বার কথা বলেছিল কার্তিক। হঠাৎ ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দেবার সুবুদ্ধি তার কোথা থেকে গজিয়ে উঠল? একজনের লুব্ধ দৃষ্টি স্বপ্নাকে লেহন করছিল, কার্তিকের কাজ শুরু

হয়ে গেলে সে নিজেও একটুখানি মতলব হাসিল করে নিত। কিন্তু এ যে একেবারে আলাদা ঠেকছে।

স্বপ্না বললে, 'কার্তিকদা, বোনের মতো একটা অনুরোধ করছি। টুলুদা কী অন্যায় করেছে জানি না কিন্তু আজ ওকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালো নেই, অনেক দূরে থাকি। টুলুদা সঙ্গে করে আমাকে পৌছে দিতে যাচ্ছে।'

আশাভঙ্গে মরীয়া ছেলেটা বলে ফেলল: 'মাইরি আর কী! বললেই ছেড়ে দিতে হবে? আজ এই শুয়োরকে আচ্ছামতন ধোলাই দিয়ে তবে অন্য কথা। বাড়ি পৌছে দেবার জন্যে ভাবতে হবে না, আদর করে—'

চাউনি আর গলার আওয়াজে স্বপ্না শিউরে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস করে একটা প্রকাণ্ড চড়ের আওয়াজ। মাথা ঘুরে উলটে পড়তে গিয়ে সামলে নিলে ছেলেটা।

কার্তিক গর্জন করে উঠল: 'চোপরাও কুত্তার বাচ্চা! ইয়াকির জায়গা পাওনি আর? ফের যদি একটু বদিয়তী করেছিস স্লা, তাহলে একদম জবাই করে লেকের জলে ভাসিয়ে দেব।'

চড়-খাওয়া ছেলেটার দু চোখ অক্ষম ক্রোধে জ্বলতে লাগল, হিংসার নীলচে আলো মিটমিট করতে লাগল সেখানে। বাকী ছেলে দুটো যেন স্বপ্ন দেখছে, দাঁড়িয়ে রইল এমনিভাবে। টুলু একটা কাঠের পুতুলের মতো নিঃসাড় হয়ে কার্তিকের দিকে চেয়ে রইল, আর স্বপ্নার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কার্তিক একটু বোকার মতো হাসল। তাকালো স্বপ্নার দিকে।

'কিছু মনে করবেন না দিদি, ও স্লা ছোটলোক, ওর পেটে এক ডজন বোম ঝারলেও একটা ভাল কথা বেরুবে না। আচ্ছা—চলে যান আপনারা। আপনার জন্যেই হারামীর বাচ্চা এই টুলুটাকে আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ফয়সালা বাকী রয়ে গেল।' বলে একটা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে টুলুকে হাত তিনেক এগিয়ে দিলে: 'যা স্লা —খুব বেঁচে গেলি আজকে।'

'বড় উপকার করলেন কার্তিকদা।' আবার নরম গলায় স্বপ্না বললে, 'আচ্ছা আসি তা হলে। নমস্কার।'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ন্-নমস্কার!'

'চলো টুলুদা।'

ভূতে পাওয়ার মতো টুলু স্বপ্নার সঙ্গে পা বাড়ালো, আর এখানে দুজন হাঁ করে দেখতে লাগল কার্তিককে, যেন তারা তাকে চিনতে পারছে না। একটু

তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল মার-খাওয়া ছেলেটা, চড়ের জ্বালায় গাল চিনচিন করছে এখনো, চোখে ঝিক ঝিক করছে নীল হিংসা।

নীরবতা ভাঙল একজনের কথায়।

'এটা কী হল কার্তিকদা ?'

আবার বোকার মতো হাসল কার্তিক।

'কিরকম করে কার্তিকদা বলে ডাকল রে মেয়েটা—সব গোলমাল হয়ে গেল। নিজেকে বেজায় ছোটলোক বলে মনে হল তখন। ভাবলুম, বলছে যখন ভদ্দর-লোকের মেয়ে--'

মার-খাওয়া ছেলেটা অশ্লীল গাল দিয়ে উঠল একটা।

'টুলো স্লার সঙ্গে আবার ভদ্দরলোকের মেয়ে! কোত্থেকে—'

লাফিয়ে উঠে কার্তিক তেড়ে গেল তার দিকে।

'আর একটা বদজোবান করবি তো তোকে এইখানেই সাবাড় করব আজকে।'

ছোকরা পাশের একটা রাস্তা দিয়ে জোর পায়ে দৌড় দিল। যেতে যেতে বলে গেল, 'আচ্ছা শালা, দেখে নেব তোকে।'

আবার তিনজনের বিমর্ষ সমাবেশ। সব অন্যরকম হয়ে গেল। ক'দিন তক্কে-তক্কে ঘুরে টুলুটাকে আজ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে যায়, কেউ জানে না।

কার্তিক একবার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, 'কেমন যেন বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল, না রে ?'

সঙ্গীরা চুপ।

'মাইরি—বোন-ফোন তো নেই—তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে চাদ্দিকে যাদের দেখেছি, সব খেলোয়াড় মেয়ে। কিরকম গলায় যে কার্তিকদা বলে ডাকল, শুনে মেজাজই খারাপ হয়ে গেল! তবে টুলো শালা আর যাবে কোথায়—এক মাঘে তো শীত যায় না, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলেও টেনে বের করব।'

একজন গম্ভীর গলায় বললে, 'তবে হীরুটাকে না মারলেও পারতিস। ও আবার কথায় কথায় চাকু চালায়।'

'যা—যা। ও-সব ছুঁচো-চামচিকেকে কার্তিক সমাদ্দার পরোয়া করে না। এখন একটা সিগ্রেট দে—কিচ্ছু ভালো লাগছে না মাইরি।'

প্রবীর বলেছিল, 'তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।'

সাবিত্রী জবাব দিয়েছিল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

'উল্টো ফলও হতে পারে। আমি তো অন্য পার্টির লোক। সুজাতা বৌদি হয়তো ভাববে যে, স্বরাজদার কুপরামর্শে আমি ওর বিপ্লবের কাজ পণ্ড করতে এসেছি।'

'সে তো আমার সম্বন্ধেও ভাবতে পারে।'

'ভাববে কেন? তোমরা তো একসঙ্গে কলেজে ইউনিয়ন করতে।'

'করেছি। কিন্তু সুজাতা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না। বলত, আসলে আমার মন অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে, আমি পুরো স্যাক্রিফাইস করতে পারি না। ওদের মতো ভোক্যাল হওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হত না, প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে অ্যাংরি ডেমোনস্ট্রেশনে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতুম।'

'বুঝেছি।'

'তা ছাড়া কী জানো—' সাবিত্রীর মুখে একটা ছায়া পড়েছিল: 'ওদের সঙ্গে একটা জায়গায় আমার সম্পূর্ণ মত মিলত না। আমি বলতুম পার্টি পলিটিক্স্ প্রত্যেকের আলাদাভাবে থাকে থাকুক, কিন্তু স্টুডেন্টস ফ্রন্টে আমাদের কতগুলো সাধারণ স্বার্থ—কমন প্রব্লেম নিয়ে এগোতে হবে। সেখানে পার্টির চাইতেও বড় দরকার ইউনিটি। প্রত্যেকে যদি নিজের দলের প্রোগ্রামকে স্টুডেন্টস্ ফ্রন্টে টেনে আনতে চায়, তা হলে ছাত্র-আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাবে, জোর পাবে রি-এক্শনারীরা। সেইখানেই ওদের আপত্তি। পার্টি লীডারশিপের ডিক্টেশন ছাড়া ওরা পা ফেলবে না।'

প্রবীরের ভুরু কুঁচকে এসেছিল। সেই পার্টি! যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্বাস টানছে, ছাত্র-ঐক্য টুকরো টুকরো। কৃষক সংগঠন তো গেছেই, ট্রেড ইউনিয়নও হয়তো যাবে। চমৎকার!

প্রবীর বলেছিল, 'তুমি তো এখন পুরোপুরি কলেজের দিদিমণি। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

'তা বলতে পারো। সম্পর্ক রাখবার সময় কোথায়? এত কাজ! তার ওপর থিসিসটাতেও হাত দিয়েছি।'

'এবার ডক্টরেটও হবে তা হলে? এমনিতেই তো কত দূরে ছাড়িয়ে গেছ,

এর পরে একেবারে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো—'

সাবিত্রী এবার দু হাতে জড়িয়ে ধরেছিল প্রবীরের গলা : 'খুব হয়েছে, আর চালাকি করতে হবে না।'

'ছি, ছি, এমন ভালো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, ভাবী ডাক্তার, শেষকালে একজন বি এ ফেল কেরানীকে—'

অমোঘ উপায়ে সাবিত্রী তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। কতকাল পরে! এই সময়, এই যন্ত্রণার কালে জীবনের এইসব সুর—এইসব মুহূর্তগুলোকে কীভাবে যে নির্বাসন দিতে হয়।

একটু পরে সাবিত্রী বলেছিল, 'তা হলে আমি গেলেই ভালো হবে বলছ।'

'আমার তাই মনে হয়। একালে কারো দল না থাকলে সে বরং সহনীয়, এমন কি ঝানু দক্ষিণপন্থীও অসহ্য নয়, কিন্তু এক লালকে দেখলেই আর এক লালের মাথায় আগুন ছোটে। তুমিই যাও।'

'কিন্তু রবিবারের আগে তো সময় পাব না।'

'রবিবারেই যেয়ো।'

রবিবারেই এসেছে সাবিত্রী। এ বাড়ি তার অচেনা নয়—কলেজে পড়বার সময় এসেছে কয়েকবার, সুজাতার সঙ্গে বিয়ের পরেও। আর এই বাড়িতেই প্রবীরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা—স্বরাজদার বন্ধু হিসেবে।

কতদিন আগে? আট-ন বছর নিশ্চয়। নীলু তখন আসছে। প্রবীর বি. এ. পড়ছে, সে বি. এস-সি। তার বছর তিনেকের সিনিয়র সুজাতা। দুবার বি. এ-তে ড্রপ করে স্বরাজের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের জোড় মিলিয়েছে।

হ্যাঁ, অন্তত আট বছর, কিছু বেশিই হবে। এর মধ্যে কত বদলে গেছে জায়গাটা। মানুষ বেড়েছে, বাড়ি বেড়েছে, দোকানপাট বেড়েছে, এত রিক্সা, এত বাসও বুঝি তখন ছিল না। কিন্তু বিশেষ বদলায়নি এই বাড়িটাই। সামনের একটুখানি ঘাসের জমিতে সেই রঙ্গন গাছটা, একদিকে নালার ধার ঘেঁষে তেমনি বুনো ওলের জঙ্গল।

সুজাতা বিকেলে গা ধুতে গিয়েছিল, তার মা এসে আদর করে বসালেন।

'তোমার মেসোমশাই কলে বেরিয়েছেন, ছেলেমেয়ে দুটো ব্যারাকপুরে গেছে তাদের পিসির কাছে বেড়াতে। বাড়িতে আমি আর মন্টুই আছি। বোসো—মন্টু এক্ষুণি আসবে।'

মনু সুজাতার ডাকনাম।

ভেতরের একটি ঘরে গিয়ে বসেছিল সাবিত্রী। ঘরটা চেনা। কুমারী জীবনে এই ঘরেই থাকত সুজাতা, সেলফে এখনো বোধ হয় তারই বইপত্র। দেওয়ালে লেনিন-স্তালিন-মার্কসের ছবি। রবীন্দ্রনাথও আছেন। একদিকে একটা ভাঙা মতন আলমারীর মাথায় একগাদা পুরনো কাগজপত্র বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না দেখেও বুঝতে পারা যায় ওগুলো রাজনৈতিক পত্রিকা আর বুকলেট। বোধ হয় ফিরে এসে এই ঘরেই আবার জায়গা নিয়েছে সুজাতা। এদের মধ্যে বসে আবার পুরনো দিনগুলোকে অনুভব করতে চায় সে।

বাইরে দিনের আলো বিষণ্ণ হয়ে আসছিল। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাড়িটার ওপর। পাখিদের ক্লান্ত ডাক। একটা উত্তপ্ত বেলা কেটে গেছে, এখন বেলাশেষের হাওয়ায় ঝোপ-জঙ্গল-মাটির সেই সোঁদা গন্ধ।

বেড-কভার ঢাকা বিছানাটার ওপর চুপ করে বসে রইল সাবিত্রী, সুজাতার মা বসেছেন সামনে একটা মোড়া টেনে। সাবিত্রী দেখল, বিকেলের বিমর্ষতায় মাসিমার মুখের ওপরেও ছায়া নেমেছে।

মাসীমা বললেন, 'কী করছ এখন ?'

'একটা কলেজে পড়াই।'

'হ্যাঁ, শুনেছি বটে। বিয়ে করবে না ?'

একবার একটু রাঙা হল সাবিত্রীর মুখ।

'এখনো ও নিয়ে ভাবিনি মাসীমা।'

ডাক্তারের স্ত্রী, ম্যাট্রিক পাস করা মাসীমার কপালে কয়েকটা রেখা পড়ল।

'কী জানি, হয়তো বিয়ে না করাই ভালো। তোমাদের আজকাল ছেলে-মেয়েদের আমরা চিনতে পারি না।'

সাবিত্রী মাসীমার দিকে তাকালো। কথাটার অর্থ সে বুঝেছে। দশ বছর স্বরাজের সঙ্গে ঘর করবার পরে, নীলুকে ফেলে কত সহজে চলে আসতে পেরেছে সুজাতা। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যে মাসীমা ম্যাট্রিক পাস করে বিদুষীর মহিমা পেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সুজাতাদের মনের চেহারা আঁচ করা শক্ত। সুজাতার বছর ছয়েকের বড় বোন সুলতা—সেও গ্র্যাজুয়েট—সে তো বিয়েই করল না, চাকরি করছে মুর্শিদাবাদের কোন স্কুলে। না—একালের মন তিনি বুঝতে পারবেন না।

মাসীমা ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন।

'মন্থু চলে এসেছে, জানো বোধ হয়।'

মাথা নামিয়ে সাবিত্রী বললে, 'জানি।'

'কিছু বুঝতে পারছি না। কী নিয়ে এ-রকম হল? আমি স্বরাজকে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। তাতে বললে, তুমি যদি ওদের চিঠি দাও তাহলে এক্ষুণি আমি এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে যাব, আর কোনদিন আমার খোঁজও পাবে না। জানো তুমি, কী হয়েছে?'

সাবিত্রী দ্বিধা করল। প্রবীরের মুখে যেটুকু শুনেছে, তা কি বলা যায়? বলা উচিত, স্বরাজদা আর কোনো রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, আর সুজাতা রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবনটাকে ভাবতে পারছে না? ওদের বিয়ের আসল মন্ত্রটাই ব্যর্থ হতে চলেছে?

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল সাবিত্রী। না—সে কিছুই জানে না।

'ওর বাবা তো রাতদিন তার ডাক্তারী নিয়ে আছে। বলে, কিছু না, একটু ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, দু'দিন পরেই সব মিটে যাবে। এ-রকম হয়।'

'আমারও তাই মনে হয় মাসীমা।'

মাসীমা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। তাহলে নীলুকে সঙ্গে করে আনল না কেন? কোনোদিন তো তাকে ফেলে আসে না। তা ছাড়া—'

নিঃশব্দ কৌতূহলে চেয়ে রইল সাবিত্রী।

'জানো—' মাসীমা শিউরে উঠলেন: 'জানো, ওর সিঁথিতে এবার সিঁদুর নেই।'

শিউরে উঠল সাবিত্রীও, অনেকদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে তাহলে। জোর করে হাসল একটু।

'ওরা ও-সব মানে না মাসীমা।'

'জানি। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বরাবর তো ও সিঁদুর পরত। আমার ভারী খারাপ লাগছে সাবিত্রী। ঠিক কথা, স্বরাজের সঙ্গে ওর বিয়েতে আমাদের মত ছিল না—মেয়েটা দুরন্ত, ছেলেও জেলখাটা। কিন্তু বিয়ের পরে স্বরাজের দায়িত্ব এসে গিয়েছিল, চাকরি-বাকরি করত, দেখেছি অপাত্র নয়। আর বেয়াই মশাই তো শিবতুল্য লোক। কেন যে এতদিন পরে—'

মাসীমা থেমে গেলেন। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ।

ডাকলেন, 'মন্থু!'

'আইতাছি মা কাপড় ছাইড়্যা।'

মাসীমা স্বর নামালেন: 'সেই অসুখের পর থেকে মেয়েটার শরীর বলে আর কিছু নেই। কিন্তু এখানে এসে আবার সেই পাগলামি আরম্ভ করেছে। পার্টি অফিসে যায়, আবার সব দলের ছেলেমেয়েরা আসে, তর্ক করে, চেঁচামেচি করে। অথচ আমরা ভেবেছিলুম, ও-সব ও ছেড়ে দিয়েছে।'

এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত তাহলে দ্বিগুণভাবে শুরু করে দিয়েছে সুজাতা!

'ওর বাবা বলছিল, শরীরে একেবারে হিমোগ্লোবিন নেই, যত্ন দরকার, বিশ্রাম দরকার। সে বিশ্রামের এই নমুনা? এ যে কী পাগলামি ওর আরম্ভ হয়েছে—'

এবার পায়ের শব্দ ঘরের দরজায়। তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন সুজাতার মা। তারপর গলার স্বর বদলে ডাকলেন, 'মনু—দ্যাখ—কেডা আসছে।'

'কে?'

দরজায় পা দিয়ে সুজাতা থমকালো। ঘরে আলো জ্বালবার সময় নয়, অথচ বাইরের ছায়া এসে সব আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে ধরছে। সেই ছায়াসঞ্চারে সুজাতা সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীকে চিনতে পারল না। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে, বার কয়েক চোখ কুঁচকে, তারপর খুশিতে আর বিস্ময়ে বলে উঠল: 'সাবিত্রী!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুই এতদিন পরে? আকাশ থেকে পড়লি নাকি?'

'আকাশ থেকে পড়ব কেন? বাসে চেপে সোজা চলে এসেছি।'

সুজাতা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সাবিত্রীকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, একটা শীতল শীর্ণ শরীরের ছোঁয়ায় সাবিত্রী যেন কেঁপে উঠল একবার।

'যাক—তাহলে মনে পড়েছে আমাকে!' উল্লসিত গলায় সুজাতা বললে, 'মা, হেনাদিরে এট্টু চা দিতে কও আমাগো।'

হেনাদি বাড়ির পুরনো কাজের লোক। মা মোড়া ছেড়ে উঠে বললেন, 'হেনা ক্যান, আম্মিই যাইত্যাছি। খালি চা দিমু নাকি মাইয়াটারে?'

মা বেরিয়ে গেলে সাবিত্রীর দিকে তাকালো সুজাতা। ঘরের আবছায়া আলোতেও সাবিত্রী টের পেলো, তাকে দেখে খুশি হওয়ার আনন্দটা হঠাৎ মিলিয়ে আসছে সুজাতার, তার চোয়াল-ওঠা মুখটা শক্ত হয়ে আসছে একটু একটু করে।

সতেরো

দু বছরের সিনিয়র হলেও মেয়েদের ভেতরে দূরত্বটা কম—স্বাভাবিক নিয়মেই কম। তারপরে একসঙ্গে ইউনিয়ন করা। এ ওকে নাম ধরেই ডাকে। সাবিত্রী আস্তে আস্তে বললে, 'তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস সুজাতা।'

ঘরে আলো জ্বলেনি, আলো জ্বলবার সময় হয়নি এখনো। সুজাতার ভাঙা গাল শক্ত হয়ে উঠছে, রেখা পড়ছে কপালের ওপর, ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভেতরেও তা দেখতে পাচ্ছিল সাবিত্রী।

এক টুকরো বিস্বাদ হাসি ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাংলা দেশের মেয়েদের মা হওয়ার দাম এমনি করেই দিতে হয়। সংসারও তার পাওনা ছেড়ে দেয় না।'

পাথরের মতো একটা ভার কিছুক্ষণ নেমে রইল দুজনের ভেতরে। বাইরে থেকে বেলাশেষের সোঁদা গন্ধ। মশার শব্দ উঠতে শুরু হয়েছে। কোথায় ডাহুক ডাকছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে চলতি লরীর গর্জন কানে এল। সুজাতার স্নান করা ঠাণ্ডা শরীরের চাইতেও গলার স্বরটা শীতল। মা হওয়ার সময় খুব ভুগতে হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু সেদিন সুজাতার চোখে অন্য আলো দেখেছিল সাবিত্রী: আর যত দূর মনে পড়ছে সংসারটাকে সেদিন তার খুব খারাপ লাগেনি। এখন সুজাতা নিষ্ঠুর। এখন অন্য রকম। ছায়া ছড়ানো ঘরে, মশার ডাক আর সোঁদা গন্ধের ভেতর হঠাৎ কেমন একটা অবসাদ বোধ করল সাবিত্রী। মনে হল, প্রবীর তাকে না পাঠালেই পারত, তার এখানে আসবার দরকার ছিল না। যেখানে রাগ, যেখানে উত্তেজনা, সেখানে কিছু বলবার থাকে, স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এলে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়, বিচার করা চলে। কিন্তু বিতৃষ্ণা আর অবসাদের ভার গলায় বেঁধে নিয়ে যে ডুবছে, তাকে তুলতে গেলে নিজেকেই বুঝি তলিয়ে যেতে হয়।

সাবিত্রী টের পেলো, খুব খারাপ দেখাচ্ছে এই চুপ করে বসে থাকাটা—এখানে এসে সে যেন আরো বেশি বিষণ্ণ করে তুলছে সুজাতাকে। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে কিছু একটা শুরু করতে চাইল।

'তোরই দোষ, শরীরের তো কোনো কেয়ার নিস্‌নে।'

সুজাতা চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

'নীলুকে তো দেখছি না, ওকে আনিসনি সঙ্গে করে?'

এবারও জবাব দিল না সুজাতা। উঠে পড়ল, সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলে ঘরের আলোটা। ফিরে এসে বসল নিজের জায়গাটিতে। বললে, 'সাবিত্রী

'কী বলছিস?'

'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সাবিত্রীর অস্বস্তি বোধ হল।

'কেন বলব না?'

'তোকে এখানে আসতে বলেছে কে? স্বরাজ?'

একেবারে তীক্ষ্ণ সোজা কণ্ঠস্বর। সাবিত্রীর মনে পড়ে গেল কলেজের কমন রুম। ঠিক এইরকম ধারালো স্পষ্ট গলায় প্রতিপক্ষের মুখের ওপর প্রশ্ন ছুঁড়ছে। কেমন কুঁকড়ে গেছে অরুন্ধতী রায়—হঠাৎ যেন তর্ক করতে ভুলে গেছে। সুজাতা তাকে জিজ্ঞেস করছে: তোর এত আপত্তি কেন? যেহেতু তোর বাবার কলকাতা শহরে সাতখানা বাড়ি আছে বলে?

সাবিত্রী একটা ঢোক গিলল,

'একথা বলছিস কেন? বছর তিনেকের ভেতরে স্বরাজদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'এমনিই এসেছিস?'

'কোনো ক্ষতি আছে?'

'না—ক্ষতি নেই—', সুজাতা হাসল: 'তোকে দেখলে এখনো ভালো লাগে। যদিও তুই পলিটিক্সে চিরকাল গা বাঁচিয়ে চলেছিস, তবু তোর মন ভালো। কিন্তু সাবিত্রী, এতদিন যখন মনে পড়ল না—তখন এই কো-ইন্সিডেন্সটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। তুই বরং বলতে পারতিস—বানিয়েও বলতে পারতিস—এদিকে একটু কাজ ছিল, যাওয়ার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে গেলুম।'

সাবিত্রীর গাল রাঙা হল একটু।

'তুই সিনিক হয়ে গেছিল সুজাতা।'

'সিনিক?' সুজাতা বললে, 'না—আমি মার্কসিস্ট। সিনিক হওয়ার মতো ডিজেনারেশান আমার ঘটেনি। তার স্পেসিমেন দেখতে চাস তো তোর স্বরাজদা তো আছেই।'

সাবিত্রী চুপ করে রইল। স্বাভাবিকভাবে কথা শুরু করা যাচ্ছে না। সব বিস্বাদ করে দিচ্ছে সুজাতা।

সুজাতা আবার বললে, 'ওই সিনিসিজমের কাছ থেকে বাঁচতে চাই বলেই চলে এসেছি। সাবিত্রী—প্রিটেনশানের কোনো মানে হয় না। সত্যি বল্ তো—কেন এসেছিস আজকে ?'

আর কোনো মানে হয় না আড়াল রাখবার। সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভালো।

সাবিত্রী সোজা সুজাতার মুখের দিকে তাকালো।

'সব আমি জানি না, কিছু শুনেছি। কিন্তু সুজাতা, যে নিজেকে মার্কসিস্ট বলে দাবি করে—এত সহজেই তার ধৈর্যচ্যুতি হওয়া উচিত নয়। স্বরাজদার কেন এ-সব ফ্রাস্ট্রেশান এসেছে ? অব্জেকটিভ কনডিশানগুলো তো ভেবে দেখবি তুই। এক সময় মনপ্রাণ দিয়ে কাজে নেমেছিল, পনেরো-ষোলো বছর পলিটিক্স্ করেছে। তারপর যদি দেখে কেবল কনফিউশান—'

'কে বলেছে কনফিউশান ?' কোটরের ভেতরে দপদপ করে জ্বলে উঠল সুজাতার চোখ : 'কনফিউশান কোথাও নেই। সে যদি কতগুলো পুরনো বিশ্বাসে স্থির হয়ে থাকে, তা হলে দুঃখ তাকে পেতেই হবে। কমিউনিজম স্ট্যাটিক নয়—সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রব্লেম আছে। দেশকাল বুঝে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। স্বরাজ যদি এই সহজ সত্যিটাকে বুঝতে না পারে, যদি বিশ বছর আগেকার পার্টি-নীতিই তার লাস্ট ওয়ার্ড বলে মনে হয়, তা হলে তার ফ্রাস্ট্রেশ্যানের জন্যে সে কারো সহানুভূতি পেতে পারে না।'

'কিন্তু নিজেদের ভেতর ভাঙাভাঙি—'

'কী করে ঠেকাবি ? প্রথম দিকে একটা ব্রড আউটলাইন থাকে, তখন অনেকে একসঙ্গে চলতে পারে। তারপর আন্দোলন যত এগোয়, কাজের চেহারা তত স্পষ্ট হয়, দায়িত্ব কঠিন হয়, অনেক বেশি স্যাক্রিফাইসের সময় আসে। তখনই ধরা পড়ে কে সাচ্চা, কে মেকি, কে বিপ্লবী, কে ভীরু। ভাঙন তখন আসবেই। লেনিনও মেন্শেভিক আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে চলা শুরু করেছিলেন, আর তারাই শেষে লেনিনকে খুন করবার জন্যে ক্ষেপে গিয়েছিল।'

অনেকদিন শীতল নির্বাণের পর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছে সুজাতা, অনেক বেশি জ্বলে উঠেছে। একটু চুপ করে রইল সাবিত্রী। এইভাবে তর্ক চালিয়ে গেলে সারারাতেও শেষ হবে না। সুজাতা দশ বছর আগে ফিরে গেছে আবার।

ঘরের ভেতরটা থমথম করতে লাগল।

তখন মাসিমা এলেন। সঙ্গে হেনাদি। পরোটা আর তরকারী করে এনেছেন, আর মিষ্টি।

সাবিত্রীর যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল।

'এত কেন মাসিমা?'

'বেশি নয়, খাও।'

'কিন্তু কেবল আমার জন্যে কেন? সুজাতা খাবে না?'

সুজাতা বললে, 'বিকেলে আমি কিছু খেতে পারি না। মানে সহ্য হয় না।'

'শরীরটাকে কী করেছিস বল্ তো?'

আবার সেই বিস্বাদ রেখা ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাঙালী মেয়ের সংসার—বুঝলি। তার পরম তীর্থ। এতদিন যখন একাই আছিস, তুই আর ওই বোকামোটা করিসনি সাবিত্রী।'

মাসিমার কপাল জুড়ে ছায়া নামল। একবার তাকালেন সাবিত্রীর দিকে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুজাতা বললে, 'হেনাদি, আমাগো চা দিলা না?'

'হ—আনি।'

সাবিত্রীর খিদে পেয়েছিল, অথচ খাওয়ার স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেছে এখন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, মাসিমার সামনে কথাটা অমন করে না বললেও পারতিস, কিন্তু ভালো লাগছিল না, নিঃশব্দে তরকারীর একটা আলু নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগল সে।

সুজাতা বললে, 'থেকে যা আজ। অনেকদিন পরে দেখা হল, প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।'

'গল্পের নমুনা তো দেখছি। আগুন হয়েই রয়েছিস তুই।'

সুজাতার কঠিন মুখটা এবারে কোমল হয়ে উঠল একটু।

'আলোচনা তো তুই—ই তুললি। স্বরাজের কথা টেনে আনিসনি, তা হলেই আর কোনো গোল থাকবে না।'

'তুই আর ফিরে যাবি না?'

'না।'

'কোনো উপায় নেই?'

'না—ইট্স্ এ সীলড্ চ্যাপটার।'

'কী করবি তা হলে ?'

'সারা জীবন যা করতে চেয়েছি। আমি আমার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি আবার। ওঁদের ছেলের বয়েস বেশি হয়নি, চাকরি করে—সুপাত্রই বলা যায়। ওঁরা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারবেন।'

বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সাবিত্রী।

'তুই এত নিষ্ঠুর হতে পারলি সুজাতা ?'

'অনেক তর্ক করেছি, কেঁদেছি, তিন বছর ধরে প্রাণপণে অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছি। পারা গেল না। স্বরাজের স্যানিটি বলে আর কিছু নেই। ও বাড়িটারই হাড়ে হাড়ে ঘুণ ধরেছে। তাই ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আনন্দ। তার প্রাণ আছে, তার জোর আছে। যদিও একটা অন্ধ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তবু ওদের ওই থিয়োরীটা আমি মানি যে জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না—তেমনি বিপ্লবে নেমেই সৈনিক হতে হয়। তোকে একটা সত্যি কথা বলি সাবিত্রী। ঠাকুরপো যদি ওইভাবে ভেঙে বেরিয়ে না যেত, তা হলে আমি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারতুম না—ধীরে ধীরে তোদের স্বরাজদার সঙ্গে চূড়ান্ত ডিফিটিজমের চিতায় সহমরণে যাত্রা করতুম।'

হেনাদি চা দিয়ে গেল।

একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে সুজাতা বললে, 'ও কি, হাত ধুচ্ছিস যে ? খেলি না তো কিছুই।'

'আর খিদে নেই।'

'মানে, আমার ওপর রাগ করে তুই খেলি না।'

'না—না—তা নয়।' সাবিত্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো: 'আর বেশিক্ষণ বসব না—এবার ফিরতে হবে কলকাতায়।'

'ফিরবি কেন ? থেকে যাবি আজকে।'

'না রে, অনেক কাজ আছে।'

সুজাতার মুখে শ্রান্ত একটা হাসির আভাস ফুটল: 'আমাকে খুব অসহ্য লাগছে—না ?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সাবিত্রী ম্লান গলায় বললে, 'সম্পূর্ণ ভালো লাগছে এ কথা বলতে পারলে খুশি হতুম। তুই নীলুর কথাটাও একবার ভেবে দেখলি না ?'

সুজাতার চোখ নেমে এল। একটা যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে—সেটা চোখ এড়িয়ে গেল না সাবিত্রীর। মাথা নামিয়ে সুজাতা বললে, 'ওকে নিয়ে এলে

আমার শ্বশুরের ওপর দারুণ নিষ্ঠুরতা হত একটা—ওই মানুষটি ভালো, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া ওঁদের ছেলে ওঁরা ইচ্ছে মতন মানুষ করুন—আমি দাবি করতে চাই না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা রূঢ় মন্তব্য এসে গেল সাবিত্রীর ঠোঁটে।

'নিজের পথও তোর নিষ্কণ্টক থাকে—এই তো?'

হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ নিবে গেল সুজাতা। বেদনায় কালো হয়ে গেল মুখ।

'তুইও তো কম নিষ্ঠুর হতে পারিস না সাবিত্রী।'

সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী অনুতাপ বোধ করল।

'আমি—আমি ঠিক ও-ভাবে কথাটা বলতে চাই না সুজাতা। মানে, আমি—'

'তোর দোষ নেই সাবিত্রী—' ক্লান্ত গলায় সুজাতা বললে, 'সকলে এই কথাটাই ভাববে। আমার কিরকম লাগছে তা আমিই জানি। কিন্তু বিপ্লবীকে দাম দিতে হয়।'

আবার ঘরের হাওয়াটা গুমোট হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এখন ঝিঁঝির ডাক। এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো ছায়া জমে আছে মনের ভারের মতো। দেওয়ালে লেনিনের ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

হেনাদি এসে বললে, 'দীপকবাবু আর মণ্টুবাবু আসছে।'

'বসতে কও হেনাদি—আমি আসতাছি।' হেনাদি চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে সুজাতা বললে, 'আমাদের পার্টির ছেলেরা। তুই একটু বস সাবিত্রী—আমি দু-মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়েই ফিরব।'

সাবিত্রী বললে, 'তুই বুঝি এখানে এখন হোল টাইম পার্টি ওয়ার্কার?'

'কী করব বল্? চারদিকে জমিদখলের লড়াই চলছে। এই মুভমেণ্টটা যদি একবার দেখতিস সাবিত্রী! চিরকালের এক্সপ্লয়টেড ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরের ভূমিহীন মানুষগুলোর একটুকরো জমির জন্যে কী আকুলতা! চীনের থিয়োরীই ঠিক—আমাদের আগে দরকার কৃষি-বিপ্লব। তুই একটু বস্—আমি দু মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়ে আসছি।'

'আমি উঠব। আমার দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না। বিস্তর বাস পাওয়া যাবে অনেক রাত পর্যন্ত। এই তো সন্ধ্যে—বস্—বস্।'

আসবার আগে মাসিমা এক কোণায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু বুঝলে? ও

কী করতে চায় ?'

'অনেকদিন বসে থেকে একঘেয়ে লাগছিল মাসীমা, একটু রাজনীতি করে দিন কয়েক ঝালিয়ে নিতে চায়। কিছু ভাববেন না, স্বরাজদাকে—নীলুকে ফেলে ও কি থাকতে পারে ? দুদিন পরেই ফিরে যাবে আবার।'

'আগে যা করত, করত—কিন্তু এখন ওই শরীর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে—'

'বেশিদিন চালাতে পারবে না মাসিমা, আপনিই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

নিরাশ স্বরে মাসিমা বললেন, 'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কপালের সিঁদুরটা মুছল কেন ?'

'ওটা খেয়াল মাসিমা, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আবার আসিস—' সুজাতা বলেছিল।

'আসব।'

কিন্তু বাস যখন দু পাশের ঘরবাড়ি, বাগান, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীর-বেগে ছুটচে, তখন জানলার ওপর হাওয়ার মধ্যে মাথাটা মেলে দিয়ে সাবিত্রী ভাবছিল। আসব ? কেন আসব ? এসে কী হবে ? প্রবীর তাকে মিথ্যেই পাঠিয়েছিল এখানে। যে সান্ত্বনা সে মাসিমাকে দিয়ে এল, নিজেই তা সে কি বিশ্বাস করে ?

বাসে কে একজন ট্র্যানজিস্টর রেডিও খুলেছে। সেই খবর। সেই তিক্ততার ইতিহাস।

শরিকী সংঘর্ষ। মুখ্যমন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদে উপমুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন—

হঠাৎ মনে হল, এই বাসটা—এই সব যাত্রীরা—এক অন্ধকার আর অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে—কোন্ পরিণামে গিয়ে যে পৌঁছোবে কেউ জানে না। দূরে দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সারি সারি আলোগুলো চোখে পড়ল, বোধ হল যেন একরাশ আলেয়া।

॥ আঠারো ॥

বুড়োটার যেন আর কাজকর্ম নেই—খ্যাঁকশেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করছে সমস্ত দিনটা। বাঁধানো দাঁত দিয়ে যে অমন করে খিঁচোনো যায়—আশ্চর্য! আসল দাঁতগুলো থাকলে কামড়েই দিত খুব সম্ভব।'

এই বুড়োটার জন্যেই মনে হয়—দুত্তোর, দিই এই কচুপোড়ার চাকরি ছেড়ে। কিন্তু তা হলে দিদি আর আস্ত রাখবে না। আর মণীশদা এলেই তো খুব গম্ভীরী চালে পিঠ-ফিট চাপড়ে দেয়, আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, 'একটু মন দিয়ে কাজকর্ম কোরো হে, আমার প্রেস্টিজের কথাটা মনে রেখো।'

তাও সয়ে পড়া যেত, কিন্তু আর কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যে মাইনেটা পাওয়া যাবে, সে-কথা ভোলা যাচ্ছে না। নিজের রোজগার করবার একটা আলাদা সুখ এখন নেশার মত জড়াচ্ছে তাকে। তা ছাড়া কিছু কিছু বাড়তি পয়সাও আছে। এই হপ্তা তিনেকের ভেতরেই অনেক কিছু শিখেছে সে—শিখে নিতে হয়েছে। খুঁটিনাটি কাজে পয়সা মেলে, জমি-বাড়ি বিক্রীর ব্যাপারে পার্টিকে রেজেস্ট্রি অফিসে নিয়ে গেলে দুটো-একটা টাকা হাতে আসে। এখন নিজের ওপর একটা মর্যাদার বোধ আসছে ক্রমশ। আমি কেবল রকবাজ নই—আরো দশজন বেকার মস্তানের সঙ্গে হুল্লোড়বাজী করে বেড়াই না—যে-সব কাজের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে দশটা-পাঁচটায় অফিসের বাস ধরে আমি তাদের একজন।

এ-সব ভালো, কিন্তু দুটো জিনিস। বুড়োটাই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আর তা ছাডা—তা ছাড়া কিছুতেই কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না। অথচ লেখাপড়াটা আরো একটু না শিখলে কিছুতেই স্বপ্নার কাছে—

সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠল একটা। মনে হল কার্তিকের সেই শক্ত হাতটা এখনো যেন ফাঁসির মতো আটকে আছে। হঠাৎ এই কাগজপত্র-ঠাসা গুমোট ঘরটা যেন দম আটকে আনল তার।

বুড়োর কাছে সে বললে, 'মাখনদা, আমি একটু আসছি বাইরে থেকে চা খেয়ে।'

মাখনদা খানিকটা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা থেকে টাইপ করছিল। ব্যস্ত ছিল, তাতেই দাঁত খিঁচোবার সময় পেলো না।

'সাহেব একটু পরেই আসবে হাইকোর্ট থেকে। অনেক কাজ আছে। আড্ডায় জমে যেয়ো না।'

'না না, আমার দেরি হবে না।'

গাড়ির সার, লোকের ভিড়। মাথার ওপর সূর্যের আগুন। গঙ্গা ছুঁয়ে—গড়ের মাঠ পেরিয়ে যে হাওয়া আসছে তাতে পর্যন্ত গা জ্বালা করতে থাকে। এখানে মামলা-মোকর্দমা, বিষয়-সম্পত্তি, স্বার্থ, আইনের কূট-কচাল। মানুষের মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে যায় এখানে এলে। যেন চারদিকে শিকার খুঁজে

ফিরছে সব, চোখগুলো ধূর্ততায় ধারালো—এদের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই মাণিকের, ফণীর, কার্তিকের।

আবার কার্তিক! টুলু চোখ-কান বন্ধ করে এগিয়ে চলল। মোড়েই খাবারের বড় দোকানটা।

সব সময়েই জমাট, এখনো বিস্তর লোক। তবু বসবার জায়গা মিলল।

'দুটো সিঙাড়া, চা এক কাপ।'

খিদে পেয়েছে। সেই নটায় বেরুতে হয় বাড়ি থেকে। বাসের ঝাঁকুনিতেই কখন পেটের ভাত হজম হয়ে যায়।

সিঙাড়া এল। চামচে করে ভেঙে খেতে খেতে অন্যমনস্ক হল টুলু।

কার্তিক জামার কলারটা শক্ত হাতে টেনে ধরেছিল। পকেট থেকে ছোরাই বের করতে যাচ্ছিল হয়তো, মাণিক যেমন বলেছিল, হয়তো তক্ষুণি পেট ফাঁসিয়ে দিত। শালা—খুনে।

অথচ, সব মিথ্যে। সে কারো নামে চুকলি খায়নি। ওরা কসবার কোথায় বসে বোমা বানায়, তাও সে জানত না। ইয়ার্কি ফাজলামো, এক-আধটু আজে-বাজে ফুর্তি, না-হয় হয়েই গেল কিছু হাতাহাতি। কিন্তু ও-সব বোমাবাজী তার পোষায় না—সে মাথাও ঘামায়নি কোনোদিন।

গৌরবাবু দারোগাকে মুচলেকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সে বলেনি। পুলিসের টিকিটিকি কোত্থেকে বোমার খবর পেলো, তারাই জানে। অথচ হারামীর বাচ্চাদের যত রাগ তারই ওপরে।

মাণিক নিশ্চয় কলকাতায় নেই। তার কানে মন্ত্র দিয়েছে ওই পলিটিক্সের দাদারা—কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান কাটতে গেছে সে। তাকে ভরসা দিয়েছে, এ-সব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে, আর ওয়াগন ভাঙতে হবে না, একেবারে সুখের স্বর্গে গিয়ে চড়বে। হবে ঘোড়ার ডিম! পলিটিক্সের দাদারা তো কেবল লাল কাপড় দুলিয়ে দেশসুদ্ধ ষাঁড় খেপিয়ে তাদের লড়াই দেখছে—আর নিজেরা বেশ মৌজের সঙ্গে হাততালি বাজাচ্ছে।

ধুস্! সিঙাড়া থেকে এক টুকরো পচা আলু মুখে পড়তে আরো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল টুলুর। মাণিকটা থাকলে তবু কার্তিকদের খানিক সামলে রাখতে পারত—তার মাথা একটু ঠাণ্ডা। এ ব্যাটারা তো খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে, আবার বাগে পেলে—

স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিলে এ যাত্রা। স্বপ্না!

টুলুর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। সন্ধ্যাটা তখন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কী সবুজ দেখাচ্ছিল সাদার্ন অ্যাভেন্যুর ঘাস-গুলো, কী হাওয়া দিয়েছিল, লেকের গাছগুলোতে কী ফুল ফুটেছিল, আর কতদিন পরে হাতটা চেপে ধরেছিল স্বপ্না। টুলুর মনে হচ্ছিল, আবার সে আগের দিন-গুলোর মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে—এতদিন যা কিছু ঘটেছে, সব স্বপ্নের ভেতর, হঠাৎ স্বপ্না বলে বসবে, 'টুলুদা, এই অঙ্কটা পারছি না, বুঝিয়ে দাও।' এমনি করে টুলু যখন আবার ভালো, আবার নতুন হয়ে যাচ্ছিল, তখন কাতিকরা এল। সমস্ত কালো হয়ে গেল, ঘুলিয়ে গেল সমস্ত।

স্বপ্না তাকে আর একবার বাঁচিয়ে দিলে। সেই স্কুলের টাকা ভেঙে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাওয়ার পর নিজের গলার হার যেমন খুলে দিয়েছিল সেদিন। কার্তিক ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু আর সে দাঁড়াতে পারল না। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে চল্‌তি বাস—এক লাফে উঠে পড়েছিল তাতে।

বাসটা কোন্ দিকে, কোথায় চলেছে সেটা বড় কথা নয়। কার্তিক তাকে ছোরা মারলেও হয়তো ভালো হত এর চাইতে। লজ্জায়, অপমানে সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন।

স্বপ্না বোধ হয় তাকে ডাকছিল। কিন্তু জোর করে পা-দানির ভিড় ঠেলে উঠে সে বোঝাই বাসের মধ্যে লুকিয়ে গেল। বাস কোথায় যাচ্ছে? সল্ট লেক? শিবপুর? যেখানে খুশি যাক।

দাঁতে দাঁত চাপল টুলু। নাঃ, বার বার এভাবে নীচু হওয়া যায় না। আমি ফিরেছি, আমি ফিরব। আমি চাকরি করব, আমি কোচিং ক্লাসে ভর্তি হব, আমি মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরব, তারপর গিয়ে দাঁড়াব স্বপ্নার কাছে। কার্তিক ব্যাটাচ্ছেলেরা কী করতে পারে আমার? এবার থেকে আমিও একটা ছোরাটোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে। যদি মারতেই আসে, অন্তত একটাকে সাবাড় করে তবেই মরব।

আসলে আমি দল ছেড়েছি, তাতেই রাগ। আমি ভদ্রলোক হতে চেষ্টা করছি, তাইতেই জ্বালা ধরেছে শালাদের।

সেদিন বাসটায় চেপে ভবানীপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সমস্ত রাত তার মাথায় আগুন জ্বলেছে। দাদার ওপরেও তখন বিশ্রী একটা রাগ হচ্ছিল তার। কী দরকার ছিল মুরারি হালদারকে বলে তাড়া-তাড়াতাড়ি তাকে ছাড়িয়ে আনবার? না হয় আরো দুটো দিন ঠেঙিয়ে,

কার্তিককে যেমন ছেড়েছে তেমনিভাবে তাকেও ছেড়ে দিত। মাঝখান থেকে—

'টুলু নাকি ?'

টুলু একটা ঝাঁকুনি খেলো ভাবনার ভেতরে। চেয়ে দেখল, কালীঘাটের ভেতরে ভেটকি মিত্তির। ওদের দলেই ঘুর-ঘুর করত, তারপর কিছুকাল বে-পাত্তা। একটা ভালো নাম তার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভেটকি নামেই সে বিখ্যাত। বড়লোকের ছেলে, চেহারাটা খুব চটকদার। জীবনে তার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—মেয়ে শিকার করা। এ পর্যন্ত যত মেয়েকে কিভাবে সে মজিয়েছে, রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করতেই আনন্দ। নোংরা কথা তাদের দলে সবাই বলে থাকে, কিন্তু বড়লোকের ছেলে বলেই তার মুখ সব চেয়ে বেশি খোলা—খিস্তি করবার সময় জিভ যেন তার লক লক করত, এমন কি ফণী পর্যন্ত বলে বসত : 'থাম্ মাইরি, আর তো বরদাস্ত হয় না—তুই আমাদের চরিত্তির খারাপ করে দিবি যে।'

'আহা, কী সব চরিত্তিরের ধ্বজা রে !'

এই ভেট্কি মিত্তিরের কিছুদিন পাত্তা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এখানে—এই হাইকোর্ট পাড়ায় ?

ভেটকি মিত্তির কেবল দোকানে ঢুকেছিল মনে হল, এসে বসে গেল টুলুর পাশে।

'তুই এখানে কী করছিস টুলু ?'

'চাকরি করি একটা। চা খেতে এসেছি। খাবি তুই ?'

'বলে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কী—অ্যাঁ ? তুই চাকরি করছিস ?'

'কেন, দোষ আছে ?'

'না—দোষ আর কী, ভালোই তো। তোর দাদার পাল্লায় পড়ে বুঝি ?'

'কেন, নিজে থেকে আমি একটা চাকরি নিতে পারি না ?'

'পারিস বই কি, আলবৎ পারিস। তা দল-টল কি ছেড়ে দিলি ?'

টুলু এড়িয়ে গেল কথাটা। বললে, 'তুই এ-পাড়ায় যে ?'

'ভবানীপুরের একটা বাড়ি বিক্রী করে দিতে হল মাইরি। দেনায় এমন জড়িয়ে গেলুম যে—' ভেটকি মিত্তিরের মুখটা ঝুলে পড়ল : 'খুব বাগিয়ে নিলে পাঞ্জাবী সর্দারজী—বুঝলি ? কম্‌সে কম দেড় লাখের বাড়ি—ছাড়তে হল পঞ্চাশে।'

'ছাড়লি কেন ?'

'আর বলিসনি। মানে একটা মেয়ে—'

'শুধু একটা বলছিস কেন? তুই তো মেয়েদের গায়ের এঁটুলি।'

ভেটকি মিত্তির মুখটাকে বিশ্রী করল: 'ধুৎ—মেয়েছেলেতে এবার অরুচি ধরে গেছে।'

'বটে!'

'আরে, এটা ইস্কুলের মেয়ে। দেখতে খাসা, বুঝেছিস? পটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম একটা খালি কুঠিতে। বরাতের ফের—হল পুলিস রেড। ধরে হাজতে। বলে নাবালিকা—পাঁচটি বচ্ছর ঘানি ঘোরাব তোমায়। সে ঝকমারি মেটাতে—বুঝলি, স্রেফ বিশটি হাজার টাকা। বাবা বন্দুক নিয়ে এল, বললে, যা চলে দেশের বাড়িতে, কলকাতায় আর একদিনও থাকবি তো ত্যাজ্যপুত্তুর করব। কী করা যায় বল্। তা মাস ছয়েক তো বনবাসে কাটল। তারপর বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে চোখ বুজলেন, ফিরে এসে সম্পত্তির প্রোবেট নিতে গিয়ে দেখি, কাকা তলায় তলায় সব ফাঁক করে রেখেছে। তার পরে ডেথ-ডিউটি, এটা-সেটা—যাঃ শালা, চোখে-কানে দেখি না। দিতে হল বাড়িটা বেচে। ও ব্যাটার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার নিতুম, শেষে বাড়িটা ওর পেটেই গেল। দূর—কিচ্ছু ভালো লাগছে না। নাঃ, মেয়েছেলের মধ্যে আমি আর নেই। মা বিয়ে করতে বলছে, তাই করে ফেলব একটা।'

'মেয়েছেলের মধ্যে নেই তো বিয়ে করবি কাকে? বেটাছেলেকে?'

'বউ—বউ। তাকে কি মেয়েমানুষ বলে?' চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেটকি মিত্তির বললে, 'তারপর আর খবরটবর কী? প্রমোদ ফণী কার্তিক—'

সামনের ঘড়িটায় তিনটে বাজল। চমকে উঠল টুলু। একটু পরেই হাই-কোর্ট থেকে ফিরে আসবেন ঘোষ সাহেব।

'সব ভালো।' টুলু দাঁড়িয়ে পড়ল: 'আমি চললুম। কাজ আছে। পরে দেখা হবে আবার।'

'আসিস না একদিন আমার বাড়িতে। এখন বাবা তো নেই, ভাবনারও কিছু নেই। আমিই মালিক। দরজায় নেমপ্লেট বসিয়েছি, বুঝলি? পি. মিটার, ল্যাণ্ডলর্ড। চলে আসিস।'

'দেখা যাবে।'

চা আর খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে টুলু নেমে পড়ল। সেই ভিড়, গাড়ির সার, সেই ধারালো রোদ, জ্বালা-ধরানো হাওয়া, মানুষের ধূর্ত হিসেবী

চোখ। মনটাকে আরও বিশ্রী করে দিয়েছে ভেটকি মিত্তির। জেল খাটলেই ভালো হত ওর।

যেতে যেতে, ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রায় চোখ বুজে টুলু নিজেকে বলতে লাগল: আমি বেঁচেছি, এদের খপ্পর থেকে আমি বেঁচেছি। কিছুই বলা যায় না —হয়তো ওর সঙ্গী হয়ে আমিও খালি কুঠিতে যেতুম—ও বেরিয়ে আসত টাকার জোরে আর আমাকে জেল খাটতে হত। আমি বেঁচেছি, আমি বাঁচব। কাতিকদের ভয় করি না, দরকার হলে আমিও একটা ছোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে।

স্বপ্নার কাছে আমি ফিরে যাব মাথা উঁচু করে, বুক টান করে। যেতে যেতে মনে হল, সেই সন্ধ্যাটার মতো স্বপ্না তার হাত ধরে আছে।

অফিসে মজুমদার সাহেব ঘেরাও। সেন আর চ্যাটার্জী—আরো দুজন কর্তাব্যক্তি—গোলমাল শুনে ব্যাপারটা জানতে এসেছিলেন, তাঁরাও আটকে পড়েছেন জালের ভেতর। এখন খাবি-খাওয়া মাছের মতন ছট্‌ফট করছেন তাঁরা।

পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরমে দরদর করে ঘামছেন সুখী ভদ্রলোকেরা। আর তাঁদের ঘিরে উঠছে শ্লোগানের পর শ্লোগান।

'দালালেরা ধ্বংস হোক।'

'মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ!'

মজুমদার সাহেব যে খুব চমৎকার লোক তা নন। একসময়ে সিংহবিক্রমে চলতেন, এখন জমানা বদলের ফলে মেষশাবক। যুক্তফ্রন্টের টলমল অবস্থা দেখে উৎসাহে একটু নড়ে বসেছিলেন, একটা চার্জ-শীট দিয়ে ফেলেছিলেন একজনকে, তার ফলে আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

একবার ক্ষীণ গলায় বলতে চাইলেন, 'দেখুন উইদাউট নোটিশ, দিনের পর দিন কামাই করলে—'

'শাট আপ্‌।'

'আপনারা যে-রকম গবর্নমেণ্ট চেয়েছিলেন, তাই তো হয়েছে। এখন আপনারা সবাই সিন্‌সিয়ারলি—'

'শাট আপ—শাট আপ। ব্যাটা শয়তান, ধর্মকথা শোনাতে এসেছে প্যাঁচে পড়ে।'

তারপর চলল গালাগালি। ওর স্ত্রীর অচিরে বৈধব্য ঘটবে—এই কথাগুলো জানানো হতে লাগল বেশ পরিষ্কার স্থূল ভাষায়। দু-একটি অকথ্যও শোনা যাচ্ছিল ফাঁকে ফাঁকে। সেন আর চ্যাটার্জীও বাদ যাচ্ছিলেন না।

আসলে অনেক দিনের জ্বালা। মজুমদারের ওপর রাগ থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক। ঘেরাও করতেও কিছুমাত্র বাধা নেই। কিন্তু এইসব কুৎসিত গালাগাল? আলো-পাখা সব বন্ধ করে দিয়ে নিগ্রহ? এও কি ঘেরাওয়ের নীতি? তা হলে ঘেরাওয়ের দরকার কী—টেনে এনে প্রচণ্ড প্রহার করলেই তো চুকে যায়।

প্রবীর দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। ঘেরাও হোক, কিন্তু এইটে ঠিক পছন্দ হয় না তার। বামপন্থী রাজনীতির পদ্ধতিটা কী? নীতি, না নৃশংসতা? সময়-বিশেষে নীতিও নিশ্চয় নির্মম হতে পারে, কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষে আন্দোলনকে উদ্দামতায় পৌঁছে দিলে—

কে জানে, ঠিক বোঝা যায় না। আর ইউনিয়ন তো প্রবীরদের হাতে নয়, তারা মাইনরিটি। তাদের দালাল বলা হয়ে থাকে।

তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কথা ছিল, যুক্তফ্রন্টের আমলে আমরা প্রমাণ করব, আগের দিন আর নেই—এখন দেশ আমাদের, দায়িত্ব আমাদের হাতে। আমাদের সরকারকে সব দিক থেকে দুর্নীতিমুক্ত করব আমরা—কাজ করব, পরিশ্রম করব, প্রশাসনের পথ মসৃণ করে তুলব। তবু কেন আমরা কাজে ঢিলে দিই, কামাই করি, মজুমদার সাহেবদের হাতে সুযোগ এনে দিই, আমরাই বিরোধী পক্ষের হাতিয়ার হয়ে উঠি?

পাশে এসে দাঁড়ালো মুকুল প্রামাণিক।

চলো ব্যানার্জী—কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে? এদের রেভোলিউশনের দৌড় তো দেখছ।'

প্রবীর আশ্চর্য হল। মুকুল এই পক্ষেরই একজন উৎসাহী সৈনিক বলে এতদিন ধারণা ছিল তার।

'তুমি হঠাৎ—'

মুকুল বললে, 'কিস্সু হবে না। আয়্যাম ডিজইল্যুশ্যানড। নকশালবাড়ির লাল আগুন ছাড়া কোনো পথ নেই, কোনো পথই নেই। ও এক-আধটা মজুমদারকে টর্চার করে কী হবে—ঝাড়ে-মূলে সব জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। চলো আমার সঙ্গে—'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'চলোই না।'

প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে চলল। একদিক থেকে নিষ্কৃতি। পেছনের ওই প্রবল চিৎকার তার খুব ভালো লাগছিল না—অন্তত আজকের মানসিকতায় তো নয়ই।

করিডোরে দুটি ছেলে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল : 'আমাদের যুক্তফ্রন্ট—'

মুকুল প্রামাণিক সংক্ষেপে বললে, 'এ মেয়ারস্ জেস্ট্।'

॥ উনিশ ॥

নীলাঞ্জনের ঘর থেকে পড়বার শব্দ আসছে। গুনগুন করে কিছু একটা মুখস্থ করছে মনে হয়।

বারান্দায় নিজের ইজি-চেয়ারটায় বসে শিবপ্রসাদ তাকিয়ে ছিলেন সামনের গন্ধরাজ গাছটার দিকে। সকালের রোদ ঝিকমিক করছে ঘন সবুজ পাতাগুলির ওপর, খুশি হয়ে একটা টুনটুনি নাচানাচি করছে সেখানে। শিবপ্রসাদ জানেন, এবারেও কুঁড়িগুলো থাকবে না, সেই ছোট ছোট ছেলেরা আবার আসবে, জীবনে কোথাও যাদের রঙ নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই—তারা জন্মগত বিদ্বেষে ভালো করে ফোটবার আগেই কুঁড়িগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে, তারপর রাস্তায় কিংবা নর্দমার জলে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে তাদের।

কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পথের পাশে দু-তিনটি প্রায়-শিশুর খেলা দেখেছিলেন তিনি। তাদের এক-আধটা কথার টুকরো কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল একবার।

একজন বাখারির একটা ছোট্ট ফালি দেখিয়ে বলছিল : 'আমি মাস্তান, বুঝলি আমি মাস্তান। বেশি চালাকি করবি তো ছুরি মেরে দেব।'

আর একজন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে জবাব দিচ্ছিল : 'আমার হাতে বম্ দেখছিস না ? একবার দুম করে ঝেড়ে দিই তো—'

কাছেই একটি ছোট্ট মেয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গি করছিল একটা। ঘাগরা তার ছিল না, ছেঁড়া ফ্রকের একটা কোণা ধরে সে মহলা দিচ্ছিল, 'তুমসে প্যার হো গয়া'-গোছের একটি গানের কলি শোনা যাচ্ছিল তার মুখে।

এই এদের খেলা—বাংলা দেশের এইসব ছেলেমেয়ের খেলা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-

খাদ্যহীন, নৈরাজ্যের শিকার এই শিশুরা কোন্ বাংলা দেশ, কোন্ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনা করছে?

সারা জীবনের আদর্শ, দেশসেবা, স্কুলের মাস্টারী। নিজে কী পেলেন, কী দিলেন দেশকে? নীলু হয়তো বস্তির এইসব ছেলেমেয়েদের চেয়ে একধাপ ওপরে বাস করছে, কিন্তু আজ সকালে, এই সুন্দর রোদ আর হাওয়ায়, তাঁর ছোট্ট বাগানটির এই স্নিগ্ধতার মধ্যে, ওই টুনটুনিটার খুশির ভেতরে—শিবপ্রসাদ সুখী হতে পারছিলেন না। নীলু বস্তির ছেলেদের চাইতে একটু ওপরে। কিন্তু কত দিন? হাওয়ায় যেখানে মড়ক ছড়ায়, সেখানে কতক্ষণ নীলুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তিনি! আজ যারা অন্ধ-হিংসায় গন্ধরাজের পাপড়ি ছিঁড়ছে, সেইখানেই থেমে দাঁড়াবে তারা? ইতিহাসের প্রতিশোধ নেই একটা?

অথচ সেই রাত। সেই পনেরোই অগস্ট। স্বাধীনতা।

স্বা-ধী ন-তা!

সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে শিবপ্রসাদের উৎসাহ হয় না। হয়তো সুখ আর সমৃদ্ধির মাত্রা দিনের পর দিন উছলে উঠছে দিকে দিকে। কিন্তু বাংলা দেশকে এতবড বঞ্চনা কেউ করেনি—কখনো না।

স্বপ্না এসে বলল, 'বাবা, তোমার চা।'

পাশের ছোট টিপয়টি টেনে চা রাখল।

শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। বিষণ্ণ, শান্ত চেহারা। দুই ছেলে, বড় ছেলের বউ, এ বাড়ির এদের সকলের চেয়ে মেয়েটি আলাদা। কোনোদিন রাজনীতির কথা ভাবেনি, মা-বাবাকে ভালোবেসেছে, লেখাপড়া করতে চেয়েছে, বি.এ'টা পাস করে চাকরি জুটিয়েছে একটা, এখন প্রাইভেটে এম এ. দেবার চেষ্টা করছে। স্ত্রী তো আনন্দ চলে যাওয়ার পরেই ভেঙে পড়েছিলেন, তারপর সুজাতা চলে যেতে এখন আদৌ স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন কি না বোঝা যায় না। অকারণে চিৎকার করে ওঠেন, অহেতুক ধৈর্য হারান, একা-একাই বসে কাঁদেন কখনো কখনো। স্বরাজের সঙ্গে কথা বলতেই ভরসা হয় না তাঁর। শুধু এই মেয়েটিই এর ভেতরে স্থির হয়ে আছে যথাসাধ্য, শুধু ওর কাছেই শিবপ্রসাদ যেন মনের আশ্রয় পান খানিকটা।

স্বপ্না বললে, 'খাবার আনি?'

'এখন না। একটু পরে।'

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ তাকে ডাকলেন।

'বস্। একটা কথা আছে।'

স্বপ্না একটা মোড়া নিয়ে বসে গেল বাবার পাশে।

'পড়াশুনা কেমন চল্‌তাছে?'

'একরকম। তবে খালি নোট পইড়্যা কিছু হয় না।' স্বপ্না নিশ্বাস ফেলল: 'দুই-একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস অ্যাটেণ্ড করলে ভালো হইত। কিন্তু যামু কখন? ইস্কুলে এত কাজের প্রেশার।'

'ইংরাজি হইলে আমি অল্প-স্বল্প হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু ফিলসফি তো পড়ছি পাসকোর্সে, কিছুই জানি না।'

স্বপ্না বললে, 'দেখি, কী করন যায়। পুজোর পরে না হয় দুই-চাইর দিন ছুটি নিয়া ইউনিভার্সিটিতে যামু।'

একটু চুপ। তারপর একবারের জন্যে কান খাড়া করলেন শিবপ্রসাদ। তেমনি গুনগুন করে পড়ে যাচ্ছে নীলু।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলুরে কেমন বোঝতাছস্, অখন?'

স্বপ্নার মুখে-চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাত্তিরে আর কান্দে?'

'না।' আবার নিঃশ্বাস ফেলল স্বপ্না: 'আমারে জড়াইয়া ধইর‍্যা রাখে সমস্ত রাত্তির। এট্টু পাশ ফিরনেরও জো নাই। কয়, পিসি, কই যাও?'

ভয়। মা চলে গেছে, পাছে পিসিও চলে যায় সেই ভয়। শিবপ্রসাদ একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'অর মায় আর আইবো না—না?'

'আইবো ঠিকই। কদ্দিন পোলাডারে ফালাইয়া থাকতে পারবো, বাবা?'

সান্ত্বনা। শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করে না, স্বপ্নাও কি করে?

'কিছুই কওন যায় না—' স্বগত-ভাষণের মতো শিবপ্রসাদ বললেন, 'অখন সমস্তই অন্য রকম হইয়া গেছে। আমাদের সময়ও ঘরের বৌ-ঝিরা যে পলিটিক্‌স্ করত না, তা তো না। তখন ইংরাজ আছিল সকলের শত্রু। দল আছিল ঠিকই, কিন্তু অ্যাকটা লক্ষ্যও মোটামুটি সকলের আছিল। অখন অনেক লক্ষ্য হইয়া গেছে—অখন স্বামী-স্ত্রীর পথও আলাদা হইয়া গেছে, অখন ঘরে ঘরে আমরা এ ওর শত্রু হইয়া উঠছি।

স্বপ্না আনন্দ নয়, স্বরাজও নয়, এ-সব চিন্তার উত্তর তার জানা নেই।

আবার নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আবার সান্ত্বনার জেরটাই টেনে আনল স্বপ্না।

'ক্যান্ এই সমস্ত ভাব্তাছ বাবা? বৌদি আসবো—ঠিক ফিরা আসবো।'

'হুঁ।'

কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল, শিবপ্রাসাদ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। আকাশটা নিবিড নীল। কয়েকটা নারকেল গাছ দুলছে হাওয়ায় ডানা-মেলা নিশ্চিন্ত চিলের বিন্দু। কিছুই দরকার ছিল না, কিছুই না সারাজীবনের টানা পরিশ্রম, দেশের কাজ, হেড মাস্টারী—সব কিছু মিটিয়ে, এখন দুই যোগ্য ছেলের হাতে সংসারের দায় তুলে দিয়ে আকাশের নীলে দু চোখ ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু—

কিন্তু স্বাধীনতা। নইলে কেন এমন শূন্যতায় তলাবে স্বরাজ, কেন চলে যাবে সুজাতা, কেন এমন করে ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আনন্দ?

পনেরোই অগস্টের ঋণ শোধ করতে হবে। অনেক—অনেক ঋণ।

সুজাতার কথায় আর একটা জিনিস মনে এল শিবপ্রসাদের। বিভ্রান্ত হয়ে প্রবীরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। আবার ফিরে চাইলেন স্বপ্নার দিকে।

'এর মধ্যে প্রবীব আসছিল নাকি রে?'

'ভুলুদা? কই, না তো।'

'আমি তো বাইর-টাইর হইয়া যাই, আসে নাই ভুলু?'

'না, দেখি নাই।'

'ও।'

তার মানে কোনো খবর নেই। কিছুই করতে পারেনি। নিজেকে ভারী ছোট মনে হল। ও-ভাবে প্রবীরের কাছে সেদিন ছুটে না গেলেই ভালো করতেন, কিন্তু নীলুর ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

'প্রবীরদার কথা কইতাছ ক্যান?'

'এম্‌নেই। এ্যাকদিন গেছিলাম অদের ওইদিক। কইছিল, আইবো।'

'আসে নাই বাবা।'

প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়া ভালো। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছিল অতিরিক্ত।

'বাবা, তোমার অদ্ধেক চা জুইড়য়া জল হইয়া গেল।'

'ভুইল্যা গেছিলাম।'

'আর এক কাপ কইয়্যা আনি?'

''অখন থাউক।' শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর যা হওয়ার হোক, এই মেয়েটাকে এখান থেকে মুক্তি দিলে ভালো হয়। এ সংসার থেকে অন্তত একজন নিষ্কৃতি পাক, বেঁচে যাক সে।

'এ্যাট্টা কথা কই। রাগ করবি না মা?'

'কী কইতে আছো বাবা? রাগ করুম ক্যান?' স্বপ্না চকিত হল।

'বসন্ত চাটুজ্যার মাইজ্যা পোলা এম.এস-সি. পাস কইর‍্যা কোন্ ফার্মে কেমিস্ট হইছে। পোলাডা ভালো। তর লগে মানাইবো। পাকে-প্রকারে চাটুজ্যা কাইল কথাডা কইতাছিল। আমি গা করি নাই, অখন ভাবতাছি—'

সাপের ছোবল পড়ার মতো চমকে উঠল স্বপ্না। শিবপ্রসাদ থেমে গেলেন।

'না বাবা, ওই সবে কাম নাই অখন।'

'কিন্তু বিয়া তো তর একটা দেওন লাগবো মা।'

'অখন থাউক বাবা।' স্বপ্নার মুখে রক্তের কণা জমতে লাগল, মাটিতে চোখ নামালো সে: 'এই সব নিয়া তুমি অখন কিচ্ছু ভাববা না। এই সমস্ত অশান্তির মধ্যে—'

'অশান্তি আছে, অশান্তি থাকবো। কিন্তু তর জীবনডা তো আমারে দেখতে হইবো।'

'আমার বিয়ায় কাম নাই বাবা। আমি খুব ভালোই আছি।'

সেই টুলু? শিবপ্রসাদের মাথার ভেতর দিয়ে যেন খানিকটা যন্ত্রণা ছুটে গেল: এখনো কি তার কথা ভুলতে পারেনি মেয়েটা? এতদিন বাদে? এত কাণ্ডের পরেও? অথচ শুধু শিবপ্রসাদ কেন, এ বাড়ির প্রত্যেকে জানে, টুলু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, কতগুলো শয়তান ছেলের দলে ভিড়েছে, তার বদনামে কান পাতা যায় না, তার বাবার যাকে নিয়ে এত আশা ছিল, চূড়ান্ত অধঃপাতে নেমে গেছে সে।

স্বপ্না এখনো তার কথা ভাবে? এখনো?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু আর একটা উত্তর এল স্বপ্নার কাছ থেকে।

'অখন ওই সব ভাইবো না বাবা। তাইলে মা আর বাচবো না, নীলু মইর‍্যা যাইবো।'

নীলু! তার মা-ই তার কথা ভাবল না, অথচ—। শিবপ্রসাদ কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ভেতর থেকে চটির আওয়াজ এগিয়ে এল। স্বরাজ।

বিনা ভূমিকায় স্বরাজ বললে, 'বাবা, তোমারে এট্টা কথা কই নাই।'

শুকনো, নীরস গলার স্বর। বাপ আর মেয়ের চোখ চকিতে ঘুরে গেল তার দিকে।

স্বরাজ দরজার একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শক্ত হয়ে। তেমনি নীরস ভঙ্গিতে বললে, 'আমারে ট্র্যান্সফার করছে কইলকাতা থিক্যা।'

'ট্র্যান্সফার!' একসঙ্গেই এই দুজনের চমক লাগল।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'তর পোস্ট তো ট্র্যান্সফারেবল্ না।'

'অপ্শ্যন দেওন যায়।'

'তুই ইচ্ছা কইরা ট্র্যান্সফার নিতে আছস?'

স্বরাজ বললে, 'হ। কইলকাতায় আর থাকন যায় না। আর কিছুদিন এইখানে থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হইয়া যাইবো।'

বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'যাইতাছস্ কই?'

'কানপুরে।'

'কানপুরে?'

স্বরাজ খানিকটা তিক্ত হাসি হাসল: 'যাইতে পরে সকলেরই হইবো। এইখানে যা চলতাছে, অরা হেড্ আফিসও আর রাখব না—ফ্যাক্টরী তিনটারও ক্লোজার হইবো। আগে-ভাগে যাওনই ভালো।'

চমৎকার সম্ভাবনা। আনন্দ নেই, স্বরাজও চলল। তার মানে এখন সংসারের সব ভার বইবেন শিবপ্রসাদ, হাট-বাজার করবেন, অসুস্থ-উন্মাদপ্রায় স্ত্রীর মনোযন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে জ্বলতে থাকবেন। রিটায়ার করবার পরে, নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপূর্ব অবসর!

স্বপ্নার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'আর মায়-বাবারে দেখবো কে?'

'ছুটিছাটায় তো আমুমই। আর তুই তো আছসই।'

একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল স্বপ্নার: অপদার্থ, স্বার্থপর, কাওয়ার্ড। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে, ধ্যানী বুদ্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ, আর স্বপ্নার চোখ জ্বলতে লাগল।

স্বপ্না বললে, 'আর নীলুর কী হইবো? তার দায় কে নিবো?'

স্বরাজের চোখেও এবার ছুরির শাণ পড়ল: 'ভয় নাই, সে আমি ঠিক কইর্যা

ক্যালাইছি। তার জন্ম তোমাদের অসুবিধায় পড়তে হইবো না। আমি তারে লইয়া যামু।'

শিবপ্রসাদ বলে ফেললেন: 'তুই।'

'হ। আমার পোলার রেসপনসিবিলিটি আমারেই তো নিতে হইবো বাবা। তোমারে ক্যান ট্যাক্স্ করুম?'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্বপ্না বললে, 'তুমি তারে নিয়া রাখবা কই?'

'যে কোনো একটা বোর্ডিংয়ে।'

স্বপ্না এবারে প্রায় চিৎকার করে উঠল: 'তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হইয়া গেছে বড়দা। ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবো বোর্ডিংয়ে?'

'পারবো।' স্বরাজ ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'অর থিক্যা ছোট বাচ্চাও থাকে। কষ্ট হইবো প্রথম প্রথম, তারপর ঠিক হইয়া যাবো। এই বাংলা দেশে অরে আমি রাখুম না। এইখানে সব ভিশিয়েটেড হইয়া গেছে।'

স্বপ্না আবার তীক্ষ্ণস্বরে কী বলতে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ বাধা দিলেন। আশ্চর্য শান্তস্বরে বললেন, 'সেই ভালো। আমার পোলা তুইডারে আমি তো মানুষ করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে। লইয়া যা নীলুরে।'

স্বপ্না বললে, 'বাবা!'

শিবপ্রসাদ আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজলেন। আবার বললেন, 'হ, তুই-ই লইয়া যা।'

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল নীলু।

॥ কুড়ি ॥

টানতে টানতে প্রায় নিয়ে চলল মুকুল।

'ঘেরাওয়ের ফার্স—যুক্তফ্রন্ট! আর কেন হে ব্যানার্জি! এবার চলো এখান থেকে।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার কী—রাস্তায়। এর মধ্যেও অফিস করবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না—অফিস আর কোথায়।'

প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে চলা খানিকক্ষণ। ড্যালহাউসি পেরিয়ে, এস্প্ল্যানেডের দিকে। রোদ জ্বলছে মাথার ওপর। কিন্তু ধার নেই এখন। হাল্কা-হাল্কা মেঘ ছায়া ফেলছে তার ওপর। মধ্যে মধ্যে যেন পথ ভুলেই আসছে উত্তরের হাওয়া, শীতের ছোঁয়াচ নেই তাতে—বাংলা দেশের অনিশ্চিত রাজনীতির ওপর বিষণ্ণ বসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে মুকুল বললে, 'ভাবছি, চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কোনো একটা স্টেট লটারীর টাকা পেয়ে গেছ নাকি?'

মুকুলের গলার স্বর গাঢ় হল: 'না, ঠাট্টা নয়। চাকরি ছাড়ব।'

'ব্যবসা করবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'ব্যানার্জি, বী সিরীয়স। এখন আর এভাবে বসে থাকবার সময় নেই। নাউ টু অ্যাকশন। বিপ্লব এসে গেছে—আর দেরি করা চলবে না।'

প্রবীর আবার নতুন করে সজাগ হল।

'মুকুল, তুমি তা হলে—'

'হ্যাঁ, তোমরা যাকে বলো নক্‌শালাইট।'

'কিন্তু দুদিন আগে পর্যন্ত সি-পি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুকুল বললে, 'আই-এম-এল এখন।'

'হঠাৎ এই দল-বদল কেন?'

মুকুল বললে, 'সহ্য করা যাচ্ছে না বলে। আসলে দেখতে পাচ্ছি সবটাই এক চক্রাবর্ত—একটা ভিশস্ সার্কল। একটা রুলিং পার্টি যাবে, আর একটা আসবে। আসলে সব ব্যুরোক্র্যাসির এক চেহারা। কোনটা চড়া লাল, কোনটা ফিকে লাল। সব এক সুরে বাঁধা—রঙ যেমনই হোক, চামড়ার তলায় সব সমান। নইলে ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজ করেই প্রোগ্রেসিভ হলেন তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার আর জগজীবন রাম? একেবারে বিপ্লবী?' মুকুলের ঠোঁট বিদ্রূপের হাসিতে ভরে গেল: 'তোমাদের অভিনন্দনের ঘটা দেখে মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটে একেবারে ডিক্টেটরশীপ অব প্রোলেট্যারিয়্যাট চালু হয়ে গেল!'

তর্ক করা যেত, বলবার ছিল। কিন্তু আজ তিন মাস ধরে তর্ক করে করে এখন ক্লান্তি এসে গেছে। এখন সময়টাই আলাদা। তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে কাউকে কিছুই আর বোঝাবার নেই। সহিষ্ণুতা থাকলেই নিজের কথা অন্যকে বোঝানো চলে, শোনবার উৎসাহ থাকলেই বলা যায়। কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শুনতে চায় না, অন্যের যুক্তি শোনবার মতো ধৈর্য কারো নেই। এখন

প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাসের একটা দুর্ভেদ্য বৃত্তে স্থির হয়েছে—সব শোনা, সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে সকলের। এখন রাজনীতি ধর্মের গোঁড়ামিকেও ছাড়িয়ে গেছে, যে তর্ক করে সে অবাঞ্ছিত, শুধু বিশ্বাসের পায়ে চোখ বুজে বসে থাকা ছাড়া কিছুই আর করবার নেই।

এই জন্যই প্রবীর তর্ক করল না। একটা কৌতূহল জাগল। এই পরম বিশ্বাস, একান্ত আনুগত্যের যুগেও মুকুল হঠাৎ দল বদল করল কেন? কলেজের ছাত্রদের না হয় বোঝা যায়, কিন্তু মুকুল তো তা নয়—সেই ছাত্র ফেডারেশনের সময় থেকে তো সে রাজনীতি করে আসছে।

'খুব অবাক লাগছে তোমার এই পরিবর্তন দেখে।'

মুকুল পকেট থেকে রেড বুক বের করল একটা।

'পড়েছ এইটে?'

'পড়েছি বই কি।' প্রবীর হাসল: 'এই আন্দোলনটাকে আমি ঠিক মানতে পারি না, তাই বলে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী-সংগ্রহ পড়ব না? তাঁর কথাগুলো তো কোনো দলের একচেটে নয়। বরং যে-কোনো বিপ্লবীর এ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। আমাদের আপত্তিটা প্রয়োগের প্রশ্নে।'

মুকুল বইটা আবার পকেটে পুরে ফেলল: 'ব্যানার্জি, ওই প্রয়োগের প্রশ্নটাই আসল। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার রাস্তাই ওইটে। এখন সময় নয়, দেশকাল অনুকূল নেই, আমাদের প্রোব্লেমের চেহারা আলাদা—এসব কথা বলবার একটাই অর্থ আছে। আমাদের পেটিবুর্জোয়া লীডারশীপ আগুনের আঁচ বাঁচিয়ে বিপ্লব করতেই জানে, তাই তেলেঙ্গানা থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারল না, নিতে পারল না হাজং বিদ্রোহীদের কাছ থেকে, কলকাতায় এতগুলো আন্দোলনে এত রক্ত ঝরতে দেখে। মানে, বিপ্লবের আঁচে আগুন পোয়াতে চাই, কিন্তু নিজের ঘরের চালাটা ঠিক রাখতে হবে। এখন তো গদির সুখ মিলেছে—শোধনবাদ নয়া শোধনবাদ বিপ্লব আনবে এ স্বপ্ন যারা দেখছে, তাদের ঘুম ভাঙতে আর বেশি দেরি হবে না। আমরা অপেক্ষা করব না, কারণ লড়াই শুরু না করলে লড়াই শেষ করা যায় না।'

প্রবীর একটু চুপ করে থাকল। তার আনন্দকে মনে পড়ছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। কোথায় আছে এখন আনন্দ, কিভাবে আছে? তার রিভলবারটা পড়ে রয়েছে প্রবীরের ড্রয়ারের ভেতর। কবে আসবে ফিরিয়ে নিতে?

মুকুল বললে, 'ভাবছ কী ?'

'না,—বিশেষ কিছু না।'

'কাম্ উইথ্ আস।'

প্রবীর বিষণ্ণভাবে বললে, 'এখন থাক। যদি সময় হয় দেখা যাবে।'

'সময়ের প্রশ্ন নেই। হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে ঝড়ের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শ্রীকাকুলামের কিছু জানো ?'

'কাগজে খবর পড়ি। আর সাউথ ইস্টার্ণ রেলে যেতে ওড়িশা পেরিয়েই মাঝারি একটা স্টেশন যেন দেখেছিলুম—শ্রীকাকুলাম রোড।'

'ঠিক। শ্রীকাকুলাম রোড। সারা ভারতবর্ষে ওই একটি রাস্তাই আছে। বিপ্লবের পথ।'

'বুঝেছি। কিন্তু চাকরি ছাড়বে কেন ?'

'হোল টাইম ডিভোট করতে হবে।'

'এতই জরুরী ?'

'নিশ্চয়,জরুরী। নন্ কো-অপারেশনের সেই ফার্স মনে আছে ? দেশের লোকের মেরুদণ্ডটাকে দু-ভাঁজ করে দেবার, অহিংসার আফিং খাওয়ানোর সেই আশ্চর্য আন্দোলনটি ? অথচ তাতেও ছাখো দেশ কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করে-ছিল, স্কুল-কলেজ ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল ছাত্রেরা, হাজার হাজার মানুষ চাকরি ছেড়েছিল, জেলে গিয়েছিল, লাঠি খেয়েছিল। আজ আমি চাকরি ছাড়তে চাইছি শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ? নিছক 'মক-ফাইটে'র জন্যে দেশ যদি এত বড় দাম দিতে পেরে থাকে, সত্যিকারের বিপ্লবের জন্যে এটুকু আমি পারব না ?'

অকাট্য যুক্তি। কিছু বলবার নেই।

'কী করবে ?'

'পার্টি থেকে যেমন নির্দেশ আসে।'

'যদি গ্রামে যেতে বলে ?'

'তাই যেতে হবে। আর কাজ তো এখন গ্রাম দিয়েই। বিপ্লবী কৃষকই শহর দখল করবে। কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-মাদ্রাজ-কানপুর— ক্যাপিটালিস্টরা তাদের শেষ দুর্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

পারলে ভালোই, প্রবীর ভাবল। কিন্তু ভারতবর্ষ কি কেবল অন্ধ্র, কেরল, বাংলাদেশ ?

চলতে চলতে দুজনে কখন এসপ্ল্যানেড ইস্ট পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ের দিকটায় এসে পড়েছিল। ট্র্যাফিক স্তব্ধ। নিশ্চল ট্রাম-বাস-মোটরের সার। একটা শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু পার হয়ে এসপ্ল্যানেড গুমটির দিকে ঢুকছিল। শহীদ মিনারের নিচে সভা আছে একটা।

'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—'

'—পার্টি জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রণ্ট ভাঙছে কারা?'

'— — —!'

ওদের ঠিক পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিল দলটা। মুকুল প্রামাণিক হঠাৎ বলে ফেলল: 'তোমরাই ভাঙছ, আবার কে?'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি ছেলে ফিরে দাঁড়াল।

'কী বললেন?'

পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ! সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুকুলকে তিন হাত সরিয়ে নিলে প্রবীর। বেশি কিছু দরকার নেই, পাইকারী হারে কয়েকটি ঘুষি পড়লেই যথেষ্ট; কিংবা কয়েকটি ফেস্টুনের লাঠি নেমে এলেই একেবারে ছাতু করে দেবে। মুকুলকে আড়াল করে প্রবীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিছু না—কিছু না দাদারা, আপনারা যান।'

'কিছুই বললেন না আপনারা?'

'না—না, আমরা নই।'

'কী হয়েছে—কী হয়েছে রে?' আরো কয়েকজন এসে দাঁড়ালো।

মুকুল বোধ হয় এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রাণপণে প্রবীর ঠেলে রাখল তাকে। মুকুল না হয় এখন অকুতোভয় সৈনিক, কিন্তু এ-ভাবে জনতার হাতে শহীদ হতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না প্রবীরের।

'আপনারা এগিয়ে যান—ভুল শুনেছেন।'

পেছন থেকে শোভাযাত্রার চাপ পড়ছিল, ছেলেরা আর দাঁড়ালো না। তবু যেতে যেতে একজন বলে গেল: 'মুখ সামলে কথা কইবেন, নইলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

'ব্যাটারা—র দালাল—' আর একটি মন্তব্য।

ফাঁড়া কাটল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে, মুকুলকে টানতে টানতে আরো খানিকটা সরিয়ে আনল প্রবীর।

'মাথা খারাপ নাকি তোমার ? কাণ্ডজ্ঞান নেই একটা ?'

'নির্ভেজাল সত্যি কথা বলেছি।'

'সব সত্যিই সব সময়ে কিন্তু নিরাপদ নয়।'

'ওটা শোধনবাদী নয়া-শোধনবাদীরা বলে।'

'মানছি। কিন্তু দোহাই প্রামাণিক, বীরত্বটা দলবল জুটিয়ে কোরো। দেখতে পাচ্ছ, তিনদিক থেকে প্রোসেশ্যন আসছে এখন ? গায়ে হাত তোলবারও দরকার নেই, স্রেফ স্ট্যাম্পীড্ হলেই আমরা ধুলোয় মিলিয়ে যাব।'

মুকুল দাঁতে দাঁত ঘষল।

'একদিন ওদের সঙ্গেই আমাদের ফয়সালা করে নিতে হবে।'

'তা নিয়ো। কিন্তু ময়দানে র‍্যালীটা কি রকম হবে আন্দাজ করতে পারছ কি ? বরং চলো এখান থেকে।'

'চলো।' মেঘে ঢাকা মুখে মুকুল বললে, 'কিছু খাওয়া যাক্।'

'সামনেই তো কে. সি দাশ।'

'না না,—মিষ্টিফিষ্টি নয়। মেট্রোর গলির ওদিকে চেনা পাঞ্জাবী দোকান আছে। ভালো তন্দুরী রুটি আর কাবাব করে। খরচ কম, পেটও ভরবে।'

'বেশ, তাই যাওয়া যাক্।'

তখনো রাস্তা বন্ধ—আর একটা শোভাযাত্রা ঢুকছে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে। রাস্তা পার হয়ে—শোভাযাত্রাটার দিকে চোখ পড়তেই প্রবীর থমকে দাঁড়ালো।

প্রসেশ্যনের মুখে যে মেয়েরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে কে ও ? চলার ভঙ্গি ক্লান্ত, শেয়ালদা থেকে তো হেঁটেই আসছে। ওই বিবর্ণ মুখ, ওই পাতলা ফ্রেমের চশমা, সুজাতা বৌদি। অথচ ডাক্তার বলেছিল—

রবিবারে সাবিত্রী বারাসাত যাবে কথা ছিল। গিয়েছিল কিনা সে জানে না, দেখা করবার সময় পায়নি। এখন মনে হল, যাওয়ার কোনো দরকার নেই, গেলেও কোনো লাভ নেই।

এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা আর উতরোল স্লোগানের ভেতরে কোথায় হারিয়ে গেল সুজাতা। স্বরাজ ঠিকই বুঝেছিল, পথ আলাদা হয়ে গেছে, আর মিলবে না কোনোদিন।

বিরক্ত মুকুল বললে, 'কী দাঁড়িয়ে গেলে কেন ?'

প্রবীরের নিশ্বাস পড়ল।

'না, দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এই সময় কাউকে দাঁড়াতে দেবে না।'

শহীদ মিনারের দিকটা পতাকায় লালে লাল। সেদিনও এই রঙ দেখলে বুকের মধ্যে সমুদ্র দুলত। কিন্তু এখন চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

এই লালে এখন আর এক রঙ মিশেছে। আত্মীয়-বিদ্বেষের রঙ।

॥ একুশ ॥

মণীশদা এসেছিল ঘোষ সাহেবের কাছে। কী জরুরী আলোচনা চলছিল দুজনের। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের কাজ নামিয়ে টুলু বেরুতে যা চ্ছল, মণীশদা বললে, 'একটু বোসো টুলু, তোমায় লিফ্‌ট্‌ দেব।'

মন্দ কী, বারো আনা রাস্তার বাসের ঝাঁকুনি বেঁচে যায়, কটা পয়সাও। পার্টিশনের ওপার থেকে ওঁদের কথা কানে আসছিল, কোন্‌ এক কারখানা, ফ্যাক্টরী আইন, লক-আউট, কোম্পানীর লিকুইডেশনে যাওয়া—এইসব নিয়ে খুব বিব্রত আর উত্তেজিত ছিলেন দুজন।

'ওদের ইউনিয়নের অন্তত: জনতিনেক পার্চেজেব্‌ল্‌—' ঘোষ সাহেব বলছিলেন।

'কিন্তু সাহসে কুলোবে না—' মণীশদা বলছিল, 'যে-রকম আগুন হয়ে আছে লেবার! একটু আঁচ পেলে একেবারে জ্যান্তে কবর দিয়ে দেবে।'

'ওরা আজকাল কবর দেওয়াটা খুব পছন্দ করছে।' ঘোষ সাহেব ঠাট্টা করছিলেন: 'সব সময় বলছে, এই মাটিতে কবর দিন। কিন্তু হিন্দুরা তো কবরে যেতে আপত্তি করতে পারে।'

'সে ব্যবস্থাও আছে। পুড়িয়ে মারো, পুড়িয়ে মারো—এটাও খুব ফেবারিট্‌ স্লোগান।'

এসব টুলু শুনছিল, শুনছিল না। বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বাড়ছিল ক্রমশ, এখন সব ঘরে ফেরবার তাড়া। আর ঘণ্টা দেড়-দুই বাদে এমন ব্যতিব্যস্ত হাইকোর্ট পাড়া একেবারে ঝিমিয়ে যাবে। তার এদিকের জানলা দিয়ে বিশাল লাল বাড়িটার যেটুকু দেখা যায়, তার ওপর এখন ছায়া ঘন হচ্ছে। এ ঘরে আলো সারাদিন জ্বলেই—দুপুরে তার অস্তিত্ব ভালো করে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই আলোটা টেবিলের তলায়, আলমারির কোণায়, র‍্যাকের আশে-পাশে ছায়ার ছক কাটছে এখন। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, কাগজ আর ক্লান্তির গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরটা।

মণীশদার কথা চলছে—চলছেই। টুলুর হাই উঠতে লাগল অবসাদে। বেরিয়ে বাস ধরলে এতক্ষণে ভবানীপুরে পৌঁছে যেত সে। কিন্তু মণীশদা বসতে বলেছে। বসাই যাক্।

উঠে টাইপরাইটারটার সামনে গিয়ে বসল। অল্প অল্প শিখছে, সামান্য স্পীডও আসছে। উৎসাহটা এ-সময়ে একটু বেশিই থাকে। হাতের আঙুল-গুলো এখনো সেট হয়নি, প্রায়ই দেখে দেখে টেপাটিপি করতে হয়।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে হেড ক্লার্ক মধ্যে মধ্যে বলেন, 'মেশিনটার বারোটা তো তুমিই বাজাবে দেখছি। দয়া করে ভেঙো না—এখন আবার রেমিংটন কোম্পানীতে গণ্ডগোল যাচ্ছে।'

হেড ক্লার্ক বেরিয়ে গেছেন, এই সুযোগ। টুলু মেশিনে কাগজ চাপিয়ে যা খুশি টাইপ করতে লাগল।

এস-ডাবলু-এ-পি-এন-এ, এস-ডাব্লু-এ—

স্বপ্না!

টুলুর আঙুল থেমে গেল। ঘুরেফিরে ওই নামটা। এই পাঁচ-সাতটা বছর তো বেশ ছিল, আড্ডা মেরে, ইয়ার্কি দিয়ে, বখামো করে চমৎকার কেটেছে। তখন কিছুই মনে পড়ত না। বাড়ি ফিরলে দাদা চ্যাঁচামেচি করত এক-একদিন, মা কাঁদত—কিছুই আসত-যেত না। স্বপ্না কোথাও ছিল না, কোনো স্বপ্নের মধ্যেও না। কিন্তু তারপরে দিদির পাল্লায় পড়বার আগে সেই হাজত—একজন কনস্টেবল কয়েকটা থাপ্পড় মেরেছিল, দারোগা দুটো লাথি বসিয়েছিলেন—আর হাজতের সেই দুর্গন্ধ। মার খেয়ে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসেছিল কার্তিক, ফণী গোঁ-গোঁ করে বলেছিল, 'শালাদের একবার রাস্তায় জুৎমতো পেলে—' আর লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে টুলু সারারাত ঘুমোতে পারেনি। যত কামড়েছে মশায়, মনের ভেতরটা জ্বলেছে তার চাইতেও বেশি।

দাদা ছাড়িয়ে আনল মুরারি হালদারকে ধরে। এমন সময় দিদি। নিজের মধ্যে একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল নিশ্চয়, না হলে হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হওয়ার সুবুদ্ধি জাগল কেন তার! আর তখন স্বপ্না ফিরল।

স্বপ্না ফিরল।

এই মেয়েটা তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার যদি মানে থাকে কোনো। কবে কথাটা প্রথম জানা গিয়েছিল—কবে?

[...ইস, তুমি কী ভালো অঙ্ক কষতে পারো টুলুদা! কত তাড়াতাড়ি!

'অঙ্ক তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব জানা চাই, যন্ত্রপাতি চেনা চাই। না হলে তো একেবারে সোজা ক্র্যাশ—দারুণ অ্যাক্সিডেন্ট।'

'সে কি! কিসের ক্র্যাশ! কিসের অ্যাক্সিডেন্ট?'

'বা রে, আই.এস.-সি. পাস করে আমি পাইলট হবো যে। জানিস স্বপ্না, দমদমে একটা এক্জিবিশন করেছিল একবার, আমি দেখতে গিয়েছিলুম। এরোপ্লেনের এগ্‌জিবিশন। মানে—ঠিক এরোপ্লেন নয়—নানা রকম প্লেনের এঞ্জিন, তার যন্ত্রটন্ত্র সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সূক্ষ্ম ব্যাপার না—দেখলে তোর মাথা একেবারে ঘুরে যেত। সেই দেখেই তো আমার মনে হল যে, আমাকে পাইলট হতে হবে। আর অঙ্কে মাথা না থাকলে, সব হিসেব করে, বুঝে প্লেন না চালাতে পারলে, ব্যাস্—হয়ে গেল।'

'না টুলুদা, না। তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই।'

'কেন রে, কত সম্মানের কাজ। তা ছাড়া ভেবে গ্যাখ্—কিরকম থ্রিলিং! মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি—পায়ের তলায় পড়ে থাকছে নদী-পাহাড়-সমুদ্র—বোঁ করে দেখতে দেখতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে একেবারে লণ্ডনে পৌঁছে গেলুম।'

'যেতে হবে না তোমার লণ্ডনে। প্লেন চালিয়ে।'

'তবে কী করব?'

'কেন, ডাক্তার হবে, এন্‌জিনীয়র হবে, আরো কত কী হতে পারো।'

'আরে, ঠিকমতো চালাতে পারলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে কেন। আর কত লোকই তো পাইলট হয়।'

'হোক গে। তুমি চালাতে যাও না প্লেন, তার আগে আমি মরে যাব।'

'তুই মরে যাবি কেন?'

'আমি—আমি যে—'

বাকিটা চোখের জলে মিলিয়ে গেল তারপর।...

টুলু টাইপ-করা কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। এস-ডব্লু-এ—স্বপ্না। না, এখনো যে সব সময়ে ভাবছে স্বপ্নার কথা, তা নয়। কিন্তু কোথায় জড়িয়ে গেছে মনের ভেতর, একটা সুরের মতন ঝিনঝিন করে বুকের মাঝখানে কাঁপতে থাকে কখনো কখনো। আর বিশেষ করে সেদিন, সেই কার্তিক আর তার দলবলের হাতে পড়বার সময়—

মণীশদা ডাকল: 'টুলু, চলো।'

'আসছি মণীশদা।'

মেশিনটা বন্ধ করে টুলু উঠল। টাইপ করা কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কী ভেবে ভাঁজ করে নিলে নিজের পকেটে।

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মণীশদা নামল, টুলু মণীশদার ফোলিয়ো-ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে পিছে পিছে চলল। এখানে আর মণীশদা তার ভগ্নীপতি নয়—তার মনিবের বন্ধু। এখানে মণীশদাকে আলাদা সম্মান করা উচিত, সে সঙ্গে থাকতে ভারী ব্যাগটা তাকে বইতে দেওয়া যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোষ সাহেব নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন, মণীশদার সঙ্গে টুলু উঠল তার গাড়িতে। কিছুক্ষণ ব্যাজার মুখে চুপ করে মণীশদা স্বগতোক্তি করল: 'আ—দিস লেবার-ট্রাব্‌ল। বাংলা দেশে একটা ইণ্ডাস্ট্রিও আর থাকবে না।'

টুলু চুপ করে থাকল। তার কিছু বলবার নেই। এসব ভাবনার ভার সে বইতে পারে না—ওগুলো দাদার এক্তিয়ারে। লেবারের জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার।

'লেবার মুভমেণ্ট নয়—স্রেফ ইউনিয়নবাজি। চমৎকার হয়েছে এই যুক্তফ্রণ্ট সরকার। যুক্তফ্রণ্ট মানেই চোদ্দ দলের লাঠিবাজি। যেমন করে হোক নিজের পার্টি বাড়াতে হবে। ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা বোঝবার দরকার নেই, ডিম্যাণ্ড কতটা রিজনেব্‌ল্—শেষ পর্যন্ত কোম্পানীই উঠে যাবে কি না সে-সব ভাবনাও নেই—স্ট্রাইক কল দিতে পারলেই পপুলারিটি। ইম্‌পসিব্‌ল্। দিস প্রভিন্স অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ডুম্‌ড্‌।'

টুলু তেমনি চুপ করে রইল

মণীশদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ময়দানে—শহীদ মিনারের নিচে বিরাট জনসভা। চৌরঙ্গীর ট্র্যাফিক চলছে, তার আওয়াজ ছাপিয়েও মাইকের গর্জন কানে আসে।

'সেই বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন কম্‌রেডরা—যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—'

মণীশদা বিষ-ছড়ানো গলায় বললে, 'হুঁ, তোমরাই কেবল সিজার্স ওয়াইফ—বাকি সবাই বিশ্বাসঘাতক!'

গাড়ি চলল। পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতে ট্র্যাফিক হাল্কা হয়ে আসছে। বাতাসে দক্ষিণের অজস্রতা। ঝরা পাতা উড়ে উড়ে আসছে পথের ওপর।

একটু চুপ করে থেকে মণীশদা বললে, 'কাজকর্ম কেমন চলছে ?'

'ভালোই।'

'শিখে নিচ্ছ তো ?'

'যতটা পারি।'

'যদি এক-আধটা পরীক্ষাও দিতে, তা হলে অনেক বেটার জায়গায় দেওয়া যেত তোমাকে। আজকাল এসব কোয়ালিফিকেশনে বেয়ারার কাজও জোটে না। নেহাত ঘোষ আমার বন্ধু বলেই—'

অপমানের একটা কাঁটা টের পেলো টুলু। ঠিক কথা, মণীশদার অনুগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু অনুগ্রহ যিনি করেন বার বার সেটা তিনি মনে করিয়ে দিলে ভালো লাগে না, কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব। তখন বলতে ইচ্ছে করে—দরকার নেই আপনার দয়ায়, ওটা বরং ফিরিয়েই নিন আপনি।

কিন্তু বলা যায় না সেকথা। মণীশদা এ নিয়ে বোধ হয় বার-সাতেক তাকে মনে করিয়ে দিল, তবুও বলা যায় না। টুলু এখন জীবনকে বদলাতে চাইছে ; এখন সাত বছরের সমস্ত অপচয়গুলোকে তার মুছে ফেলা দরকার, এখন আবার রক্তের ভেতরে সুর তুলেছে স্বপ্ন, অল্প বয়সে, বয়ে-যাওয়ার আগে যে সুরটা তার মনকে খানিক নেশার মধ্যে তলিয়ে রাখত।

টুলু একবার ঠোঁট চাটল।

'আমি প্রাইভেটে পাস করবার কথা ভাবছি মণীশদা।'

'তাই নাকি ?'

'ইচ্ছে আছে শীগগিরই পড়াশোনাটা আরম্ভ করে দেব।'

(ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, তবু এখনো কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া গেল না। অথচ যাওয়া-আসার রাস্তার ধারেই তো কটা টিউটোরিয়াল হোম পড়ে। কী যে হচ্ছে, কোনোমতেই আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না !)

মণীশ সামান্য একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু পড়াশুনোর এনার্জি আছে এখনো ? যে দলে মিশেছিলে !'

'এনার্জি আমার আছে মণীশদা। তবে অফিসে কাজের যা চাপ—'

মণীশ টুলুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল মুখটা।

'পরিশ্রম না করলে মাইনে দেবে কেন তোমাকে ? আর পরিশ্রম না করা ছাড়া কোন্ যোগ্যতা তোমার আছে ?'

আবার সেই অপমানের আঘাত।

খিদেয় ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে আসতে চাইছিল, একরাশ তীক্ষ্ণ বিরক্তি মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল টুলুর। বলতে ইচ্ছে করল: 'বার বার শোনাচ্ছেন কেন ওভাবে, গাধার মতো খাটুনি আর হেড ক্লার্কের সারাদিন দাঁতখিঁচুনির পরে ওই মাইনের মুষ্টিভিক্ষা আমি চাই না। কাল থেকেই দেব ঘোষ সাহেবের চাকরি ছেড়ে।'

কিন্তু, এখনো, এত অসহ্য হলেও বলা যায় না। জীবনটা বদলাতে হবে তাকে। স্বপ্না এখনো তাকে মনে রেখেছে। স্বপ্নার জন্যেই তৈরি হতে হবে তাকে।

নেবা গলায় টুলু বললে, 'তা ঠিক।'

মণীশদা তেমনি শক্ত ভঙ্গিতে বললে, 'কাজ করো, কাজ। খাটো। এসব কমপ্লেন কখনো তুলো না। আর মনে রেখো ঘোষ নেহাৎ মাসি গ্রাউণ্ডেই তোমায় চাকরি দিয়েছে, আমার রিলেটিভ না হলে—'

টুলু আর কথা বলল না, কেবল একটা হাতের মুঠো তার শক্ত করে সীটটাকে আঁকড়ে রাখল। মণীশদার গাড়িতে ইহজীবনে আর কখনো লিফ্‌ট্‌ নেবে না সে। এর চাইতে বোঝাই বাসের পা-দানীতে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অনেক ভালো।

আর অ্যাটর্নি অফিসের এই চাকরি ছাড়া ভদ্র জীবিকার আর কি পথ নেই কোনো? এর চাইতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি করলে কেমন হয়।

মণীশ বলছিল, 'গোটা বাঙালী জাতটাই যা হয়েছে—পরিশ্রম করতে হলেই—'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল টুলু। গলার ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, তার কান্না পাচ্ছিল।

গাড়িটা বাড়ির সামনে পৌঁছোনোর অপেক্ষা মাত্র। প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এল দিদি। একেবারে পাগলের মতো চেহারা।

অদ্ভুত স্বরে দিদি বললে, 'তুমি ছিলে কোথায়? তোমার অফিসে তিনবার ফোন করেছি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

টুলু আগেই নেমে যেতে চেয়েছিল, মণীশদা বলেছিল, 'তোমার দিদির ওখান

থেকে চা খেয়ে যাবে।' কিন্তু এখন আর চা খাওয়ার প্রশ্ন নয়—ভয়ে থমকে গেল দুজনে।

মণীশদা কাঁপা গলায় বললে, 'আমি ঘোষের অফিসে গিয়েছিলুম, কাজ ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী? অমন করছ কেন উমা?'

দিদি এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'টিনটিনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্য ফ্ল্যাটগুলো থেকে অনেকগুলো মুখ উঁকি মেরেছে তখন।

মণীশ আর টুলু পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শাদা হয়ে গেল মণীশের মুখ, থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট।

'কী বলছ তুমি? পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না—স্কুল থেকে সে ফেরেনি। স্কুলে নেই, তার বন্ধুদের বাড়ি কোথাও যায়নি।' উমা কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটির ওপর: 'ওগো, কোথায় গেল আমার মেয়ে—ফিরিয়ে আনো—যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো তাকে—'

দিদি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। অবিকল আরো দশজন বাঙালী মেয়ের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল: 'ফিরিয়ে আনো, আমার টিনটিনকে ফিরিয়ে আনো—'

॥ বাইশ ॥

সাবিত্রী বললে, 'কী হল, মুখের চেহারা ও-রকম কেন?'

'এক গ্লাস জল দাও, তারপরে বলছি।'

'চা খাবে?'

'না—দরকার নেই। মুকুলের পাল্লায় পড়ে বড় এক পেয়ালা গ্রীন টী খেয়েছি। চায়ে উৎসাহ নেই আর। জলই আনো।'

জল নিয়ে এল সাবিত্রী। এক চুমুকে শেষ করল গ্লাসটা।

'কী হয়েছে তোমার?' একটা স্নিগ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সাবিত্রী প্রবীরের দিকে চাইল।

'বলছি। তুমি কখন ফিরেছ কলেজ থেকে?'

'আজ ক্লাস হয়নি। স্ট্রাইক করেছে মেয়েরা।'

'কিসের স্ট্রাইক ?'

'ওদের ইউনিয়নের দুজন লীডারকে কলেজ থেকে টি-সি নিতে বলা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে।' সাবিত্রী একটু হাসল।

'বুঝেছি। কিন্তু এই দুটি মেয়েকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া কি এতই জরুরী ?'

'গভর্নিং বডি মনে করে এরাই ট্রাব্‌ল-মেকার। আমি অবশ্য স্টাফ রিপ্রেজেন্টিভ হিসেবে আছি গভর্নিং বডিতে। আমি বলেছিলুম, এখনি এসব ড্রাসটিক অ্যাকশন নিয়ে লাভ নেই, বরং অন্যভাবে—কিন্তু ওঁরা রাজী হলেন না। বললেন, মেয়ে দুটো অত্যন্ত উদ্ধত—ওদের কিছুতেই রাখা চলবে না।'

'তা হলে স্ট্রাইক এখন চলতে থাকবে ?'

'খুব সম্ভব।'

'সময়টাই ওদের উদ্ধত করে তুলছে—ওদের দোষ নেই। সেই সঙ্গে যদি তোমরাও অসহিষ্ণু হও, তা হলে জটটা আরো পাকাবে, খুলবে না।'

সাবিত্রী বললে, 'কী করা যাবে, বলো। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে যারা স্কুল-কলেজ থেকে পাস করে গেছেন, তাঁদের চোখে সেই সময়ের ইমেজটাই ভাসছে। টীচার আর স্টুডেন্টের ভেতরে তাঁরা সেই ভয় আর শ্রদ্ধার সম্পর্কটুকুই আশা করছেন এখনো।'

'ভয়ের কথা জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধাটা এখনো থাকতে বাধা নেই। মুশকিল হল, দু'পক্ষ দুটো যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তোমরা যারা পড়াও—তারা একটু বেশি করে যদি ওদের চিনতে চাও—'

'খুব বেশি সরল করে ফেললে প্রবীর। সব কিছুর মূলটা যে কোথায় সে তুমিও জানো, আমিও জানি। দেশ-সমাজ-জীবন—সব কিছু যে হতাশা আর অনিশ্চয়তায় পাক খাচ্ছে, তাকে একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যে যদি তুলে ধরতে না পারি, তা হলে এর শেষ কোথাও নেই।' সাবিত্রী একটা নিশ্বাস ফেলল : 'জানো—এক সময় আমি ভেবেছি, এখনো ভাবি—ছাত্র-রাজনীতি কেন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোয় না—কেন সব সময় পার্টি-পলিটিকসে জড়িয়ে যায়! কিন্তু তারপরেই দেখি—আজ পার্টি-পলিটিকস্‌ ছাড়া আর কী আছে বাংলা দেশে ? সব লেফ্‌ট-পার্টিগুলোর ইডিয়োলজীর দিকে তাকাও—নিছক কতগুলো থিয়োরীর পার্থক্য ছাড়া আর সেগুলো এখন শেল্‌ফে তুলে রাখলেও দেশের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—প্রত্যেকে যা চাইছে, তার মধ্যে তফাৎ কোথায় ? অথচ পার্টি বাঁচাতে কিংবা

বাড়াতে হয়, নেতারা তাঁদের মহিমায় ডিস্‌টিংটিভ থাকতে চান, অতএব যেখানে সাধারণ ঐক্যে এক বছরে দশ বছর এগিয়ে যাওয়া যেত—সেখানে তাঁরা ক্যাডারদের খেপিয়ে দেন—পঁচিশ বছরের চেষ্টা পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে যায়, লেবার কৃষক-ছাত্র—সিভিল-ওয়রের আবহাওয়া তৈরি করে।' সাবিত্রী একটু চুপ করল: 'প্রবীর, একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, সবচেয়ে বড় সুযোগ যখন এল, তখন সেই সুযোগটাকে আমরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী করব—ওরা তো সময়ের বাইরে নয়।'

একটু চুপ। তারপর সাবিত্রী অপ্রস্তুতের মতো হাসল।

'যাক গে, এ সব থাকুক এখন। আমি তো একেবারে চুপ করেই থাকব ভাবি, তবু মধ্যে মধ্যে এমন অস্বস্তি লাগে যে—কিন্তু তোমার কথা বলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো নেই।'

সাবিত্রীর কথাগুলো প্রবীরের ভাবনাটাকে আবার একটা বিরস দিকে সরিয়ে নিয়েছিল, কাগজে অজয় মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতি বসুর বিবৃতি পাল্টা-বিবৃতির বিস্বাদ অনুভূতিটা জাগিয়ে তুলছিল। মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য কোন্দলে গলা চড়াচ্ছেন—কী রমণীয় যুক্তফ্রন্টের চেহারা। ওদিকে আর এক নেতা দিন-ক্ষণ গুনে ঘোষণা করছেন কবে এই মন্ত্রিত্বের বারোটা বাজবে। খাসা চলছে।

আর শ্রমিক ঝরাচ্ছে শ্রমিকের রক্ত, কৃষক কৃষকের ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমরা দায়ী নই—ওরা। ওরা কারা? প্রতিবিপ্লবী? তা ছাড়া আর কী—আলাদা পার্টি যখন।

সাবিত্রীর কথায় প্রবীর জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে আনল মানসিক অবসাদ থেকে।

'তুমি বারাসতে গিয়েছিলে?'

একটা ছায়া পড়ল সাবিত্রীর মুখে।

'গিয়েছিলুম। কিছু করা যায়নি। ভেবেছিলুম, অফিসে ফোন করে তোমায় খবর দেব, কিন্তু কেমন লজ্জা করল। সুজাতা আর ফিরতে চায় না। স্বরাজদার নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে। বলে, এবার ভালো দেখে স্বরাজদা আর একটা বিয়ে করুক, এতটুকুও আপত্তি নেই তার।'

'এত অভিমান?'

'অভিমান?' সাবিত্রী কপাল কুঁচকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল: 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'দশ বছরের সম্পর্ক মুছে যায় এত সহজে? স্বামী-স্ত্রীর?'

'ভাঙনটা খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়, প্রবীর। তখন বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু তারপর একদিন একসঙ্গে নেমে আসে। তা ছাড়া—' সাবিত্রী যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে চলল: 'তা ছাড়া সুজাতা যে স্বরাজদাকে ভালোবেসেছিল, সেখানে স্বরাজদার আর একটা ইমেজ ছিল। আজকের রাজনীতিতে স্বরাজদা এমন করে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে বলেই এমন বিশ্রী হয়ে এসেছে ভাঙনটা।'

'স্বরাজ যদি যে কোনো একজন মানুষ হত—'

'আর সুজাতার যদি কোনো পলিটিক্যাল কন্‌ভিক্‌শান না থাকত। কোথাও বাধত না ভুলু—ওদের জীবনটা চমৎকার এগিয়ে যেত।'

হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। একালে আমাদের মনগুলো অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। আসলে আগেকার মতো স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়—কাউকেই আমরা সবটুকু দিয়ে ফেলতে পারি না—অনেকখানিই নিজেদের জন্যে রেখে দিতে হয়। সেই বাড়তি জায়গাটুকুতেই কখনো-কখনো কাঁটাবন জন্ম নেয়। যাদের আমরা খুব স্বাভাবিক বলে জানি, তারা কি সত্যিই স্বাভাবিক? সবটা?

প্রবীর সাবিত্রীর দিকে তাকালো। চোখ দুটো ক্লান্ত। সুজাতার কথাই ভাবছে বোধ হয়।

সাবিত্রী বললে, 'কিন্তু তোমার কথা তো বললে না।'

'আজ ময়দানে ওদের পার্টির ম্যামথ্‌ গ্যাদারিং ছিল একটা। সেখানে সুজাতা বৌদিকে দেখলুম।'

'তাই নাকি?'

'একটা মিছিলের সঙ্গে আসছিল।'

'দেখা হল তোমার সঙ্গে?' একটু উত্তেজিত হল সাবিত্রী: 'কিছু বললে?'

'দূর থেকে দেখেছি। তা ছাড়া সঙ্গে ছিল মুকুল—সে নক্‌শালাইট্‌—এমন একটা কমেন্ট্‌ করে বসল যে আর একটু হলে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে হল ওকে।'

'তা হলে আবার পুরো পলিটিকসে নামল সুজাতা।'

'হ্যাঁ, ফেরবার পথটা বন্ধ করে দিলে চিরকালের মতো।'

'কিংবা এইটেই ওর দরকার ছিল। এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে না দিলে নীলুকে ও ভুলতে পারবে না।'

'নীলুর জন্যে টান ওর আছে নাকি?'

'সেইটে ছিল বলেই হয়তো এতদিন ওখানে থাকতে পেরেছে। কিন্তু আর সইল না।'

প্রবীর আবার চুপ করে গেল। দাম দিতে হয়—নিশ্চয়। কিছু না দিয়ে বিপ্লবের সৈনিক হওয়া যায় না—নিজের নাড়ী পর্যন্ত ছিঁড়ে দিতে হয় কখনো-কখনো। আজ সুজাতাকেও এইভাবেই ছেড়ে যেতে হয়েছে নীলুকে। কিন্তু এই মূল্য কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে শেষ পর্যন্ত? ময়দানে যারা বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলেন, তাঁরা কতটা সংগ্রামের কথা বলছিলেন, কতখানিই বা বিদূষণের?

'সাবিত্রী।'

'কী।'

'ভাবছি, ভাগ্য ভালো যে সাহস করে কখনো বলিনি যে, আমার মতো একজন সাধারণ কেরানীকে তুমি বিয়ে করে ফেলো।' সাবিত্রীর গাল লাল হয়ে উঠল।

'এতই ভয় আমাকে?'

'ভয় তোমাকে নয়—সময়কে।' সাবিত্রীর হাতটা আবার মুঠোর মধ্যে টেনে আনল প্রবীর: 'এই যা, তোমার আঙুলে আবার ব্যথা দিলুম নাকি?'

'না—ওটা সেরে গেছে।' সাবিত্রীর চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল: 'কিন্তু কাকে ভয় করো বললে?'

'সময়কে। জানো—' প্রবীরের মুঠোটা আরো শক্ত হতে লাগল: 'সময়টাকে আমরা যত বেশি আশা-আনন্দ-ভবিষ্যৎ—ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছি ততই সে ভেঙে যাচ্ছে—হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। একটা স্রোতের টানে আমরা ভাসছি—যেটাকে মনে হয়েছিল অনুকূল, ঠিক এইবারে একটা নিশ্চিত আর শক্ত ডাঙায় পৌঁছে যাব, তখন দেখছি আমরা মোহানায় হারানো নৌকার মতো চলে যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। আমরা পরস্পরকে পাশে চাইছি আর ক্রমাগত আলাদা হয়ে যাচ্ছি। জানি, তোমার হাত ধরে আমি রওনা হবো—তারপর দেখব স্বরাজদা আর সুজাতা বৌদির মতো আমরাও কখন—'

'কিন্তু ভুলু—', সাবিত্রী প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, 'আমি তো তোমাকে কখনো কোনো আলাদা চোখ দিয়ে দেখব না। আমি তো কোনোদিন কল্পনা করব না যে, সম্রাটের মতো তুমি মাথা ছাড়িয়ে উঠবে সকলের। তুমিও সাধারণ, আমিও সাধারণ। যদি স্রোতে ডুবতেই হয়, গাঁটছড়া বেঁধেই ডুবব। সুজাতার মতো আমার স্বপ্ন নেই—স্বপ্ন কোনোদিন ভাঙবেও না।'

'কী জানি।'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না?'

'তোমাকে নয়— সময়কে। কিন্তু একটু ভুল বললে সাবিত্রী। আমি সাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি সাধারণ নও। তুমি এম. এস্‌সি পাস করেছ, কলেজে পড়াও। আমি পাসকোর্সের বি-এ, বিদ্যেয় তোমার কাছে কিছু নই। কাজেই তোমাকে বিয়ে করব—এরকম ধৃষ্টতা আমি ভাবতেই পারি না। তবু হয়তো তোমার দয়া হল—'

'এই, চুপ।'

'না—না, কথাটা বলতে দাও। তবু হয়তো তুমি—'

'আবার!'

আর বলতে দিল না সাবিত্রী। প্রবীরের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে এনে হাতটাকে জড়িয়ে দিলে প্রবীরের গলায়। একেবারে টেনে আনল নিজের কাছে।

'ভীরু—ভীরু কোথাকার! সময়ের কাছে হার মানবে কেন, সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা ছিনিয়ে নিতে হয়।'

সাবিত্রী একটু আগে স্নান করে এসেছে, তার হালকা সুগন্ধ, সারা শরীরে ঠাণ্ডা দীঘির জলের শীতল শান্তি, প্রবীরের মুখের ওপর নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন।

'ভীরু—ভীরু কোথাকার! এরকম কাপুরুষকে কে ভালোবাসে!'

ভালো যে বাসে না, তার প্রমাণ দিল তৎক্ষণাৎ। আর এক হাতে কাপুরুষের মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে গভীর গলায় বললে, 'চুপ।'

তারপর প্রবীরের ঠোঁটে শক্ত করে চেপে ধরল নিজের ঠোঁট দুটো।

সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে হয়। ঠিক কথা। কিন্তু কিভাবে? আমরা তো ভেবেছিলুম—অনেক দুঃখের পাড়ি শেষ হয়ে গেছে, এইবার আমরা ঘাটে পৌঁছুব। অনেক রক্ত, অনেক ভুল শেষ হল, অনেক শত্রুর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা আমরা করে নিয়েছি। এর পরে আরো অনেক পরীক্ষা দিতে হবে—আরো অনেক নিষ্ঠুর কঠোর দায় মেটাতে হবে—কিন্তু তখন আমরা প্রস্তুত। প্রাচীর যখন একবার ভেঙেছি, লক্ষ্য যখন একবার নিশ্চিত—

কিন্তু ঘাটে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। স্রোত আমাদের কূলে উঠতে দিল না। আমরা কি—

বাস কণ্ডাক্টর এসে দাঁড়ালো : 'দাদা—আপনার টিকিটটা—'

চিন্তাটা কেটে গেল।

ডবল-ডেকারের দোতলায় হাওয়ার ঢেউ। বাতাসে বসন্ত। এক-একটা ভালো লাগার দিনকে মনে পড়ে এইরকম হাওয়ায়। একদিন সে আর সাবিত্রী—একদিন কেন—কতদিন এইভাবে হাওয়ার ভেতরে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে পাশাপাশি বসেছে বাসে-ট্রামে, গাছের তলা দিয়ে—পাতার শব্দ আর ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটেছে কতক্ষণ। আশ্চর্য—আজ সাবিত্রীর সঙ্গে মাসে একবার দেখা করবার সময় পর্যন্ত হয় না। নিজের কাজ বেড়েছে, সাবিত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

তবু—তবু এখনো এই বিস্বাদ দিনগুলোতে—যখন মনে হয়, জীবনটার কাছে অনেক কিছু চাওয়ার ছিল, নেবার ছিল, যখন কিছুই নেওয়া যাচ্ছে না—কেবল মুঠো থেকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখনো কিছুক্ষণের জন্যে সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়—এখনো আশা আছে, আমরা হারব না, আমরা হারাবো না।

এতক্ষণে একটা মাধুর্যের স্বাদ স্বপ্নের মতো তাকে ঘিরতে লাগল।

বাড়ির সামনে পৌঁছে আশ্চর্য লাগল তার। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কে এল ? রাত তো এখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। কে বাড়িতে এসেছে এই অসময়ে ?

চিনতে দেরি হল না। দিদির গাড়ি।

॥ তেইশ ॥

এখন ঘন ঘন বক্তৃতা—এখন নিয়মিত মীটিং এখানে-ওখানে। কিন্তু মীটিং-এর চেহারাই বদলে গেছে। সেই একতা নেই, সেই শপথ নেই—একই মঞ্চে সব দলের নেতার সেই উজ্জ্বল সমাবেশ নেই। সেদিন সব শ্রোতার মন এক উৎসাহ—এক প্রত্যয়ে ঝকঝক করত : সময় বদলেছে, অনেক যুদ্ধ—অনেক দুঃখের পর আমাদের এই জয় : আগের ভুল আর করব না—এবার সব নতুন করে গড়বার পালা।

দলের প্রশ্ন আর নয়—সব নেতাই জনমন অধিনায়ক। জ্যোতি বসু ? আনন্দিত করতালি। সোমনাথ ? জয়ধ্বনি। হেমন্ত বসু—বরদা মুকুটমণি—

সুধীন কুমার—সুশীল ধাড়া—উল্লাসের পর উল্লাসের ঢেউ। এক দল—এক মন—এক পথ।

কিন্তু মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

'যুক্তফ্রণ্ট ভাঙছে কারা?'

এক এক পক্ষের এক এক জবাব।

বেনামদার জমি কে দখল করবে? আমরা—আমরা। যে সব লাঠি-সড়কি-তীর-ধনুক এক লক্ষ্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারা ঘুরে গেল নিজেদের ভেতর: এর মাথায়, তার বুকে। কে কাটবে জমির ধান? আমরা—না, তোমরা নয় আমরা—ঐক্যের লাল পতাকায় আঁকা কাস্তে ধানে পড়ল না—রাঙা হল নিজেদের রক্তে। কারা করবে ভেড়ী দখল? ছুটল বল্লম—মাছ গাঁথল না, মানুষের বুকে বিঁধল। তোমার ইউনিয়ন? মানব না—আমি দখল করব, আমাকে বাড়াতে হবে পার্টির স্ট্রেংথ—অতএব লাল পতাকার হাতুড়ি শ্রমিকের হাতেই শ্রমিকের মাথায় পড়ল। সেদিনও স্ট্রাইকে যারা একতাল জমাট লোহার মতো সামিল হয়েছিল, আজ অফিসে পাশাপাশি বসেও তারা কেউ কাউকে চিনতে পারছে না—আমরা আমরা, তোমরা তোমরা। 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ।' নিঃসন্দেহ! কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে তাকাও—সব মোহ মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

আমি জানতুম—এ যে হবেই আমি জানতুম। যেদিন কতগুলো অস্পষ্ট ইডিয়োলজীর সুতো ধরে, কিছু দলীয় নেতার জেদ আর অহঙ্কারের কোঁদলে তোমরা ভেঙে গেলে, আমি সেদিনই জানতুম। জনতা তোমাদের বিশ্বাস করেছিল, তাকিয়েছিল তোমাদের মুখের দিকে, কিন্তু তাদের দিকে তাকাওনি। একচক্ষু হরিণের মতো চেয়ে থেকেছ দলের দিকে, পুজো দিয়েছ নিজেদের অহমিকার পায়ে। এখন তার দাম শোধ করতে হবে—কড়ায়-গণ্ডায়। তোমাদের সেই ভুলের ঋণ মেটাতে গিয়েই আনন্দরা অন্ধের মতো ঝাঁপ দিয়েছে স্রোতে।

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা।' বাংলা দেশে জন্মে ভুল করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাগুলোকে অসংলগ্ন প্রলাপের মতো মনে হয় এ-দেশে। কোনো বিশ্বের ভাণ্ডারীর ঘরে এত অতিরিক্ত সঞ্চয় নেই যে নির্বুদ্ধিতার দেনা শুধে দেবেন তোমাদের।

রাত দশটা বাজে—তবু বক্তৃতা চলছিল সমান তেজে। খানিক দূরের মাঠ থেকে, অ্যাম্প্লিফায়ারে ভেসে-আসা সেই আওয়াজ ছাড়া-ছাড়া হয়ে কানে

আসছিল স্বরাজের। মুখ বাঁকা হয়ে উঠছিল সিনিকের হাসিতে। 'যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে কারা?' কেউ ভাঙছে না—কতকগুলো ভাঙা কাঁচের টুকরোকে কাগজের পটি দিয়ে তোমরা জুড়ে নিয়েছিলে, একটা বর্ষারও ভর সইল না, কাগজ গলে গেল।

হঠাৎ দুমদাম করে বোমার আওয়াজ। তারপরে দারুণ কলরব।

যাক—জমে উঠল তাহলে। এক ধরনের তৃপ্তিতে স্বরাজের মুখ ভরে উঠল: এইটেই দরকার ছিল, এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। এতক্ষণ একতরফা নিন্দে-মন্দ চলছিল, এবার ওপক্ষ থেকেও তার জবাব এল। বক্তৃতার চাইতে ঢের জোরালো—লাউডেস্ট্ প্রোটেস্ট্।

আবার বোমার শব্দ।

কিন্তু বোমার শব্দ নয়। একটা ছবি মনে এল। কোন এত হতভাগা মানুষকে ডোমেরা পোড়াচ্ছিল কেওড়াতলার শ্মশানে। একজন বিরক্ত হয়ে লাঠির ঘা বসিয়ে ফাটিয়ে দিলে মাথাটা—ছিটকে-ছড়িয়ে পড়ল হলদে রঙের গলিত মগজ—মড়াপোড়া গন্ধের সঙ্গে আর বাড়তি দুর্গন্ধ পাক খেয়ে উঠল শ্মশানের গরম বাতাসে।

যুক্তফ্রন্টের চিতা তো জ্বলছিলই। এবার খুলি ভাঙবার আওয়াজ আসছে।

লোকজনের দৌড়োদৌড়ির শব্দ পাওয়া যায়। ওদিকের বড় রাস্তাটা দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস পালিয়ে গেল। পুলিস ভ্যান ছুটে গেল মনে হয়।

অতঃপর শান্তি।

এবং কবরের শান্তি।

দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ল স্বরাজের। সুজাতার ছবি একখানা। বিয়ের পর ছবিটা তুলে দিয়েছিল সুজাতার বন্ধু সাবিত্রী, তার দামী ক্যামেরা ছিল একটা, ছবিটা ভালো তুলেছিল। সুজাতার মোটামুটি সুশ্রী চেহারা—কিন্তু ছবিতে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। তার চেয়েও আশ্চর্য—

তার চেয়েও আশ্চর্য—এবং ঠিক এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল নাকি স্বরাজ, এই ছবিতে ভারী কোমল, ভারী শান্ত মনে হচ্ছে সুজাতাকে। আর—এমনও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোনো পাড়াগাঁয়ের একটি কিশোরী মেয়ে—দু চোখে লজ্জা জড়ানো, জীবনকে এখনো সে জানে না, ভীরুর মতো একটা অনিশ্চয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে!

কী ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ফোটোগ্রাফ। এই সুজাতা?

নীলু হওয়ার পরে কিছুদিন কেমন নিবে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল শরীর, তারপর একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। তখন স্বরাজই বলত—সেই ময়দান-মিছিলের দিনগুলোকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বলত: 'সুজাতা, এত সহজে মরলে চলবে কেন? আমাদের সব পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে। আমাদের কবি সুভাষদার কথা ভুলে গেলে: "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?" '

'স্বরাজ, আমি বোধ হয় চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাচ্ছি।'

'কে বলে? "This is our day, so turn my Comrade, turn/ like infant's eyes"—'

তারপর।

তারপর তার নিজের চোখেই নিবে গেল সূর্যমুখী। ধরতে চাইল মাটি আঁকড়ে, মুঠো ভরে উঠল ভাঙা কাচের ধারালো টুকরো, হাত রক্তারক্তি হয়ে গেল। দেখল তার নিজের চারদিকে লোহার বাসরের মতো প্রাচীর উঠেছে, সেখানে মাথা ঠুকে কপাল ফাটে—কিন্তু প্রাচীর নড়ে না।

এবং তখন সুজাতা জেগে উঠল।

'তুমি কী করবে?'

'কিছুই করবার নেই, কিছুই করব না।'

'মানে?'

'আই হেট্ পলিটিক্স—আই হেট্ পলিটিশ্যন্স্, আই হেট্ এভ্‌রিথিং!'

'স্বরাজ, শেষে তুমি—'

'আই ওয়াজ এ ফুল। এসব না করে আমি কালোবাজার করতে পারতুম। বিরাট বাড়ি হত, লাইমুজিন হত, প্রায়ই পৃথিবী ঘুরে আসতুম। আর কালো-বাজারীদের স্ট্রীট ল্যাম্পের পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে—জওহরলালের এই স্ল্যাপস্টিক নিয়ে আমার মদের আসর খুব ভালো জমে উঠত।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমার নয়—বাংলা দেশের।'

প্রথমে কাঁদল সুজাতা। তারপরে ক্ষেপে উঠল আস্তে আস্তে।

এখন সময়টা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল। আমাদের প্রত্যেককে নামতে হবে এখন। এতদিন বাইরে ছিল শত্রু, এবার ভেতর থেকে ঘা দিয়েছে তারা।

'কারা শত্রু?'

'ওয়া।'

'সত্যটা আবিষ্কার হল বছর ত্রিশেক একসঙ্গে থাকবার পরে? একসঙ্গে জেল খেটে, দুঃখ সয়ে, লাঠি খেয়ে, রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে?'

'ওদের পতন হয়েছে।'

'আর তোমরা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। একেবারে দেবলোকের দিকে।'

'গায়ে পড়ে ঝগড়া করছ কেন? তুমিও ওদের দলে।'

'আমি ঈশ্বর মানি না। But Oh, God, if here be any God, please save me from all these political parties!'

এর পরে দিনগুলো বিস্বাদ থেকে কটু, কটু থেকে বিষাক্ত। প্রত্যেক দিন চারপাশে তাকিয়ে—দেশের চেহারা দেখে, মাথা ঠিক থাকে না, রক্ত চড়ে যায়, এক-একসময় বাড়িতে ফেরে পৃথিবীর সমস্ত জিঘাংসা মাথার ভেতরে জড়ো করে। আর তখনই হয়তো—

'আমি এভাবে থাকতে পারছি না। তুমি কি এটা মিড্‌ল ইস্ট পেয়েছো যে আমাকে একেবারে হারেমে বন্দী করে রাখবে—বাইরের আলোও দেখতে দেবে না?'

'আলো নেই সুজাতা। অন্ধকারে প্যাঁচা উড়ছে।'

'তুমি চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশনে ডুবে গেছ।'

'ফ্রাস্ট্রেশন নয়—এতদিনে আমার চোখ খুলেছে।'

'না স্বরাজ—এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ইয়ু মাস্ট্ ওয়েক-আপ।'

'কিসের জন্যে? রাতের অন্ধকারে প্যাঁচার ঝগড়াটা আরো জমিয়ে তুলব বলে?'

বিষ বাড়ছিল, ক্রমেই বাড়ছিল। তারপরে যন্ত্রণা আর কারোই সইল না।

'আমি চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না।'

'তোমার অভিরুচি।'

'তুমি আর একবার বিয়ে করতে পারো। ডিভোর্সের স্যুট ফাইল কোরো, একপার্টি ডিগ্রি পাবে, আমি কনটেস্ট করব না—অভয় দিচ্ছি তোমাকে।'

'অনুগ্রহের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

একবার ফিরে তাকিয়েছিল সুজাতা, মনে হচ্ছিল তার শক্ত মুখখানা লোহার ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করেছে কেউ, কোটরের ভেতর চোখ দুটো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিল। হয়তো ক্রূর কিংবা রাস্কেল বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে

নিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

একটা আদিম ক্রোধে পেছন থেকে স্বরাজ ডাক দিয়ে বলেছিল: 'পার্টির স্পেশ্যাল ট্রেনে ইন্‌কিলাবটা যখন নিয়ে আসবে, তখন খবর দিয়ো, আমি স্টেশনে রিসিভ করতে যাব।'

আসুক—ওরাই বিপ্লব আনুক। স্বরাজ আর সুজাতার কথা ভাববে না। কিন্তু দেওয়ালের ওই ফোটোটা! কী ডিসেপ্‌টিভ ছবিই তুলেছিল সাবিত্রী—যেন পাড়াগাঁয়ের একটি শান্ত কিশোরী মেয়ের মতো লজ্জাভরা চোখে চেয়ে আছে সুজাতা, জীবনটাকে এখনো চেনে না, এখনো পৃথিবী তার কাছে স্বপ্নে আর বিস্ময়ে ভরে আছে!

না—সুজাতার কথা ভাববার কোনো মানে হয় না আর। ইট্‌স্ এ সীল্‌ড্ চ্যাপ্‌টার।

বাইরে বক্তৃতা নেই, বোমার আওয়াজ নেই, কোলাহল নেই, হঠাৎ যেন একটা স্তব্ধতার মধ্যে ডুব মেরেছে সব। কবরের শান্তি। এর পরে আরো বোমার দিন আসছে, কালের চিতায় আরো অনেকগুলো মাথা ভাঙবার আওয়াজ জেগে উঠবে, তারপরে—তারপরে সারা বাংলা দেশ জুড়ে শ্মশানের ছাই উড়ে চলবে কেবল।

গুনগুন করে একবার কান্নার আওয়াজ এল যেন। স্বরাজের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল একবারের জন্যে। নীলু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাকে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল।

স্বপ্নার গলার আওয়াজ—মা যেন কান্নাভরা সুরে কিছু বললেন, বাবা রোজকার অভ্যাসে নিজের ঘরে লুই ফিশার বা ওই রকম কিছু একটা পড়ছিলেন, তিনি কয়েকবার কেশে উঠলেন।

নীলু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মা'র স্বপ্ন দেখছে। সুজাতা জেগে বসে দেখছে বিপ্লবের স্বপ্ন। আবার একটা সিনিক হাসিতে মুখ ভরে উঠল স্বরাজের।

টেবিল থেকে সিগারেট, দেশলাই তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা। দিল্লীতে ট্রান্সফারের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে সামনের মাসেই। নীলুকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। সেখানে যে-কোনো একটা রেসিডেনসিয়াল স্কুলে ভর্তি করে দেবে তাকে। তারপর মাকে ভুলতে, এমন কি এই পরিবারটাকে ভুলে যেতেও তার সময় লাগবে না।

বাইরে পায়ের শব্দ। দরজার ও-পাশে কে দাঁড়িয়ে।

'কে ?'

'আমি, বড়দা।'

'স্বপ্না ? ভেতরে আয়।'

স্বপ্না ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের পাশটিতে।

'কিছু ক'বি ?'

'নীলুডা খুব কষ্ট পাইতাছে বড়দা।'

এতক্ষণের জ্বালা স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে যেন মমতায় জুড়িয়ে এল। বাড়িতে এই একটি মেয়ে। এত স্নিগ্ধ, এত করুণ। কোনোদিন রাগ করল না কারুর ওপর, অভিমান করল না এতটুকুও, যেন নিজের ছায়ার ভেতরে তলিয়ে রইল চিরকাল। ওকে এতটুকুও দুঃখ দিতেও কী যে খারাপ লাগে!

শান্ত গলায় স্বরাজ বললে, 'দুই-চাইর-দিন। ভুইল্যা যাইবো তারপরেই।'

'না—ভুলবো না। ছোট্ট পোলাপান মায়েরে ভুলতে পারে ?'

স্বরাজ চুপ করে রইল। জবাব পাচ্ছে না।

ভিজে গলায় স্বপ্না ডাকল: 'দাদা।'

'কী ?'

'তুমি একবার যাইবা বৌদির ধারে ?'

আর কেউ কথাটা বললে আগুনের মতো জ্বলে উঠত। বলত: চুপ করো, আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না সুজাতার নাম। কিন্তু স্বপ্নার সামনে সমস্ত মনটা মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্তভাবে হাসল স্বরাজ।

'ক্যান এইসব ভাব্‌তাছস্‌। সে আর আইবো না। আমি গ্যালে হয় তো ত্যাখাও কোরবো না।'

স্বপ্নার চোখে জল ছলছল করতে লাগল।

'বৌদি নীলুর কথাডাও ভাব্‌বো না বড়দা ?'

'সকলের আগে ত্যাশ। সেইডাই ভাব্‌তাছে।'

'আমি অ্যাক্‌বার গিয়া বৌদিরে বুঝামু বড়দা ?'

'না, যাইতে হইবো না। খামাখা অপমান হইয়া লাভ নাই।'

'বৌদির কাছে আবার অপমান কিসের ? কাইল আমি বরং—'

ইচ্ছে ছিল না, তবু স্বরাজের স্বর শক্ত হয়ে উঠল: 'না, সে আর বৌদি না। সমস্ত সম্পর্ক শেষ কইর‍্যাই চইল্যা গ্যাছে এইখান থিকা—তবে আর কাঙালের

যতন গিয়া তারে সাধতে হইবো না। তরা যদি অপমান না ভাবস, আমার লম্মানে লাগে।'

ঠোঁট কাঁপতে লাগল স্বপ্নার। খাটের একটা কোণা ধরে রাখল এক হাতে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল তার। একখানা হাত রাখল কাঁধের ওপরে। স্বপ্না চোখ তুলল, দু চোখে জল ছলছল করছে তার।

'বুইন।'

বড়দার এমন গলা অনেকদিন শোনেনি স্বপ্না। চোখ দিয়ে টপ করে এক-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার।

'উঁ?'

'তর এ্যাকটা বিয়া দিমু ভালো দেইখ্যা। যেইখানে পলিটিকস্ নাই—ইডিয়োলজীর তর্ক নাই—যে তরে সুখী করতে পারবো, তবু সত্যিকারের' দাম দিতে পাববো—'

এবার কান্নাটা আর বাধা মানল না।

'না বড়দা, বিয়ায় কাম নাই আমার। আমি বেশ আছি।'

সেই সময় একটা শব্দ হল জানলার বাইরে। চমকে দুজনে তাকালো সেদিকে। জানলার রেলিং ধরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একটা মূর্তি।

আনন্দ!

। চব্বিশ ॥

মা একটা ইডিয়ট—মা'র মাথায় কোনো বস্তু নেই—এই পরম আবিষ্কারটি সেকালের বি.এ. পাস আর দারুণ ইন্টেলেকচ্যুয়াল বাবা কখনো গোপন রাখতেন না। বরং আরো রসিয়ে বলতেন: শী ইজ্ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল—হু ডিলাইটস্ ইন্ কুকারী। অথচ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নিজে যে বিন্দুমাত্রও উদাসীন ছিলেন তা নয়—বরং ভালো-মন্দের ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহী থাকতেন, মাছের কালিয়া কিংবা ভুনি খিচুড়িতে একটু এদিক-ওদিক হলেই এই দারুণ বুদ্ধিজীবীর ধৈর্যচ্যুতি হত।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তখন। তাদের সামনেই পরিষ্কার আর নির্লজ্জ ভাষায় বলতে পারতেন: 'আশ্চর্য আমার ট্রাজিডী! সারাটা জীবন ঘর করতে হল একবস্তা রাবিশের সঙ্গে!'

দিদি এদিক থেকে ষোলো আনা বাবার মেয়ে। কিংবা আঠারো আনা। কলেজে পড়বার সময় তার ঝাঁঝে বাবা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে উঠতেন।

'কী যে করো মা সারাটা দিন বসে বসে! এতবার বললুম, আমার শাড়িটা একটু ইস্ত্রি করে রেখো—তোমার মাথায় কী কিচ্ছু ঢোকে না?'

কাজটা এমন অসাধ্য দিদির পক্ষেও নয়। কিন্তু বিনে মাইনের এমন আশ্চর্য নীরব একটি ঝি থাকতে দিদি এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে কেন হাত দিতে যাবে।

বাবা চলে গেলেন, টুলু হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল একেবারে মুক্ত পুরুষ হয়ে। দিদি একবার আগুন হয়ে এসে মাকে যা নয় তাই বলে গেল।

'তুমি কী। এ-রকম ব্রিলিয়্যান্ট ছেলেটা একেবারে বখে গেল তোমার চোখের সামনে?'

'যদি কথা না শোনে—'

'কথা না শোনে!' প্রায় পাড়া কাঁপিয়ে দিদি চিৎকার করে উঠেছিল: 'কথা শোনাতে হয়, মা-বাপের সেইটেই রেসপনসিবিলিটি। তোমার যদি ব্রেন বলে ছিটেফোঁটাও বস্তু থাকত, তা হলে টুলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ-ভাবে? ট্রেনিং দিতে হয়—ছেলেমেয়েকে হাতে করে গড়তে হয়। কী আর বলব, বাবাই তোমাকে ঠিক চিনেছিলেন। তুমি একেবারে অপদার্থ—টোট্যালী হোপ্‌লেস্!'

এবং কী আয়রনি—আজ সেই দিদি মা-র বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

'আমার টিনটিন—মা, আমার টিনটিন কোথায় গেল?'

দু চোখভরা ভয় আর বিবর্ণ মুখ নিয়ে মা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন সাধ্যমতো। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হল প্রবীরের।

মা বলছিলেন, 'ছেলেমানুষ, কোথায় যাবে আর? ওর কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে আছে হয়তো। বকাবকি করেছিলি নাকি?'

উমা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, এবারে শক্ত হয়ে গেল।

'একটু কড়া শাসন করেছিলুম মা—', কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই সে থামল। ওইটুকু মেয়ে অতিরিক্ত বীয়ার খেয়ে প্রায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে আর সেই জন্যে সে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে তাকে মারতে গিয়েছিল, এ-কথাটা মার কাছে বললে মান থাকে না।

মা বললেন, 'ছেলেপুলেকে কি অত বেশি শাসন করতে আছে রে?'

এটা সময় নয় এবং ঠিক এই মুহূর্তে খুবই অন্যায়—তবু প্রবীর দারুণ কৌতূহল

বোধ করল একটা। উমা কী করবে এবার? নিশ্চয় ফণা তুলবে, ফোঁস করে বলে বসবে: তুমি থামো, ছেলেমেয়ে মানুষ করার উপদেশ তোমার মতো নির্বোধের কাছ থেকে নিতে চাই না আমি—ও ব্যাপারে স্পেশ্যাল ট্রেনিং আছে আমার। কিন্তু দিদি কিছুই করল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আবার।

মা বললেন, 'ওর বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলি?'

'ও যাদের কথা বলত, যারা ওর সঙ্গে আসত, সব জায়গায় তো গিয়েছি।'

'তার বাইরেও তো থাকতে পারে।'

উমার মুখে একটু আলো ফুটল কি ফুটল না: 'তা অবশ্য পারে। কিন্তু—'

'কেন এত ব্যস্ত হচ্ছিস মা? ছেলেমানুষ—কোথায় আর যাবে? ভালোই আছে কোথাও—আজ রাত্রে কিংবা কাল সকালেই এসে পড়বে। মণীশ আর টুলু তো খুঁজতে বেরিয়েছে।'

'তা বেরিয়েছে। আমাদের নেবার দাশগুপ্তের গাড়িটা নিয়ে। আর আমি তো সেই থেকে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি মা। কোথাও না পেয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এলুম—যদি এখানে এসে থাকে!'

টিনটিন আসবে মামার বাড়িতে? উচিত নয় এখন, সময়ও নয়—তবু প্রবীরের মনে হল কিরকম সিনিক হয়ে যাচ্ছে সে—হাসি পাচ্ছে তার। দিদির সঙ্গে টিনটিন এ বাড়িতে বছরে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। আর এলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে থাকে: 'মাম্মী, যাবে না?' খারাপ লাগবার কথাই। গল্প করবার মতো বন্ধু নেই—পুরনো একটা গ্রামোফোন আছে অথচ রেডিওগ্রাম নেই, 'পপ' গানের রেকর্ড নেই, এমন কি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাবার মতো ফ্রীজ পর্যন্ত নেই!

একটা ছবি চোখে এল। যদি তার দেখবার ভুল না হয়ে থাকে—এবং চোখে চশমা থাকা সত্ত্বেও, উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, পার্ক স্ট্রীটে—রাস্তার নিয়ন আর চারদিকের ঝকমকে আলোর ভেতরে ভুল হওয়ার কারণ নেই বিন্দুমাত্র—রাত সাড়ে আটটা নাগাদ—কাউবয়-মার্কা পোশাক-পরা একটা ছোকরার হাত জড়িয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যে হাঁটছিল সে টিনটিন ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

একবার ডাকবে কি না ভেবে প্রবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটি পত্রিকার স্টল থেকে একখানা বিদেশী কাগজ নির্বাচন করছিল ছেলেটি—তার রঙিন কভারের ছবিটি এবং এস-ই-এক্স জাতীয় একটি নামও যেন দেখা যাচ্ছিল এত দূর থেকে—মানে, টিনটিনের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বোঝাই হয়ে উঠছিল এই বয়েসেই।

ব্যাক-নাম্বার আর · ইউনিয়ন করা প্রবীর ধাক্কা খেয়েছিল একটা—তারপর নিজেই সরে গিয়েছিল। প্রথম প্রেরণা যেটা জেগেছিল সেটা হল দ্রুত রাস্তা পার হয়ে—ওই ফুটপাথে গিয়ে টিনটিনের কান ধরে ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক থাপ্পড় দেওয়া, তারপর মাথার আধছাঁটা চুল ধরে টানতে টানতে সোজা দিদির কাছে এনে জিম্মা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল এ-ও বোধ হয় জুভেনাইল সাইকোলজিতে স্পেস্যালিস্ট্ দিদির একটা স্পেশ্যাল ট্রেনিং—মানে গোড়া থেকেই ছেলেপুলেকে সবরকম জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়াটা ভালো।

তারই মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতায় এগুলো অসহ্য, সুতরাং অনধিকার-চর্চা না করে সে-ই জোর পায়ে সরে গিয়েছিল—টিনটিন তাকে দেখবার আগেই।

এখন স্বচ্ছন্দে বলা যায়: 'দিদি, খাঁচার দরজা তো খুলেই রেখেছিলি, মিথ্যে দুঃখ করবার কী আছে? তোর সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট কমপ্লীট হয়েছে।'

কিন্তু বলা যায় না—কিছুতেই বলা যায় না এখন। দিদি কাঁদছে আর নিতান্ত ইডিয়ট মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাকে।

মা বলছিলেন, 'চলে আসবে—আজকেই চলে আসবে। বোকা মেয়ে তো নয়—অত চিন্তা করিসনি। কিংবা মণীশ আর টুলুই নিয়ে আসবে ওকে।'

'কলকাতা এখন আর শহর নেই মা—' দিদি ফোঁপাতে থাকল: 'একেবারে সুন্দরবন হয়ে গেছে। সেই জন্যেই তো এত বেশি করে ভাবছি। এই যুক্তফ্রণ্ট না কী হয়ে না—চারদিকে গুণ্ডা-বদমায়েস একেবারে স্বরাজ পেয়ে গেছে। আগেকার দিন হলে—' দিদির আত্মমর্যাদা আবার টনটনিয়ে উঠল: 'আমাদের যা সোর্স ছিল—যা ইনফ্লুয়েন্স ছিল—তাতে করে চীফ মিনিস্টারকে পর্যন্ত নড়িয়ে দিতুম। এখন আমাদের কথা শুনছে কে! যত ক্রিমিন্যালের পকেটে একটা করে লাল রুমাল। কাগজে যে-সব হরিড রিপোর্ট বেরুচ্ছে—মানে সকলের চোখের সামনে—চৌরঙ্গীর মতো জায়গায়—মোটর সুদ্ধু ভদ্রলোকের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেল, বলে গেল ক'দিন পরে ফেরত পাবেন। আমরা আছি কোথায়?'

প্রবীরের ঠোঁট নড়ে উঠল। মুখে এল হ্যাঁ—এ-সব খবর বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু পুলিস একটাও বোধ হয় কনফার্ম করেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দিদি বলবে: পুলিস? পুলিস বলে কিছু আছে নাকি? সব তো হুকুমের চাকর—পেটের দায়ে গুণ্ডাদের শেল্টার দিচ্ছে!

মা কেঁপে উঠলেন একবার।

'কী বলছিস এ-সব ? না না, ও সমস্ত কিছু হয়নি।'

দিদি ধরা গলায় বললে, 'আমার কোনো ভরসা হচ্ছে না মা—ইন্ দিস জাংগল্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল—এভরিথিং ইজ পসিবল—যুক্তফ্রন্টকে গদিতে বসিয়ে চারদিকে একটা স্যাংচুয়ারি খুলে দেওয়া হয়েছে—প্রোভিং প্রিডেটরস্ এভরি-হোয়্যার!' বলতে বলতে দিদি আবার জ্বলে উঠল: 'আসুক হারামজাদা মেয়ে একবার ফিরে—তারপর যদি বাংলা দেশের বাইরে একটা কড়া বোর্ডিং স্কুলে ওকে চালান না করি, তা হলে আমার নাম উমা ব্যানার্জীই নয়।'

রাগে-দুঃখে সত্যি-সত্যিই দিদির মাথার ঠিক নেই—নইলে কুমারী পদবী ব্যানার্জী মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত না, হারামজাদা শব্দটাও না। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটে একটা কাউবয়-মার্কা ছেলের হাত জড়িয়ে এবং বিদেশী একটি বিশেষ পত্রিকার ভেতর দিয়ে যে সংস্কৃতির চর্চা ওইটুকু মেয়ে টিনটিন করছিল, সেটা আর যারই হোক—যুক্তফ্রণ্টের অবদান নয়।

কিন্তু এখন এ-সব বলা যায় না। বলা যায় না যে, যে কুকুরকে মারতে হবে, তাকে সবরকম বদনাম দিয়ে দেগে দেওযাই ভালো। আর তা ছাড়া সুনাম রাখবার জন্যে নিজেদের চেষ্টাও তো অসীম—বিবৃতি, প্রতি-বিবৃতি—দলে দলে খুনোখুনি—চমৎকার ইমেজ তৈরি হচ্ছে নিজেদের!

মা বললেন, 'শান্ত হয়ে বাড়ি যা উমা। হয়তো গিয়ে দেখবি মেয়ে পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক মা—' দিদি আবার বাঙালী মতে বলে ফেলল: 'আমার বুকের ভেতরটা যে কি রকম করছে। টিনটিন যদি আজ ফিরে না আসে, তা হলে আমি সত্যি-সত্যিই হার্টফেল করব।'

মা বললেন, 'বালাই-ষাট। ভগবান আছেন, কিছু ভাবিসনি। ছাখ্‌ গে, হয়তো বাড়িতে—'

দিদি আর বসল না। লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'আঃ—তা যদি হয় মা—আমি চললুম।'

'দিদি ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিস মা। আমরাও তো স্বস্তি পাব না।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—' দিদি বেরিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে।

'চল্ দিদি, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে—' প্রবীর পেছনে পেছনে পা বাড়ালো: 'যদি কোনো দরকার হয়।'

'তা হলে তো বেঁচে যাই ভাই, আয়—আয়। আমি যেন সাগরে পড়েছি,

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—কিছু ভাবতে পারছি না।' তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর আলাপ আছে?'

'জ্যোতি বসু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ডেপুটি চীফ—পুলিস মিনিস্টার?'

'না—আমাকে তিনি চেনেন না।'

'যদি ওঁকে স্পেশ্যালি রিকোয়েস্ট করা যেত—'

'দেখা যাবে—কাউকে দিয়ে যদি বলাতে পারি।'

'চল ভাই—সেই চেষ্টাই করা যাক তা হলে। না হলে আমি গিয়ে তাঁর দরজায় ধর্ণা দেব, হিন্দুস্থান পার্ক তো দূরে নয়।'

'তুই অত ব্যস্ত হোসনি দিদি—ব্যবস্থা একটা হবেই।'

ভাই-বোন বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বাইরে থেকে মোটর ছাড়বার আওয়াজ উঠল।

এতক্ষণ মা মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন, এবার তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আর একটা কথা মনে হল, এত রাতে ভুলু ফিরে এল—ছেলেটা ছুটো খেয়েও গেল না।

কিন্তু টুলুও তো ফেরেনি। মেয়ে-জামাইয়েরও তো খাওয়া জুটবে না আজকে।

না—কোথাও নেই। হাসপাতাল নয়, থানা নয়, রেলস্টেশন নয়। চেনা, আধচেনা—নামশোনা—কোথাও টিনটিনের খবর নেই।

শুধু আশ্চর্য হল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের একটি মেয়ে। একটু ওপরের দিকে পড়ে।

'বাড়ি যায় নি? কেন—ও তো আপনাদের রাস্তার সামনেই স্কুল-বাস থেকে নামল।'

স্কুল-বাস থেকে নামল বাড়ির কাছে!'

'হ্যাঁ—সাড়ে চারটের সময়।'

'তা হলে—তা হলে বাড়ি থেকে তিনশো গজের মধ্যে সে গেল কোথায়?'

তার মা বললেন, 'মিস্টার নন্দী, মিথ্যে চিন্তা করবেন না। পাড়াতেই আছে কারো কাছে।'

মণীশদা কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে থেকে নেমে এল সেখান থেকে। তারপর

গাড়িতে উঠেই হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

'মণীশদা !'

'তুমি জানো না টুলু—ইয়ু কানট্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। মেয়েটা আমার দারুণ অভিমানী। ওর মা একটু বেশি শাসন করেছিল সেদিন—আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি—সেই অভিমানে ও নেমেই রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকে চলে গেছে, তারপর সুইসাইড্ করেছে লেকের জলে।'

দুঃখে মণীশদা না হয় বলতে পারে, কিন্তু টুলুর কাছেও ব্যাপারটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকল।

'বেলা সাড়ে চারটের পরে লেকের জলে ডুববে মণীশদা ? সে কি সম্ভব ? চারদিকে অত লোকজন থাকতে ? তা ছাড়া ও তো লাইফ সেভিং সোসাইটিতে সাঁতার শিখেছে। যে সাঁতার জানে, সে কি ইচ্ছে করে জলে ডুবে মরতে পারে কখনো ?'

মণীশদা ফোঁৎ ফোঁৎ করে রুমাল দিয়ে নাক মুছতে লাগলেন।

'ওর পক্ষে সব সম্ভব। ওই মায়েরই তো মেয়ে—যেমন মেজাজ, তেমনি জেদ।' মণীশদার কথায় দিদির ওপর একটা গভীর অনুরাগ ফুটে উঠল তা নয়: 'ও মেয়ের অসাধ্য কাজ নেই, সাঁতার জেনেও ও ডুবে মরতে পারে।'

তা হলে পারে। বেলা পাঁচটা নাগাদ—একগাদা লোকের চোখের সামনে—অদৃশ্যভাবে লেকের জলে ঝাঁপ দিতে পারে আর সাঁতার জেনেও হাত-পা গুটিয়ে একটুকরো পাথরের মতো তলিয়ে যেতে পারে।

মণীশদা আবার নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'লেক কতটা ডীপ হে ? ফুট চল্লিশেক—না ?'

'আমি বলতে পারব না।'

'তা হলে ডুবুরি নামিয়ে—' মণীশদা কেঁদে উঠলেন।

'আগে থেকেই এ-সব কেন ভাবছেন মণীশদা ?' টুলু আস্তে আস্তে বললে, 'একবার ডনের কাছে খোঁজ নেবেন ?'

'ডন ?' মণীশদা চকিত হলেন: 'ডন—ও ওর সেই বয়ফ্রেণ্ড! কিন্তু এ পাড়ায় কোথায়, সে তো থাকে উড স্ট্রীটের এক বাড়িতে।'

'সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে উড স্ট্রীটে যাওয়াটা কিছু শক্ত নয়।'

'কিন্তু—আচ্ছা—' নাক মুছতে মুছতে ভারী গলায় মণীশদা বললে, 'সোফার—জলদি চলো। হ্যাঁ—সোজা ল্যান্সডাউন ধরে।'

। পঁচিশ ।

স্বপ্না চমকে উঠল: 'ছোড়দা?'

স্বরাজ সহজভাবে বললে, 'আনু? ভিতরে আয়।' এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটা খুলে দিলে। আনন্দ আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল, দরজাটা বন্ধ করে দিলে সাবধানে। তারপর বললে, 'জান্‌লাডারেও বন্ধ কইর‍্যা দে স্বপ্না।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ। স্বরাজের বিছানার একপাশে বসে পড়ে আনন্দ চেয়ে রইল দেওয়ালের দিকে। লেনিনের ছবি, হো চি মিনের ছবি। পাশেই স্বরাজ আর সুজাতার বিয়ের পরের সেই বাঁধানো ফোটোটা। আনন্দ যেন নিজের মনে বললে, 'মাও সে-তুংয়ের একটা ছবি থাকলে—'

জ্বালাধরা একটুকরো হাসি হাসল স্বরাজ।

'তাঁরে রেভোলিউশ্যনের মহান নেতা বইল্যা কিছুমাত্র আপত্য নাই, সেই শ্রদ্ধা তিনি চিরডাকালই পাইবেন। কিন্তু তাঁরে তোমাগো চেয়ারম্যান না বানাইলেই—'

এবার আনন্দও হাসল। অনুকম্পার ভঙ্গিতে।

'বড়দা, তোমার পোলিটিক্যাল্‌ ট্র্যাডিশন আছে—ইণ্টেলিজেন্সও আছে বইল্যা জানি। কিন্তু তুমিও যখন জিনিসটার মানে না বুইঝ্যা শিয়ালগুলার সঙ্গে গলা মিলাও, তখন দুঃখ হয়!'

স্বরাজের চোয়াল কঠোর হয়ে উঠল। একটা ঝগড়া বাধতে যাচ্ছিল অবধারিতভাবে, বাধা দিল স্বপ্না। 'কী আরম্ভ কর্‌লা বড়দা! ছোড়দা এইভাবে বাড়ি আসছে, আর অখন তর্ক আরম্ভ কোর্‌লা?'

স্বরাজ যেন একটু লজ্জিত হল।

'ঠিকই কইছস্‌। নর্থ পোল—সাউথ পোল—এ তর্কের মীমাংসা এভাবে হইবো না।' তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি তার কোমল আর বিষণ্ণ হয়ে এল।

'শরীরডারে কী করছস আনু। তরে যে চিনন যায় না।'

'এটু কম চিনলেই ভালো বড়দা। পুলিসের চক্ষু এড়াইতে সুবিধা হয়।' চকিতের জন্যে নিজের মধ্যেও একটা কোমলতা অনুভব করল আনন্দ। আর এক বড়দাকে মনে পড়ল—যার জন্যে ছেলেবেলায় ভয়-বিস্ময়-ভালোবাসার একটা

মিশ্র বিচিত্র অনুভূতি ছিল তার নিজের মধ্যে। সে তখন রাজনীতি করত না, রাজনীতির কথাও ভাবত না—পরীক্ষায় ভালো করা ছাড়া আর কোনো স্বপ্নই ছিল না সামনে। তখন বড়দা দু'বার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেছে, অন্তত বার তিনেক অ্যারেস্ট হয়েছে।

মনে আছে, গ্রেপ্তার করতে এসেও সসম্মানে পুলিস অফিসার কথা কইত বড়দার সঙ্গে।

'একসকিউজ মী, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।'

বড়দা হাসত।

'ওয়ারেণ্ট দেখবার দরকার নেই, আমি তৈরিই আছি।' তারপর মা'র দিকে তাকিয়ে হাসত: 'আবার চললাম মা। কাইল অ্যাকটা স্যুটকেসে কইর‍্যা কয়ডা কাপড়-জামা পাঠাইয়া দিবা।'

সেই বড়দা। এখন পুরোপুরি একটা অ্যানার্কির জগতে চলে গেছে। এ-ই হয়। শোধনবাদ নয়া শোধনবাদের রাজনীতি এ ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যায় না। শেষ পর্যন্ত ব্লাইন্‌ড লেন। তখন হয় পার্লামেণ্টারী ডিমোক্র্যাসীর আশ্রয়, আর নইলে সম্পূর্ণ মানসিক পরাভব।

আনন্দর চিন্তার ধারাটা থামল। স্বপ্না।

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে স্বপ্না। মেয়েটা আশ্চর্য রকমের নরম, অত্যন্ত বেশিমাত্রায় ইমোশন্যাল। বাবা শক্ত, দাদা শক্ত, নিজের মুঠোর ভেতরে এখন বজ্রকে আঁকড়ে ধরবার মতো প্রবল সবলতা অনুভব করে আনন্দ; কিন্তু এই মেয়েটাই আলাদা—একেবারে ষোলো আনাই মেয়ে। দলের শুভশ্রীদিকে মনে পড়ল আনন্দর। নামের সঙ্গে কী তফাত—কী তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত চোখ। তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে, দুদিন খাবার জোটেনি, একটা গাছের ডালে হাত রেখে শক্ত সোজা হয়ে শুভশ্রীদি।

'কমরেড, এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে কাটায়। দু দিন উপোসী থেকে যদি ভেঙে পড়ি, তবে বিপ্লবী নামের যোগ্যই নই আমরা!'

আর ঠিক এই সময় স্বপ্না বললে, 'ছোড়দা, কিছু খাবি না?'

স্বপ্না একেবারেই মেয়ে, ষোল আনাই মেয়ে। শুভশ্রীদির সঙ্গে কোথাও মেলে না। বিপ্লবের কোনো কাজেই আসবে না কোনোদিন। তবু মমতার একটা তরঙ্গ ভেঙে পড়ল আনন্দর বুকের মধ্যে।

স্বরাজ ঘোষাল নয়, এক সময়ের বিখ্যাত ছাত্রনেতাও নয়, যে বড়দা ছেলেবেলায় তাকে ভালোবাসত, সে আস্তে আস্তে আনন্দর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কখন যে কি রকম হয়ে যায়, আনন্দর চোখ বুজে এল একবারের জন্যে, ইচ্ছে করল বড়দার বিছানায় হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে।

স্বরাজ বললে, 'খাওনের কী আছে—কী দিবি অখন ?'

'রুটি আছে খানকয়। ইলশা মাছ ভাজা আছে। বিকালে ও-বাড়ির মাসিমা দেওঘরের প্রসাদী প্যাঁড়া দিয়া গেছে কয়ডা—তাও আছে।'

মুহূর্তে নড়ে উঠল আনন্দ।

'না স্বপ্না, ওই প্রসাদ আমার চলবে না। রুটি আর মাছভাজা হইলেই হইবো। অনেকদিন ইল্‌শা মাছ খাই নাই।'

স্বরাজ হেসে ফেলল।

'প্রসাদের কথাডা কইয়াই মাটি কোরছস্ স্বপ্না, আমার ফায়ার ব্র্যাণ্ড্ ভাইডিরে আর ছোঁয়াইতে পারবি না ওই সব। আন্, আমি কই কি, প্রসাদের কথাটা ভুইল্যা দুইখান প্যাঁড়া খাইয়া ল। খাওনের ব্যাপারে প্রিন্‌সিপ্‌লগুলি এট্টু রিল্যাক্স্ কোরতে হয়।'

চাপা ঠোঁটে আনন্দ বললে, 'না দাদা, পারুম না। যেগুলিন বিশ্বাস করি না—সেইগুলি সম্পর্কে কোনো রিল্যাক্সেশন আমার পক্ষে সম্ভব না। ও প্রসাদ-ফ্রসাদে আমার প্রবৃত্তি হইবো না।'

স্বরাজ বললে, 'তরা যা অর্থোডক্স হইছস—'

'আদর্শের ব্যাপারে বিপ্লবীরে চরম অর্থোডক্স হইতে হয়। সেইখানে কোনো কম্‌প্রোমাইজ্ চলে না।'

'তাই বুঝি ? দরকার হইলেও না ? লেনিন কী কইছিলেন ? টু ট্যাক্‌টিক্‌সে - '

'লেনিনের মিসইন্টারপ্রেট্ কইর‍্যা প্রোলিট্যারিয়ান রেভোল্যুশনের দফা তোমরা শ্যাষ কইরা আনছ।'

স্বরাজ সামলে নিলে। অনেক কষ্টে।

'নাঃ, তর লগে আর তর্ক করুম না। যা স্বপ্না, রুটি আর মাছভাজাই আন্। প্যাঁড়া খাওন অর কপালে নাই, তুই আর কী করবি ?'

স্বপ্না বললে, 'আমি যাইতাছি। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা কইর‍্যা থাকবা দুইজনে। আবার তর্ক বাধাইবা না।'

আনন্দ একটু হাসল : 'না—তর্ক করবার কিছু নাই।'

একটু চুপ। বাইরে ঘাসে ঝিঁঝির ডাক। রাস্তার ইলেকট্রিকের আলোয় গাছের পাতা কাঁপছে। অনেক রাত।

তর্ক নয়, উত্তেজনা নয়, একটা বিষণ্ণতা ছড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। স্বরাজ দেখছিল, কী কালো হয়ে গেছে আনন্দ। চোয়াল দুটো উঠে পড়েছে, চোখের কোলে অন্ধকার। আজ কখন খেয়েছে কিংবা আদৌ খেয়েছে কি না সন্দেহ। অথচ এই ছোট ভাইটা চিরকাল একটু বেশি আদর পেয়েছে, কোনোদিন খিদে সইতে পারত না, মাথার বালিশ নরম না হলে ঘুমুতে পারত না সে।

কিন্তু সময় বদলায়—কী আশ্চর্যভাবে মানুষ বদলায়। যে রাজনীতির পথে আনন্দ কোনোদিন চলবে বলে কখনো কল্পনা করা যায়নি, আজ সেই পথে সে ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে ছুটেছে, আর যে স্বরাজ ঘোলা জলের কাজে জলের ভেতরে মাছের মতো রাজনীতি ছাড়া নিজের কোনো অস্তিত্বই ছিল না—সেই আজকে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। এখন সে গলা তুলে বলতে পারে : আহ হে পলি-টিক্‌স—হিউম্যানিটি ইজ ডুমড্—আন্ক গাড ওয়ার্লড ওয়ার—পড়ুক কটা অ্যাটম বোমা—অল দি ওয়রিং ক্যাম্পস্—ক্যাপিটালিস্ট কমিউনিস্ট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট—সব একসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাক।

সন্দেহ নেই, চূড়ান্ত নৈরাশ্যবাদীর মতো সে দিনের পর দিন মানসিক অবসাদে ভুগছে। অথচ আনন্দ দাঁড়িয়ে উঠেছে উদ্যত তলোয়ার হয়ে—জ্বলছে। জ্বলুক—আঘাত করুক—বদলে দিক ইতিহাস। কিন্তু ওদের পথ দেখাচ্ছে কারা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যদি শেষ পর্যন্ত ভুলের খেসারত দিতে হয়—তা হলে তার পরিণামটা এত বীভৎস রকমের নিষ্ঠুর যে, বাংলা দেশের রাজনীতি তা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

তার সামনে আনন্দ। দুদিন বাদেই রাজবন্দী হয়ে বেরিয়ে আসত। যদি বিপ্লবের আহুতি হয়, একবিন্দু দুঃখ হবে না, যদি অজ্ঞানের বলি হয়, তবে প্রতিটি ভুলের জন্যে ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আনন্দর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল স্বরাজের। কিছু একটা ভাবছে আনন্দ। অন্যমনস্ক চোখ স্থির হয়ে আছে দেওয়ালে হো চি মিনের ছবিটার ওপর।

'আনু?'

'কী কও?'

'বাবা-মায়ের লগে দ্যাখা করবি একবার ?'

বিষণ্ণতা বোধ হয় আনন্দর মনেও জমা হচ্ছিল। একটা নিশ্বাস পড়ল তার।

'না, থাউক। কষ্ট দিয়া লাভ নাই।'

অন্য সময় হলে স্বরাজ বিদ্রূপ করে বলত: ওই সব বালাই অথনো আছে নাকি ? কিন্তু এখন ঘরের আবহাওযাটা বদলে গেছে। এখন একটা বেদনা। আনন্দর চেহারাটা খুব খারাপ হযে গেছে।

'বৌদিরে তো দেখি না দাদা—' আনন্দই কথা বলল আবার।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কটু স্বাদ সমস্ত মনটাকে ভরে তুলল।

'সে এইখানে নাই। বাপের বাড়ি গেছে।'

'শরীর সারল একটু ?'

'জানি না—', একবার দাঁতে দাঁত চাপল স্বরাজ: 'খুব পলিটিক্‌স্ করতাছে।'

'অ।' একটু হেসে আলোচনাটা এইখানেই থামিযে দিলে আনন্দ। সে নিজের ভেতরে অনেকটা তলিয়ে আছে এখনো, স্বরাজের মুখের চেহারা লক্ষ্য করল না, তার কথার ধরনটাও না। খুব সহজভাবে বললে, 'নীলুরে নিয়া গেছে ?'

'না—নীলু এইখানেই আছে। ঘুমাইতাছে স্বপ্নার ঘরে।'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর স্বরাজ ডাকল: 'আনু ?'

'কী কও ?'

'ট্রান্‌স্‌ফার নিয়া দিল্লী যাইতাছি।'

'মা-বাবারে ফেইল্যা যাবা ?'

'স্বপ্না দেখবো। তুই তো আর রেসপন্‌সিবিলিটি নিলি না।'

একবারের জন্যে ছায়া পড়ল আনন্দর মুখে। কিন্তু সে ভাবটাকে থাকতে দিল না বেশিক্ষণ।

'দাদা, সেই কথা কইয়া আর লাভ নাই।'

লাভ নেই, কারণ স্বরাজের কথায় যে জবাবটা দিতে হয়, সেটা এখন অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনাবে। স্বরাজ আবার মিনিটখানেক চেয়ে রইল আনন্দর দিকে, তার পর বললে, 'আনু ?'

'অ্যাঁ ?'

'যাবি আমার লগে ?'

'কই ?'

'দিল্লী।'

'ক্যান ?'

'কয়দিন রেস্ট্ নিয়া আসবি। এইখানে তো বিশ্রাম পাবি না একদিনও। তবে রেভেলিউশনারী লাইন ছাইড়্যা দিতে কই না—দিন কয়েক—'

আনন্দ হাসল।

'না দাদা, অখন না। সময় নাই।'

'এত কাজ ?'

'এতই কাজ।'

স্বরাজ থেমে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওদের থামবার সময় নেই। এখন ঝড়ের মধ্য দিয়ে চলছে। ইতিহাস না বদলালে ওরা থামতে পারে না। অনেক যুদ্ধ, অনেক মৃত্যু ওদের সামনে।

কিন্তু ওই প্রশ্নটাই ভোলা যায় না। আত্মবলি ? না—অজ্ঞানের বলি ?

আনন্দ বললে, 'দাদা, একটা কথা কমু ?'

'ক।'

'গোটা পনেরো টাকা দিতে পারবা ?'

'তর নিজের জইন্য হইলে নিশ্চয় দিমু।'

'যদি কই, আমাগো পার্টি ফাণ্ডে ?'

স্বরাজের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

'তাইলে এক পয়সাও দিমু না।'

আনন্দ হাসল : 'প্রিন্‌সিপ্‌ল ?'

'তাই। তুই তো প্রসাদের প্যাঁড়া খাইতে চাস নাই।'

হাসিমুখেই চুপ করে রইল আনন্দ। তারপর বললে, 'দাদা, একদিন বুঝ্‌বা। সেইদিন জানবা—এই গেরিলা যুদ্ধ আর কৃষক বিপ্লব ছাড়া পথ নাই।'

আই হেট পলিটিক্স্। আবার স্বরাজের মাথার মধ্যে সেই জ্বালাটাই জ্বলে উঠল। বললে, 'ঠিক আছে। যদি কোনোদিন বুঝি, রাইফেল নিয়া সঙ্গে দাঁড়ামু। কিন্তু অখন না। অখনও এই বিশ্বাস আমার যায় নাই যে, তরা চলছস অ্যাডভেঞ্চারিজ্‌মের পথ ধইর‍্যা। তাতে অ্যানার্কি আইবো, রিয়্যাক-শনারী ফোর্স আরো অ্যালার্ট হইবো, আর যাই আসুক, বিপ্লব আইবো না।'

খাবারের থালা নিয়ে স্বপ্না ঢুকল।

'অখনো ওই করতাছ তোমরা ?'

'না—এইখানেই ইতি। দেখি, কী আনছস। খুব ক্ষুধা পাইছে।'

শুধু রুটি আর মাছভাজা নয়, একটু তরকারীও এনেছে স্বপ্না। আজকের একটু বাড়তি রান্না, কালকের জন্যে তোলা ছিল।

আনন্দ খেতে লাগল। তার খাওয়ার দিকে চাইতে পারল না স্বরাজ, সরে এল ঘরের আর এক পাশে। স্বপ্নার চোখে জল আসছিল।

'ছোড়দা ?'

'কী কস ?'

'দুধ আনুম একটু ?'

'দুধ খায় পোলাপানে। আজ মাছভাজাটা ফার্স্ট ক্লাস লাগ্‌তাছে।'

'আনি আর খান দুই ?'

'পাগল। অখন আবার অনেকখানি দৌড়াইতে হইবো। বেশি খাইলে আইলসামি ধোরবো—ওই সব বড়লোকী পোষায় ?'

'ছোড়দা, থাইক্যা যা রাত্তিরে।'

'না, থাকনের জো নাই—' খেতে খেতে আবার অন্যমনস্ক হল: 'অ্যাকটা কথা কই। কয়দিনের ভিতরেই অনেক দূরে চইল্যা যাইতাছি—করে আসুম, আর কোনোদিন আসুম কি না জানি না।'

স্বরাজ ফিরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

'কী কইলি ? কই যাবি ?'

আনন্দ হাসিমুখে এড়িয়ে গেল জবাবটা। তারপর হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে বললে, 'এই, কয়টা বাজল রে ?'

স্বপ্না বললে, 'সোয়া এগারোটা হইবো।'

'সোয়া এগারোটা !' বিদ্যুদ্বেগে এক গ্লাস জল গিলল আনন্দ, তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'ঈশ্‌—খুব দেরি হইয়া গেল। জরুরী কাজ আছে একটা—চললাম।'

আর অপেক্ষা করল না। একটা সম্ভাষণও করল না আর। দরজা খুলে নেমে পড়ল বাইরের ঘুমন্ত রাত্রির ভেতরে।

স্বপ্না কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, স্বরাজ বললে, 'চুপ, করস কী ? লোক জাগাবি নাকি পাড়ার ?'

মুখে আঁচল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্বপ্না। আনন্দর আধখাওয়া

থালাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বরাজেরও চোখ ঝাপসা হল, মনে হল পনেরোটা টাকা ওকে দিলেই হত।

॥ ছাব্বিশ ॥

ডনের বাবা নেমে এলেন। খুব খুশি হয়ে নয়। রাত সোয়া দশটার কাছাকাছি, বোধ হয় শোবার উদ্যোগ করছিলেন ভদ্রলোক।

কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বড় চাকরি করেন। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। উজ্জ্বল চোখ, চওড়া কপাল। আপাতত কপালটা একটু কুঁচকানো।

মণীশদাকে চিনতেন না, কিন্তু টিনটিনকে অবশ্যই দেখেছেন। এ স্মল, প্রেটি গার্ল। হাঁ, তাঁর ছোট ছেলে ডনের বন্ধু। কয়েকবার এসেছে তাঁর ফ্ল্যাটে। বলেন—দ্য গার্ল ওয়জ সুইট।

না, তাঁর এখানে তো টিনটিন আসে নি।

ডন? ডন তো কলকাতায় নেই। তিনদিন ধরেই নেই। তাঁর বড় ছেলে জামশেদপুরে এনজিনীয়ার, টিসকোতে। সেখানে বেড়াতে গেছে সে।

খবর এই পর্যন্তই।

অসময়ে ভদ্রলোককে বিরক্ত করা হল, এজন্যে তিনি যেন মার্জনা করেন। না না, সেকথা কেন আসছে? মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না—উৎকণ্ঠা তো খুবই স্বাভাবিক। অ্যাণ্ড দিজ ডেজ ইন্ হিয়ার—ইন ক্যালকাটা। মণীশদার কথারই পুনরুক্তি করলেন: অ্যাট টাইমস্ ইয়ু থিংক—ইয়ু আর লিভিং ইন এ স্যাংচুয়ারী। যাই হোক, টিনটিনকে পাওয়া গেলে তাঁকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়। তিনিও খুব চিন্তিত থাকবেন। দ্য গার্ল ইজ ভেরী সুইট অ্যাণ্ড এ প্রেটি ওয়ান।

তারপর গাড়িতে ফেরা। কিছুক্ষণ দু পাশের ঘুমন্তপ্রায় নৈঃশব্দ্য প্রাচীর ঘেরা সাহেবী আমলের বড় বড় বাড়ি থেকে পুরনো গাছের ছায়াপথের ওপর। কলকাতায় অবাক-লাগানো এক-আধটা জোনাকির হঠাৎ সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিয়নের আলোয় হারিয়ে যাওয়া। আর মোটরের চলা। মোটরের শব্দ।

মণীশদা কিছুক্ষণ গুম। তারপরেই আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েলি ধরনের কান্নার পালা

'মেয়েটা ঠিক সুইসাইড করেছে টুলু। লেকেই। আমি বাড়ি গিয়ে—'

বলতে বলতেই থেমে গেল। ভাঙা গলায় আর একটা সুর বেরুল এবার।

'কিন্তু ফায়ারব্রিগেডে ফোন করেই বা কী করব? মরা মেয়েটাকে জলের তলা থেকে টেনে তুলবে, এই তো? সেও কি আমি সইতে পারব? আর তোমার দিদি—তোমার দিদি তো পাগল হয়ে যাবে।'

পাগল হয়ে যেতে কারই বা বাকী আছে, টুলু ভাবল। দুশ্চিন্তা হতে পারে, যন্ত্রণা হতে পারে—সবই স্বাভাবিক, দিদিকে বোঝা যায়। কিন্তু মণীশদা—এমন ধুরন্ধর অ্যাটর্নি হয়ে এত বেশি এগিয়ে না ভাবলেও পারত। লেক ছাড়া আর কি জায়গা নেই পৃথিবীতে? টিনটিন ছেলেমানুষ হতে পারে, কিন্তু আদৌ বোকা নয়। মণীশদা যাদের জানেন, তাদের বাইরেও বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে তার, বালিগঞ্জে লুকোনোর মতো একটা জায়গার অভাব নাও ঘটতে পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা চরম ভাবনা না ভাবলেও বোধ কবি চলে।

টুলু আস্তে আস্তে ডাকল: 'মণীশদা?'

'অ্যাঁ?'

'এমনও তো হতে পারে—'

'কী হতে পারে!' শেষ করার আগেই মণীশদা মুখ থেকে কেড়ে নিলে কথাটা।

'ডন তো জামশেদপুরে চলে গেছে।'

'সে তো তিন দিন হল।' ভাঙা গলায় মণীশদা বললে, 'তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী?'

'এ তো হওয়া সম্ভব যে টিনটিন তার কাছেই চলে গেছে। আমাকেও বলেছিল, ডন তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

'একা চলে যাবে জামশেদপুরে?' মণীশদা বললে, 'এখান থেকে হাওড়ায় চলে গিয়ে, তারপরে ট্রেনে চেপে? অত সাহস হবে ওর?'

টুলুর হাসি পেলো। যে মেয়ে ওভাবে পালাতে পারে, তার পক্ষে এ কাজটা একেবারেই অসম্ভব?

বললে, 'ঝোঁকের মাথায় সব পারা যায়।' নিজের কথা মনে পড়ে গেল তার, সেও তো একবার অল্প বয়সে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে কৃষ্ণনগরে পালিয়ে গিয়েছিল মাসীমার বাড়িতে।

মণীশদা আবার বললে, 'ট্রেনের ভাড়াও তো আছে। টাকা পাবে কোথায়?'

'হাতখরচ থেকে জমাতে পারে, ওর কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিতে পারে।'

'রাইট।' মণীশদা তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল: 'তা হলে আবার যাওয়া যাক ওদের ফ্ল্যাটে।'

'সেটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক বোধ হয় এতক্ষণে—'

পাগল ক্ষেপিয়ে দিলে যা হয়। শুনেই জ্বলে উঠল মণীশদা।

'শুয়ে পড়েছেন তো কী হবে? ওঁর ছেলে আমার মেয়েকে কিড্ন্যাপ করে নিয়ে যাবে, আমি রাস্তায় রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াব আর উনি নিশ্চিন্তে ঘুমুবেন? অল রাইট, আগে যাব পার্ক স্ট্রীট থানায়, কমপ্লেন লজ করব, পুলিস সঙ্গে নেব—' মণীশদার উত্তেজনার পর্দা চড়তে লাগল: 'অ্যাণ্ড আই হ্যাভ গ্রেভ ডাউট্স্—হয়তো ডন মোটেই জামশেদপুরে যায় নি, ওই বাড়িতেই মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে।'

টুলু বিব্রত বোধ করল। পুলিসের ব্যাপারে সে আর যেতে চায় না—থানায় একটি-দুটি রাত্রিবাসই তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। এবং কে জানে, থানার কেউ তাকেই বলে বসবে কিনা: তুমি একজন মস্তান না? লেকের দিকে তোমাকে তো ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

কাতর হয়ে টুলু বললে, 'আগেই অতটা করে বসবেন? যদি সত্যিই বাড়িতে না পাওয়া যায়, যদি ডন তিন দিন আগেই জামশেদপুরে চলে গিয়ে থাকে? তা হলে ভদ্রলোক রাগ করে—'

মণীশদা একটু সচেতন হল। বাস্তবিক। ডনের বাবা যে-কেউ নন, উড স্ট্রীটের বনেদী পাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন, বড় অফিসার, রাশভারী চেহারা, চাপা ঠোঁট। মিথ্যে একটা নোংরা কমপ্লেন করে তাঁর বাড়িতে পুলিস ঢোকালে তিনি যে মানহানির মামলা করবেন না, একথা জোর করে বলা যায় না। মণীশদার অ্যাটর্নিসুলভ বুদ্ধি একটু সজাগ হল এবার।

'হু।' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিন্তু ডনের জামশেদপুরের ঠিকানাটা তো পাওয়া দরকার।'

'সেটা কাল—'

'কাল!' মণীশদার চোখে আগুন ছুটল: 'আমার এই অবস্থায় কাল পর্যন্ত আমি বসে থাকব?'

'তা হলে বাড়িতে গিয়ে একটা ফোন করা যায়।' ভয়ে ভয়ে টুলু জানালো।

মণীশদা আবার একটু গুম হয়ে রইল। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে ক্লান্তও বোধ করছিল একটু। বললে, 'আচ্ছা, তবে তাই।'

ওদিকে—সে-সময়, ভুলু—অর্থাৎ প্রবীর আর একটা চাকরি করছিল।

দিদিকে নিয়ে তো বাড়িতে আসা হল। এবং—না, টিনটিন ফেরে নি।

তারপরে দিদি যে কাণ্ড আরম্ভ করল, তা ধারণারও বাইরে। মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার।

'আমাকে এক্ষুণি নিয়ে চল জ্যোতি বসুর বাড়িতে—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে সে ভদ্রলোক এই মুহূর্তেই যথেষ্ট বিব্রত, তাঁর কাছে গিয়ে এখন হানা দেওয়া উচিত কি না এবং দিলেও দেখা পাওয়া যাবে কি না এসব বাস্তব সমস্যার কথা ভাবতে হল প্রবীরকে।

'দিদি, এমন করছিস কেন? মণীশদা তো এখনো ফেরেন নি।'

কে কার কথা শোনে। দিদি দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করল। জুভেনাইল সাইকোলজীতে তার অগাধ জ্ঞান এবং সে একেবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান মানুষ করে থাকে—তাকে দেখে এই মুহূর্তে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

প্রবীর ভাবছিল, এর চেয়ে দৌড়ে এখান থেকে পালানো ভালো। কিন্তু সেও অসম্ভব। অন্তত নিজের বোন—নিজের ভগ্নী। তাকে এই সংকট থেকে বাঁচালেন পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস দাসগুপ্ত এসে। একটু বয়স্কা মহিলা, কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সহৃদয়া। তিনি এলেন সান্ত্বনা দিতে, তাঁর সঙ্গে আরো কারা সব মেয়েরা এসে গেলেন।

ভালোই হল। এ অবস্থায় মেয়েরাই সান্ত্বনা দিতে পারেন।

'ভুলু, তুই একটু রাস্তায় দাঁড়া। যদি টিনটিন এসে পড়ে, যদি ওরা সঙ্গে করে তাকে নিয়ে আসে—'

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল প্রবীরের। এর চাইতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও সুখকর।

রাত বাড়ছে। ঘরে ঘরে আলো নিভছে, পথের আলো জোরালো হয়ে উঠছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছিল, মনে পড়ল মনটা ভালো ছিল না, সুজাতাকে দেখেছিল ময়দানের মিটিঙে—সাবিত্রীর কাছে গিয়েছিল। বাড়ি

ফিরেই দিদির এই ব্যাপারটা।

সকালে উঠেই বিস্বাদ খবরের কাগজ। সংকট বাড়ছে—বাড়ছেই। বক্তৃতা—প্রতি-বক্তৃতা। বিবৃতি—প্রতি-বিবৃতি। ফসলের মাঠে ভ্রাতৃঘাতী রক্ত। এর প্রয়োজন ছিল? হয়তো ছিল। ইতিহাস জানে।

একটা গাড়ি এসে থামল, চকিত হল প্রবীর। আচ্ছন্নের মতো নামল মণীশদা, শুকনো মুখে টুলু। জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল না, টিনটিনের খবর মেলে নি। একবারের জন্যে মণীশদার মুখ উদ্ভাসিত হল একটু।

'তুমি এখানে? টিনটিন ফিরেছে?'

দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব দিল না।

'দিদি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল টিনটিনকে খুঁজতে।'

'ওঃ!' দুর্বল পায়ে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে মণীশদা ফিরে দাঁড়ালো একবার, একটু ইতস্তত করল।

'তোমার দিদি কেমন আছে এখন?'

'অন্য মেয়েরা সব রয়েছেন দিদির কাছে।'

একটু চুপ করে রইল মণীশদা। তারপর বললে, 'তোমরা দু ভাই তো অনেকক্ষণ রইলে, আর থেকে কী করবে। রাত অনেক হয়ে গেল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো এবার।'

'যদি কোনো দরকার হয় মণীশদা—'

'খবর দেব, ভুলু। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেল, এখন তো বাস পাবে না আর। আমার ড্রাইভার বোধ হয় এখনো আছে, তাকে বলি—তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব মণীশদা, সে জন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু আমি বলছিলুম, টুলু ফিরে যাক—আমি বরং রাতটা এখানে থাকি।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না ভুলু, তোমার দিদি আজ সারারাত ঘুমোবে না, তোমাদেরও ঘুমুতে দেবে না। শুধু শুধু কষ্ট করবে কেন! বললুম তো, সে রকম দরকার হলে আমি তোমাদের খবর দেব।'

'মুরারি হালদার মশাইকে যদি একটা ফোন করেন—উনি আমাদের মেসেজ দেবেন। হালদার এম-সি, থাঁ ট্যাক্স রোড—'

'সে আমি দেখে নেব—' সিঁড়ির দিকে আড়ষ্ট পায়ে এগোতে লাগল মণীশদা: 'আচ্ছা, এসো তোমরা—'

দু ভাই একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরে থাকা উচিত? প্রবীরের মনে হল, না—চলে যাওয়াই ভালো। বেদনার একটা স্তর আছে—যখন নিজের মধ্যে তাকে আর রাখা যায় না, উপচে পড়ে, আকুল আর অসহায় হয়ে যায়—আরো অনেককে তখন তার ভেতরে টেনে আনতে চায়, সান্ত্বনা খোঁজে ও তারপর আসে নিজের সময়—একান্তে সেই দুঃখকে নিয়ে বসা, তখন সেখানে বাইরের কাউকে দরকার হয় না, এমন কি সহ্যও করা যায় না।

বিকেল থেকে এতক্ষণ ওদের ঝড়ের মতো কেটেছে। এইবারে—সারাটা রাত ধরে যেমন করে একটানা ক্লান্ত বৃষ্টি পড়তে থাকে, তেমনি করে দুজনের সময়। এখন চলে যাওয়াই ভালো।

টুলুকে বললে, 'চল।'

টুলু ঘাড় নাড়ল। তার আপত্তি নেই।

দু'ভাই চলতে আরম্ভ করল। লেকের দিকে শ্মশানের নীরবতা। উদ্বাস্তু কুটিরগুলোর আলো কখন নিভে গেছে, আলো-আঁধারিতে দুলছে গাছপালার সার—একটা চাঁদের টুকরো ঝুলে আছে দক্ষিণায়নের আকাশে। বিশাল সাদার্ন অ্যাভিনিউতেও নীরবতা—বড় বড় বাড়িগুলোতে ঘুম, রাস্তায় নির্জন আলো—এক-আধটা মোটরের দ্রুতগতি। একটা হরিধ্বনির রোল উঠছে। কে যেন চলল কেওড়াতলার দিকে।

ক্লান্ত পায়ে দু'ভাই এগোচ্ছিল। ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর বললে, 'গোল পার্কের কাছে গেলে পাব ট্যাক্সি।'

'সাউথ-এণ্ড পার্কের মুখেও স্ট্যাণ্ড আছে। ওখানে ট্যাক্সি প্রায় সব সময়েই থাকে।'

যেখানে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়ি এদিকের সমস্ত নতুন ঐশ্বর্যের ভেতরেও পোড়োমহলের মতো পড়ে আছে—ভরে আছে জঙ্গলে আর আগাছায়, যার আশেপাশে কটা চা ইত্যাদির দোকান গড়ে উঠেছে হয়তো জবরদখলেই, তার পাশ দিয়ে একটা ছোট নির্জন রাস্তা ধরে ওরা চলছিল গড়িয়াহাট রোডের দিকে।

সেই সময় তারা তিনজন এল।

ওদের জন্যে হয়তো অপেক্ষা করছিল না। হয়তো অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হঠাৎ পাওয়ার এমন সৌভাগ্যকে কে ছেড়ে দেয় হাতের মুঠো থেকে।

'এই যে মা—টুলে!'

না—কার্তিক ছিল না। ছিল সে, কার্তিকের কাছ থেকে মার খেয়ে যে ছুটে পালিয়েছিল, বলেছিল, 'আচ্ছা—আচ্ছা—দেখে নেব।'

টুলু চিৎকার করে উঠল: 'দাদা—দাদা, গুণ্ডা!'

তার আগেই ছোরা ঝলকে উঠেছিল একটা। সেটা নামবার আগেই প্রবীর এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলে ছেলেটার মুখে। টলতে টলতে হাত কয়েক পেছিয়ে গেল সে। সেই সুযোগে এক ধাক্কায় টুলুকে দূরে সরিয়ে দিলে প্রবীর।

টুলু চিৎকার ছাড়ল: 'গুণ্ডা—গুণ্ডা—হেল্‌প্—'

ছোরা আরও ছিল। পাশ থেকে আর একজনের অস্ত্র এসে বিঁধল পাঁজরে। একবার—আর একবার।

'গুণ্ডা—খুন—খুন—'

চিৎকারে নির্জনতা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। পাঁজরে হাত দিয়ে টলতে টলতে প্রবীর বসে পড়ল ফুটপাথের ওপর। হাতের আঙুল ছাপিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত, প্রবীর শুয়ে পড়ল এবার।

'দাদা—দাদা—দাদা—'

ছোরা টুলুর ওপরেও আসছিল, কিন্তু এবারেও বেঁচে গেল সে। চায়ের দোকানের দিক থেকে কারা যেন কোলাহল তুলছে। কোত্থেকে তীরবেগে আসছে পুলিস ভ্যান।

ছেলে তিনটে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল রাত্রির ভেতরে।

॥ সাতাশ ॥

তিনটি স্ট্যাবিং উণ্ড সবসুদ্ধ। বাঁ দিকের পাঁজরার ঘা-টাই ফেটাল হতে পারত, আধ ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। দেখা করতে দিলে দিন চারেক পরে।

না, ভয়ের আর কিছু নেই। তবে প্রচুর রক্তক্ষয়। একটু সময় লাগবে সেরে উঠতে।

সেই ভালো মানুষ, নিতান্তই বাঙালী ঘরের মা—বাবা যাকে ইডিয়ট বলে মনে করতেন—কান্নায় ফেটে পড়লেন ছেলেকে দেখতে এসে। অনেক কষ্টে

নার্স তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে গেল। টিনটিনের এখনো খবর পাওয়া যায় নি, দিদির দিন কাটছে প্রায় পাগলের মতো—সে এল না, তার আসবার কথা মনেও পড়ল না কারুর। মণীশদার অবশ্য কর্তব্যে ত্রুটি হল না, শুকনো মুখ, বসা চোখ আর রুক্ষ চেহারা নিয়ে সে দেখতে এল একবার।

'কেমন বোধ করছ ভুলু?'

সর্বাঙ্গে স্টিচ, ব্যাণ্ডেজ আর যন্ত্রণা নিয়েও প্রবীর নিজের কথা ভুলে গেল:

'এ কি চেহারা করেছেন মণীশদা?'

'আমি ঠিক আছি ভুলু, আমি ঠিক আছি। কিন্তু তোমার দিদি—জায়গাটা নিতান্তই হাসপাতাল বলে মণীশদা ডুকরে কেঁদে উঠলেন না: 'তাকেও বোধ হয় আর রাখতে পারব না। টিনটিন—আমি জানি, শী ইজ অলরেডি ডেড্—অভিমানে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু তোমার দিদিও আর বাঁচবে না।'

পেটে, পাঁজরে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ক্ষীণ গলায় প্রবীরকে সান্ত্বনা দিতে হল: 'আপনি ভাববেন না মণীশদা—দু-চার দিন অপেক্ষা করুন, টিনটিন ঠিক ফিরে আসবে।'

কাঁদাটা সম্ভব নয় বলেই মণীশদা হাসতে চেষ্টা করল।

'ভুলু, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, উই মাস্ট ট্রাই টু বেয়ার ইট উইথ পেশেন্স্। টিনটিন নেই, আমি জানি—' বলতে বলতে গলা ধরে এল, একটা ঢোক গিলল মণীশদা: 'ও-সব থাক। কিন্তু কারা তোমাকে ছোরা মারল ভুলু, কী তাদের মোটিভ? তোমার সঙ্গে তো কারো শত্রুতা নেই বলেই জানি।'

সেই রাত্রে—হাসপাতালে এসে একটা ঘোরের মধ্যে যে কৈফিয়ৎ সে পুলিসকে দিয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করতে হল তাকে।

'কিছু না মণীশদা—একেবারেই গুণ্ডা। ছিনতাই করতে এসেছিল। বাধা পেয়ে ছুরি মারে। টুলুর চিৎকারে পুলিস ভ্যান এসে যায় একটা।'

'ছিনতাই—একেবারে সাদার্ন অ্যাভিনিউর ওপর!' চকিতে জ্বলে উঠল মণীশদা: 'এই হল ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের চেহারা—আর ডেপুটি চীফ মিনিস্টার—পুলিসের মন্ত্রী, তাঁর বাড়ি সেখান থেকে কত দূরে? অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টকে রাজনীতির স্বার্থে লাগালে এই হয়, তখন ফ্র্যাংকেনস্টাইনের সাব-হিউম্যান বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাংকেনস্টাইনকেই হত্যা করতে আসে।'

সেই যুক্তফ্রন্ট—অসংখ্য মানুষের যন্ত্রণা, প্রতি মুহূর্তের চক্ষুশূল। আর অবশ্য বেশি দেরি নেই তারও, যাঁরা তাকে গড়েছিলেন, তাঁরাই তাকে ভাঙবার জন্যে

উঠে-পড়ে লেগেছেন এখন—বাংলা দেশের ছিন্নমস্তা রাজনীতি নিজেদের রক্ত খাওয়ার জন্যে জিভ মেলেছে ; দেশ নয়, জাতি নয়, ভবিষ্যতের দিকে আলোকিত পদক্ষেপ নয়, এখন শান্ত সাধু সঙ্কল্পকে দলের উপাসনায় বলি দেওয়া চলে। মণীশদাদের আর বেশি দিন মর্মবেদনা ভোগ করতে হবে না—যুক্তফ্রন্টের নাভিশ্বাস ঘনিয়েছে।

মণীশদা এই মুমূর্তে দুঃখী, তার শরীর-মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এখন তার আর যুক্তি বলে কিছু নেই—নিজের জ্বালায় তার মনে হচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি গদীতে না থাকত, তা হলে টিনটিন এমন করে হারিয়ে যেত না। আর প্রবীর—শরীরে তিনটে ছোরার ঘা নিয়ে যদিও বিপদের সীমাটুকু মাত্র এড়িয়েছে এবং কথা বলতে তার কষ্ট হয়, তবু এ-কথাগুলো শুনতে এ অবস্থাতেও তার খারাপ লাগে, একটা তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে গলার কাছে।

কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু মণীশদাই উঠে পড়ল। কর্তব্যের তাগিদেই খবর নিতে এসেছিল, কোথাও বেশিক্ষণ স্থির হয়ে সে থাকতে পারে না—ছট্‌ফট করছে সারাক্ষণ, আজ ছ'দিন সে অফিসে বেরোয় নি।

মণীশদা বললে, 'আমি চললুম। তোমাকে আর বিরক্ত করা ঠিক নয়।'

চলে গেল। হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে—নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল প্রবীর। মাথার অনেক ওপরে ছাত, শীতের প্রথম ছোঁয়ায় একটা ইলেকট্রিক পাখা নিশ্চল হয়ে আছে তার নীচে। হাসপাতালের এই ঘরে অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা, অনেক মৃত্যু, অনেক কান্না, দিনের পর দিন। এখানকার ভারী বাতাসে, তীব্র অ্যান্টিসেপ্‌টিকের গন্ধে, রোগীদের কাতরতায়, নার্সদের সতর্ক চলা-ফেরায়, ডাক্তারদের গম্ভীর মুখে—সেই যন্ত্রণা আর মৃত্যুর আবির্ভাব অনুভব করা যায় সব সময়। মণীশদা চলে গেল, কাতর অসুস্থ শরীর-মনে মৃত্যুর অনুভব জানিয়ে গেল আর একটা। সেটা কেবল এই ঘরেই নয়—সারা বাংলা দেশে—অনেকগুলো মানুষের প্রত্যাশার ওপর কী নিষ্ঠুর ভাবেই যে নেমে আসছে !

'প্রবীর।'

চেয়ে দেখল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী এসে প্রায় আছড়ে পড়ল বেডের ওপর। নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকা এই শান্ত মেয়েটি প্রবীরের অবস্থা দেখে চকিতের জন্যে ধৈর্য হারালো : 'ভুলু, কী করে হল এ-রকম, কী করে হল। নিউজ পেপার আমি মিস্ করেছি,

কেউ আমাকে খবর দেয় নি, হঠাৎ তোমাদের অফিসের অশ্বিন ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে—' সাবিত্রী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল : 'তোমাকে কেন মারল? তুমি তো কারুর শত্রুতা করো না!'

পাশের বেড থেকে একজন উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালো। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওদিক থেকে ছুটে এল নার্স।

নার্স বোধ হয় একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল সাবিত্রীকে, কিন্তু একবার মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। মেয়েরা মেয়েদের চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।

সহানুভূতিভরা কোমল গলায় নার্স বললে, 'অত এক্সাইটেড্ হবেন না, পেশেণ্টের ক্ষতি হতে পারে। তা ছাড়া ভাবনার কারণ নেই বিশেষ, হি ইজ আউট অব ডেন্‌জার নাউ।'

সাবিত্রী নিজেকে সামলে নিলে। চোখের জল মুছে ফেলে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ সিস্টার। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম।'

'দ্যাটস অল রাইট।' নার্স হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল একবার : 'আর কিন্তু সময় নেই। মিনিট দশেকের ভেতরেই ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাবে।'

'আমার মনে থাকবে, সিস্টার।'

পৃথিবীতে যখন কোথাও কিছু থাকে না, তখন সাবিত্রীরা থাকে। এতক্ষণ পরে প্রবীরের মনে হচ্ছিল, এত মানুষের ভেতরে আজকে সাবিত্রীকেই তার সব চাইতে বেশি দরকার ছিল।

একটা দুর্বল হাতের মুঠোয় সাবিত্রীর একটা হাত জোর করে আঁকড়ে ধরল সে। নার্স বলেছে, মাত্র দশ মিনিট। দুর্লভ সময় বিন্দু বিন্দু করে ঝরে যাচ্ছে তার, এখন আর একটা কণাও অপচয় করা চলে না।

আস্তে আস্তে বললে, 'সাবিত্রী, ফিরে গিয়ে তোমাকে ছাড়া আর বোধ হয় চলবে না।'

সাবিত্রীর মাথাটা অনেকখানি নুয়ে এল তার মুখের দিকে। দুটো বড় বড় কালো চোখ টলটল করতে লাগল জলে। এই ঘর, মৃত্যু, মধ্যে মধ্যে এর-ওর কাতরতার কখনো স্পষ্ট, কখনো চাপা গোঙানি—সব ছাপিয়ে একটা সুরভিত ভালোবাসা মেঘের মতো নেমে এল প্রবীরের ওপর।

প্রায় নিঃশব্দ স্বরে সাবিত্রী বললে, 'তুমিই তো ভীরু, তুমিই তো জোর করে নিতে জানো না।'

টুলু গুম হয়ে বসে ছিল।

চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা যখন ঘটতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমটায় যা তাকে পেয়ে বসল, তা ভয়—কারুপুষের চূড়ান্ত আতঙ্ক। কারা যে রাত এগারোটার সময় সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের ওপর সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সলা করতে এসেছে—সেটা বুঝতে দু' সেকেণ্ডেরও বেশি সময় লাগে নি তার। স্বপ্না সঙ্গে থেকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু কার্তিকের দল যে এত সহজেই তাকে ছেড়ে দেবে না সে তা জানত। বোমাগুলোর খবর সেই যে পুলিসকে দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ওদের কাছে সন্দেহটাই যথেষ্ট, আর টুলু শালার যদি ভেতরে ভেতরে শয়তানী না-ই থাকবে তা হলে অত সহজেই পুলিস ওকে ছেড়ে দিলে কী বলে, আর ওই বা হঠাৎ আচমকা এমন ভালো ছেলে হয়ে গেল কী মতলবে! মাণিক থাকলে হয়তো ওদের সামলে রাখত, কিন্তু ঝাণ্ডা-ওলারা তার মাথা খেয়ে দিয়েছে, ওয়াগন-ভাঙা ফেলে সে দৌড়েছে কোথায় কার জমি দখল করতে। এখন আর তাকে বাঁচাবার কেউ নেই।

সুতরাং দাদার হাতের ধাক্কায় ছিটকে সরে গিয়ে—গোড়াতে তার মনে হচ্ছিল, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানো যাক এবার। কিন্তু তার পরেই ঝলকে উঠল তিন দিকে তিনখানা ছোরা—দাদা শুইয়ে দিলে একজনকে—বাকী দু'জন বাঘের মতো পড়ল দাদার ওপর। তখন তার গলা-ফাটানো চিৎকার—লোকজনের ছুটে আসা—পুলিসের গাড়ি—

সেই অবস্থাতেও দাদা বলেছিল, 'না—না—গুণ্ডা—রাহাজানি—'

অর্থাৎ দাদা বুঝেছিল, ওরা টুলুরই দলের—আগের কোনো শত্রুতার শোধ নিতে এসেছিল। আর তখনো, অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে—পুলিসের ঝামেলা থেকে টুলুকে বাঁচানোর কথাই আগে মনে জেগেছিল তার।

'গুণ্ডা—রাহাজানি করতে এসেছিল।'

হাসপাতাল থেকে বলেছে, ভয়ের কারণ নেই, অল্পের জন্যে ছোরাটা হার্টে লাগে নি, দাদা এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু মাণিক, স্বপ্না, দাদা—এমন কি মণীশদা, ঘোষ সাহেব—সবাই তাকে কেবল বাঁচিয়েই যাবে? সে এমন অপদার্থ এত বড় কাপুরুষ যে কেবল পালিয়ে পালিয়ে—অন্যের আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে চলবে? অপমান—আত্মগ্লানি।

টুলুর মাথায় আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, একটা কিছু তারও করা দরকার। সেও ছোরা নিয়ে বেরুবে একখানা—ওদের দলের যাকে সামনে

পাবে তাকেই শেষ করবে। তার পরে ফাঁসি হয় তো হোক, এভাবে আর বাঁচা যায় না। বাঁচা যায় না—কারণ দাদাকে দেখতে গিয়ে দাদার দিকে তাকাতে পারে না সে, মায়ের মুখের দিকে চাইলে লজ্জার সীমা থাকে না আর, দাদার এই অবস্থার জন্যে সে-ই তো দায়ী।

ঠিক এই যন্ত্রণার ভেতরে মা বলেছিল, 'দেরাজটা একবার খোল তো, ভুলুর ক'টা টাকা দরকার।'

দাদা দেরাজের চাবি মা'র কাছেই রাখে। কিন্তু মা কখনো চাবি খোলে না —বাবার আমল থেকেই পয়সাকড়িতে হাত দেবার কথা মা ভুলে গেছে। টুলু দেরাজ খুলল, এবং—

এবং, টাকা-পয়সার আগে যা তার চোখে পড়ল, সেটা একটা রিভলভার।

রিভলভার সে জীবনে কখনো ছোঁড়ে নি। কিন্তু ফণী একবার একটা দেখিয়েছিল তাকে। কী করে খুলতে হয়, কী করে টোটা ভরতে হয়।

রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঠ হযে বসে রইল সে। দাদার ড্রয়ারে রিভলভার কেন? দাদা গণ-বিপ্লবের কথা বলে, কিন্তু রিভলভার নিয়ে —অন্তত এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে চাইছে. এ-কথা তো কোনোদিন শোনা যায় নি তার মুখ থেকে। তা হলে এটা কোথা থেকে এল?

কিন্তু যেখান থেকেই আসুক, টুলুর মনে হল, এটা দাদা তার জন্যেই রেখে দিয়েছে। কাতিকের দলটার সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্যে এইটেই তার দরকার ছিল। এইবারে সে বদলা নেবে।

রিভলভারটা খুলে দেখল। ছটা চেম্বারই ভরা।

ঠিক তখন বাইরে থেকে মেয়েলি গলায় কে ডাকল: 'কাকিমা।'

টুলু চমকালো। রিভলভারটা কেঁপে উঠল মুঠোর মধ্যে।

'কাকিমা।'

দরজা খোলবার আওয়াজ এল। আর মা বললেন, 'স্বপ্না? আয় আয়—'

'টুলুদা নেই?'

'আছে বৈ কি। ডেকে দিচ্ছি এক্ষুণি।'

॥ আটাশ ॥

রিভলভারটা হাতের মধ্যে কেঁপে উঠলো টুলুর। বাইরে স্বপ্নার গলার আওয়াজ। মা'র সাদর আহ্বান কানে গেল। স্বপ্না তার সঙ্গেই দেখা করতে আসছে। অতএব দেরাজটা খুলে যথাস্থানে সেটাকে রেখে দিতে দিতেই স্বপ্না ঘরে ঢুকে পড়লো।

'টুলুদা, একটু আসবে, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বেশ বল—' টুলুর মুখটা তখনও ছায়ের মত সাদা।

'এখানে হবে না। চল একটু বাইরে।'

'তুমি যাও, আমি আসছি—।'

স্বপ্না—।

সেদিন তার সঙ্গে থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কার্তিকের দল এত সহজেই তাকে ছেড়ে দেবে না। বোমাগুলোর খবর সে পুলিসকে দিয়েছে এমন কোন খবর নেই। কিন্তু ওদের কাছে সন্দেহই যথেষ্ট।

চিন্তায় ছেদ পড়লো—'টুলুদা?' স্বপ্না ডাকলো।

'আসছি।' গায়ে জামাটা চড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

সোজা পথ। গাছের সারি। দুজনে চুপ করেই চলছিল। ট্রাম-বাসের লোক সব কিছুর পথ ছেড়ে ওরা বাঁয়ে দুধারে গাছের সারিওলা নির্জন পথটাই ধরলো। স্বপ্না তার পাশে থাকলে যেন তার রক্তে কেমন একটা নেশা ধরে। এতদিন চলছিল সে একটা ঝোঁকের মাথায়। আজ আবার যেন রূপকথার একটা জগৎ তাকে হাতছানি দিচ্ছে। "আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি—দারুণ ভালো হয়ে যাচ্ছি।" এই রোমাঞ্চটা তার স্বপ্নাকে দেখলেই যেন বুকের মধ্যে ধকধক করে ওঠে। দাদার কথাগুলো তার কানে বাজতে লাগলো: "দেরি হয় না, কোনো কিছুতেই দেরি হয় না। তোর চাইতেও বেশি বয়েসে পড়াশুনা ধরে অনেকে ডক্টরেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।"

কিন্তু—? হাতের মধ্যে যেন শক্ত রিভলভারের স্পর্শটা তখনও জড়িয়ে ছিল।

টুলু চমকে উঠলো স্বপ্নার ডাকে।

'টুলুদা এসো, বসি।' ওরা দুজন লেকের ধারে ঘাসের ওপর বসলো। কোনো ভূমিকা না করেই স্বপ্না বললো, 'দাদাকে কানপুরে ট্রান্সফার করেছে। দাদা

সেখানেই চলে যাবেন।'

'বৌদি নীলু সবাই তো যাচ্ছে সঙ্গে ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'গেলে তো ভালই হতো। ওরা কেউই যাচ্ছে না।' বেশ গম্ভীর গলায় স্বপ্না বললে।

'যাচ্ছে না কেন ? ও, বাড়ি পান নি বুঝি ? আগে নিজে গিয়ে জয়েন করে পরে বাড়ি ঠিক করে সবাইকে নিয়ে যাবেন ?'

'হুঁঃ। এতো যদি সোজাই হতো তবে আর আজ তোমাকে ডাকতাম না। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে।'

'কি রকম ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি জান বৌদি বিয়ের আগে পলিটিক্স করতো। তারপর তাদের বিয়ে। কিন্তু কিছুদিন হলো ওঁদের একেবারে এডজাস্টমেণ্ট হচ্ছিল না। বৌদির ধারণা, দাদা কতগুলো পুরনো বিশ্বাসেই স্থির হয়ে আছে। তাঁর ধারণা, কমিউনিজম স্টাটিক নয়—সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রবলেম আছে। তাকে বুঝে চলতে হবে। দেশকে বুঝে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। তাঁর ধারণা, দাদা এ সব কিছুই বুঝতে পারে না। কুড়ি বছরের আগেরকার পার্টির নীতিই তার কাছে লাস্ট ওয়ার্ড। সে ফ্রাসটেশনে ভুগছে, সুতরাং তার সঙ্গে কোন মতেই তার এডজাস্টমেণ্ট হতে পারে না।'

'বৌদি কি চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন ?'

'তিনি চলে গেছেন, আর ফিরবেন না।' ভারাক্রান্ত গলায় স্বপ্না বললে।

'কি করে জানলে যে তিনি আর ফিরবেন না ?' টুলু বললে।

'সাবিত্রীদি গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে বৌদি বলেছে : আমি আবার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি। ওদের ছেলের বয়স বেশি নয়। ভালো চাকরি করে ; সুপাত্রই বলা যায়। ওরা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলেকে বিয়ে দিতে পারে।'

'বৌদি একথা বললেন ? কিন্তু নীলু — ?'

'বৌদি এয়োতির চিহ্ন পর্যন্ত কপাল থেকে মুছে ফেলেছেন। আর নীলু ? সে আমাদের কাছেই আছে।' স্বপ্না থেমে গেল হঠাৎ।

'নীলুকে উনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন কানপুরে ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীলু যাবে না। তার দাদুর কাছে থাকবে সে।

বাবাকে একা রেখে সে কিছুতেই যেতে চাইলো না দাদার সঙ্গে।'

টুলু চুপ করে যেন কথা খুঁজতে লাগলো। বেলা-পড়া আলো রাস্তার মাথার পাশের বাড়িগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাছের ওপর হয়ে যেন লেকের জলে সাতনরী হারের মত রেখা কেটে কেটে মিলিয়ে যেতে লাগলো। গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ির মত ধার তুলে তুলে জলটা কালো হয়ে এলো। বকের সারি ফিরছে—পাখীর ঝাঁক বাসায় এলো লেকের গাছগুলোর ওপর। হঠাৎ স্বপ্নাই আগে কথা বললো।

'কি যে ক'রি তাই ভাবছি। বাবার মনটা খুব ভেঙে গেছে। বৌদি চলে গেল বটে, কিন্তু ওর স্বাস্থ্য তো একেবারে ভেঙে গেছে। পলিটিক্সের ধকল ও' সহ্য হবে? তার নীলু, সে বড্ড কষ্ট পেয়েছে।'

অন্যমনস্কভাবে টুলু ভাবছিল স্বপ্নাকে এসময় দাদার খবরটা দেওয়া উচিত হবে কিনা। স্বপ্না ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে।

হঠাৎ দুজনেই চমকে ফিরে তাকালো। একটা মিছিল চলেছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আমাদের দাবী মানতে হবে – ছাঁটাই করা চলবে না।

কোন একটা কারখানা যেন বন্ধ হয়ে গেছে। মালিক নাকি ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আপোস আলোচনায় বসতে গররাজী, তাই এই বিশেষ মিছিল।

বিক্ষোভ মিছিল সারা কলকাতায়। বাইশ মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেছে। চলেছে রাষ্ট্রপতির শাসন। হবেই, হতে বাধ্য, চারদিকে অনিশ্চয়তার ছায়া। কারু মনে শান্তি নেই। সারা দেশ জুড়ে যেন অরাজকতার তাণ্ডব চলেছে। সকালে খবর কাগজ খুললেই খুন-খারাপি, গণ্ডগোল আর মারপিটের খবর। এর পরিণতি কোথায়?

ওরা উঠে পড়লো। সাড়ে সাতটার খবর হচ্ছে। চমকে তাকালো স্বপ্না। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ, প্রসিদ্ধ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আজ নিহত হয়েছেন।

পা যেন কে পেছন থেকে টেনে ধরলো। স্বপ্না শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'টুলুদা, শুনলে খবর?'

॥ উনত্রিশ ॥

কত ফুল আছিল দেশের বাড়িতে। নতুন পুকুর কাটা হইছিল অ্যাকটা—সে মাটিতে যে কী ফুল হইত। গোলাপে ভইর‍্যা যাইত। আর স্থলপদ্ম। পুকুরের চাইরদিক ঘিরা‍্যা গাছ লাগানো হইছিল, হাজারে হাজারে ফুল ফুটতো। জলে ছায়া পড়তো, মনে হইত, পুকুর ভইর‍্যা পদ্ম ফুটছে।

মনে হয় সব বদলাইয়া গেছে একটা যাদুমন্ত্রে—

'—বাবা?' শিবপ্রসাদ চমকে উঠলেন। স্বপ্না ডাকছে।

ক্লান্ত দুটো চোখ তুলে তাকালেন শিবপ্রসাদ: 'কিছু বলবা মা?'

'না বাবা, কিছু বলুম না।' শান্ত চোখ দুটো স্বপ্নার স্নেহে ভরে ওঠে: ভাইব্যা কি করবা বাবা। যা হইবার তা হইবই।'

'বইস্যা বইস্যা ভাবত্যাছি মা বৌমা কি কইর‍্যা নীলুকে ফালাইয়া চইল্যা যাইতে পারলো। যতই কস দ্যাশ—পলিটিকস, কিন্তু সকলের আগে তো সে মা।'

'আজকালকার দিনে ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে মানুষ বৃহৎ জগতের ডাক উপেক্ষা করতে পারে বাবা?' স্বপ্নার ঠোঁটটা কাঁপতে লাগলো: 'দ্যাশের ডাকের কাছে সবই তুচ্ছ হইয়া যায় বাবা।'

চমৎকার সম্ভাবনাময় জীবন শিবপ্রসাদের সামনে। আনন্দ নেই, স্বরাজও চললো। তার মানে এখন সংসারের সব ভার শিবপ্রসাদের ওপর। হাট-বাজার করবেন, অসুস্থ উন্মাদপ্রায় স্ত্রী মনোযন্ত্রণায় একটু একটু করে পুড়তে থাকবেন—অসহায়ভাবে তাঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা এখন তাঁর। রিটায়ার্ড করবার পর নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপূর্ব অবসর।

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল নীলু। রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল। নীলুর চোখ তার সামনের প্রসারিত আকাশের দিকে।

'স্বপ্না।'

'বাবা, কিছু বলবা? আশ্চর্য সহিষ্ণুতা আর সংযম দিয়ে গড়া এই মেয়েটি। কথা বলে কম কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বোঝায় তার চেয়েও বেশি। এমন কথা-ভরা শান্ত চোখ দেখা যায় না।

'তোর বড়দা আজই যাইবো।' গলার ভেতর যেন খানিকটা কান্না তাঁর ঠেলে উঠতে চাইল।

'হ—বাবা তাই তো বলত্যাছিল বড়দা।'

অন্যমনস্ক হয়ে যেন স্বগতোক্তি করে চলছেন শিবপ্রসাদ: 'সেই ভালো। আমার পোলা দুইডারে আমি তো মানুষ করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে—নিয়া যা নীলুরে।'

'তোমার খুব কষ্ট হইত্যাছে না বাবা।' স্বপ্না বাবার কাছে এসে বসলো।

'না মা। কষ্ট হইবো ক্যান। বাপ পোলা সে যদি তার রেসপনসিবিলিটি লইতে চায় তাতে আমার আপত্তি করণের কি আছে। কিন্তু তোর মা আবার খানিকটা সেকাইলা কিনা। তাঁরে সামলাই কি কইব্যা?'

চুপ করে রইলো স্বপ্না। সে জানে বাবার এই রিটায়ার্ড লাইফে নিয়ত সঙ্গী নীলু। সে চলে গেলে তাঁর থাকাই দায়। কিন্তু বাবা নিজেকে কিছুতেই ধরা দিতে চান না।

'নীলু রাত্তিরে আর কান্দে না অখন, না?' শিবপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'না বাবা, আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁইজ্যা আমারে জড়াইয়া ধইর‍্যা ঘুমায়। একটু পাশ ফিরবার জো নাই। অমনি চমকাইয়া চাইবো আর কইবো: পিসি তুমি কই যাও।'

'আচ্ছা ধর্ তোর বড়দা নীলুরে লইয়া চইল্যা গেল। তারপর হঠাৎ তর বৌদির সুমতি ফিরা আসলো, সে আইস্যা দেখলো তার পোলা তার বাপের সঙ্গে চইল্যা গ্যাছে। তখন—'

স্বপ্না আনন্দ নয়, প্রবীরও নয়, সুজাতাও নয়। এ সব প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। আবার নৈরাশ্য ঘনিয়ে এলো দুজনের মধ্যে।

আবার সান্ত্বনার জেরটাই টেনে আনতে চাইলো স্বপ্না: 'বাবা, যতই পলিটিকস্ করুক, বড়দার সঙ্গে যতই ঝগড়া থাকুক নীলুর জন্যই ফিরতে হইবো বৌদিকে।'

'কি জানি কি করবো।' সামনের দিকে খোলা জানলা দিয়ে চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন শিবপ্রসাদ। সামনের নারকেল গাছটা চিলের বাসা। হয়তো সেখানে তার কটা বাচ্চা হয়েছে। হাড়সর্বস্ব বাচ্চা দুটোকে কি কি যেন কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনে খাওয়াচ্ছে চিলটা। হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপছে

গাছটার। গাছের মাথার ওপর দিয়ে কি যেন একটা পাখীর ঝাঁক উড়ে গেল।

নীলু ধীরে ধীরে এসে দাদুর কাছে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা বদলে ঘরের ভারি হাওয়াটা লঘু করতে চাইলেন শিবপ্রসাদ: 'নিচে কারা জানি কথা কইতেছিল। কতগুলি পোলাপানের গলা শুনতেছি।'

'হ্যাঁ দাদু, ওরা তোমার দেওয়ালে চুনকাম করত্যাছে।' নীলু বললো।

'অগো এতো সুবুদ্ধি হইল ক্যান। পরের কারণে স্বার্থ বলি দিয়া ওরা বিনা পয়সায় পরের দেওয়ালে চুন দিবার ব্রত নিলো ক্যান।'

'না দাদু, ওরা ওখানে শ্লোগান লিখবো। আমি তো তাই এতক্ষণ খাড়ায়ে খাড়ায়ে দেখতে ছিলাম।'

'কিছু কস নাই তো?' শিবপ্রসাদের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

'না দাদু, আমি জানি। সামনের বাড়িতেও ওসব লিখত্যা ছিল। ওরা না করণে ওগো কইছে—"রাস্তায় তো নামতে হইবো। তখন মাথা থাকে কোথায় দেখবেন।" আমি শুধু খাড়ায়ে খাড়াযে দেখতে ছিলাম। অগো সকলরেই আমি খুব ভালো কইর‍্যা চিনি। তবু অরা জিগাইলো: এই খোকা তুই কি দেখছিস? আমি কইলাম: পাখী দেখি। অরা কইলো: তাই দেখ। আমাদের দিকে তাকাবি না। কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলবি আমাদের চিনিস না।'

একটু হেসে নীলু বললো, 'দাদু আমি কইলাম, আমি তো আপনাগো চিনি না। আর আমি ও সব কিছু দেখত্যাছিও না।'

'ভালো কইছস।'

অতটুকু ছেলেরা এখন কত সতর্ক কত সাবধান হয়ে গেছে। ওরা আগেকার ছেলেদের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান। অনেক বেশি বোঝে বলেই ওদের মনের ওপর সব জিনিসটারই প্রতিক্রিয়া হয় বেশি। সুজাতা চলে গেছে স্বরাজের সঙ্গে ঝগড়া করে। নীলকণ্ঠের মত সবটুকু বিষপান করেছে নীলু। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নি সে।' একবারও মা'র সঙ্গে চলে যেতে চায় নি। শুধু রাতে স্বপ্নার বুকটাকে আঁকড়ে রাখে দু হাতে। হয়তো ভাবে, মাও চলে গেছে, হয়তো পিসিও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে।

কিন্তু আজ বারবারই শিবপ্রসাদ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। তলিয়ে যাচ্ছেন নিজের মধ্যে। এক-একবার নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরছেন। বড় ছেলের জন্মের সময় স্বাধীনতার সৈনিক তার নাম দিয়েছিলেন স্বরাজপ্রসাদ। রাজ-

নীতির বাড়ি। অল্প বয়স থেকে স্বরাজও রাজনীতি করতো। শিবপ্রসাদ বাধা দেননি। কেন দেবেন? কলেজে পড়বার সময় পুরোদস্তুর সে একজন ছাত্রনেতা —বামপন্থী চিন্তা তার, কংগ্রেস সোসালিজিমের নির্মম সমালোচক সে। অনেক উত্তপ্ত তর্ক চলেছে বাপের আর ছেলের মধ্যে, কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারে নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি তখন সরকারী স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড মাস্টার। ছেলের বামপন্থী রাজনীতিতে যে তাঁর অবস্থা খুব স্বস্তিকর ছিল তা নয়। মাঝে মাঝেই নানা অপ্রীতিকর কথা তাঁকে বলতে হয়েছে। কখনও কখনও ভেবেছেন না হয় দেবেনই চাকরি ছেড়ে। না হয় টিউসনি করেই সংসার চালাবেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর মতেও মিল নেই পথেও মিল নেই। কিন্তু চাকরির জন্যে তিনি ছেলের স্বাধীন মতামতে বাধা দিতে পারেন না। ইংরেজ সরকারী হুঙ্কারকেই কখনও তিনি ভয় পেলেন না, মাথা নিচু করলেন না তো স্বদেশী সরকারের চোখরাঙানিকে তিনি ভয় করবেন

আজ সেই ছেলে বলছে চুলোয় যাক পলিটিকস্। শিবপ্রসাদের ভালো লাগে। যেন নিজেকেই পরাভূত মনে হয়েছে তাঁর। যে পথ ধরে এতদিন তিনি এগিয়ে গিয়েছেন আজ সেই পথে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে এই কি চেয়েছিলাম আমরা। এই কি বাংলা মা'র চেহারা, যাঁর দরজা সোনার মন্দিরে খোলা? স্টেশনে উদ্বাস্তুদের ভিড়—মাটি খুঁড়লেই মানুষের কঙ্কাল। এখানে মাটিতে কেমন করে ফসল ফলবে যেখানে উত্তপ্ত মাটিতে এতো চোখের জল এতো রুধিরে রাঙা।

'দাদু—।' নীলু ডাকলো।

'এতো চুপ কইর‍্যা আছ কেন। আমার ভালো লাগে না।'

স্বপ্না বললে, 'তুই যা, খেলা কর গিয়া।'

'না পিসি, আমি দাদুর ধারে একটু বসি।' কি যেন বুঝেছে নীলু। কোথায় যেন খানিকটা অস্থিরতার তপ্ত বাতাস ঘরের স্বস্তিকে বিঘ্নিত করছে। কোথায় যেন খানিকটা অশান্তি ঘনীভূত ঝড়ের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ছোট হলেও নীলু যেন সেটা খুব ভালো করেই অনুভব করে অস্বস্তি পাচ্ছে।

ঘরে সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। স্বপ্না ধীরে ধীরে শিবপ্রসাদের পাশ থেকে উঠে গেল। সুজাতা চলে যাওয়ার পর থেকে নীলুর দু চোখে কেমন ভয় আর অবিশ্বাস। যেন মনে করে তাকে ফাঁকি দিয়ে সবাই পালিয়ে যাবে

সুজাতার মত।

'দাদু, চল আমরা অঙ্ক কষি গিয়া।'

'তুই যা, আমি আসতে আছি।' শিবপ্রসাদ বললে।

সুজাতা স্বরাজের সঙ্গে ঝগড়া করতো যখন "অনেক সহ্য করেছি, তিন বছর ধরে কেঁদেছি। এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরে গেছে, এখান থেকে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমার এ—ডিফিটিজম আমার সহ্য হচ্ছে না। আমাকে মুক্তি পেতেই হবে"—নীলু বিবর্ণ মুখে দাদুর কাছে গিয়ে বসতো তখন ঝড়ের ভেতর যেন সে একটু স্বস্তির নীড়ের সন্ধান করে ফিরত দাদু আর পিসির ভেতর।

'নীলু—' স্বরাজ ঘরে ঢুকলো। 'কাইল আমাকে চইলা যাইতে হইবো। তুমি আমার সঙ্গে যাবা। তোমার যা যা লইতে হয় গুছাইয়া লও।'

শিবপ্রসাদের মুখেব পেশী যেন শক্ত হয়ে গেলো। গলা দিয়ে তাঁর কোন আওয়াজ বেরুল না।

'বড়দা—।' স্বপ্না চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি বুচার, কাওয়ার্ড, স্বার্থপর। এ কথা তুমি কইতে পারলে বাবার মুখের সামনে!'

'না পারনেরও তো কিছু নাই। য: সত্য তারে নিঃশব্দে গ্রহণ করতে শেখাই প্রয়োজন। আমি ওরে কলকাতায় রাখুম না।'

'কোথায় যাবা বাবা?' নীলু বললো।

'আমি কানপুরে বদলি হইছি। তোরে ওখানকার বোর্ডিংএ রাইখ্যা পড়াবো। এখানে তোর কিছু হইবো না।'

'বাবা, দাদুর কী হইবো?' উজ্জ্বল কণ্ঠে নীলু জিজ্ঞাসা করলো।

তার কথা তোর চিন্তা করতে হইবো না। তর পিসি তারে দেখবো।'

'আমি দাদুরে ছাইড়া যামু না বাবা। তুমি যাও—'

ঘরে যেন বাজ পড়লো।

স্বপ্নার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নীলুকে দুটি কম্পিত বাহু প্রসারিত করে শিবপ্রসাদ বুকে টেনে নিয়ে কেঁদে ফেললেন।

॥ ত্রিশ ॥

বস্তীটায় ঢোকবার পথটা কাঁচা। খোয়া আর কাঁকর ছড়ানো, তারই মধ্যে প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা কালিপড়া লণ্ঠনের সামনে হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসে

মানিক আর মেঝের ওপর চিৎ হয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ওর পাশে ফণে বসে।

'ব্যাটা কুত্তার বাচ্ছাকে মারতে খুব মিস হয়ে গেল মাইরী। ঞ্.—নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে তোকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে নইলে পুলিস মালের খোঁজ পায় কী করে? শালার লাশ সেইখানেই ফেলে দেতাম মধ্যেখান থেকে—'

কার্তিক এক কোণায় চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ বলে উঠলো, 'তাই বলে তুই—'

'মারবোই তো। এখন হারামি—ভদ্রলোক হয়েছে। আমাদের সঙ্গে মেশে না। ভদ্রলোক হয়েছে—ছুটিয়ে দেব ভদ্রলোক হওয়া। সঙ্গে আবার জুটেছে এক ময়না। সে আবার খাসা বুলি ঝাড়ে—'

'চুপ শালা শুয়োরের বাচ্চা। যা বলবার থাকে বল্ ওই টুলেটাকে, ভদ্রলোকের মেয়েদের নামে যা তা বলবি না বলে রাখলাম।' কার্তিক গর্জে উঠলো।

'কেন বলবো না শুনি? ওঃ, তোকে দাদা ডেকে বুঝি তোর মন ভুলিয়ে দিয়েছে।' মানিক বললে। 'ওরে ফণে, কার্তিককে বুঝি আর রাখা গেল না দলে। কিছুদিন হলো দেখছি ও যেন কেমন কেমন বুলি ছাড়ছে। কেমন অন্যমনস্কভাবে কথা কয়, হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে।'

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমে উঠছে। অসম পলতের একপাশ পুড়ে লণ্ঠনের ভেতর কালি জমছে। চিমনিটা কালো হয়ে গিয়ে ওপর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কেমন যেন তেলপোড়া কটু-কটু গন্ধ ছাড়ছে।

সত্যিই কার্তিকের ভালো লাগে না। এই বোমাবাজি, ওয়াগন ভাঙা আর ছোরাছুরি। কিন্তু উপায় কী? কি করবে সে? বাড়ির কোন আকর্ষণ নেই। ঘরে খাওয়া নেই। ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে এ কাজ না করে সে কি করবে? অন্তত একটা থ্রিল তো আছে।

পুলিসে কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, বস্তি ঘেরোয়া করে ঘরে ঘরে তল্লাসী চালায়। বাড়ির মেয়েদের অকথ্য গালাগালি দেয় আসামী না পেলে। বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে ভেঙেচুরে ফেলে। যদি একটা কাজকর্ম কিছু পেত তাহলে এ পথ সে ছেড়ে দিত।

কিছুদিন আগে মানিকের কানে কি যেন মন্ত্র দিয়েছিল পলিটিক্সের দাদারা। কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান কাটতে গিয়েছিল সে। তারা তাকে ভরসা দিয়েছে এ সব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। আর ওয়াগন

ভাঙতে হবে না। খাওয়া পরার কোন অসুবিধা থাকবে না। একেবারে মই বেয়ে সুখের স্বর্গে চড়ে বসবে সে। ফুঃ—মনে মনে ভাবলো কার্তিক: হবে ঘোড়ার ডিম। পলিটিক্সের দাদারা তো লাল কাপড় উড়িয়ে দেশসুদ্ধ ষাঁড় খেপিয়ে বেশ মৌজের সঙ্গে হাততালি বাজাচ্ছে। আর মরতে মর ব্যাটা তুমি। ধুঃ! একবার তারা তাকেও ডেকেছিল কিন্তু ভাবগতিক বুঝে যায় নি সে।

'আমি ছেড়ে দেব এ সব একটা চাকরি পেলে।' কার্তিক বললো।

'লে বাবা! ওই টুলু তোর কানে মন্ত্র দিয়েছে। তোর জন্যে চাকরি সাজিয়ে সবাই বসে আছে। মেলা ফালতু কথা বলিস নি।'

ছেঁড়া একটা প্যাণ্টপরা ছেলে হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। 'প্রমোদদা বললে রাতে পুলিস আসবে তোমাদের খোঁজে।' খবরটা দিয়েই ছেলেটি তীর বেগে যেদিকে এসেছিল সেই দিকেই আবার চলে গেল।

এ বস্তীর পাঁচ থেকে পঁচিশ বছরের কি ছেলে কি মেয়ে সবাই এ ব্যাপারে পোক্ত। এরা পুলিসের গাড়ি চেনে। ইনফরমারদের নাম-গোত্র অন্ধি-সন্ধির খবর রাখে। আপাতত অহিংস এই ছেলেগুলোই কিন্তু এদের প্রধান সহায়। এরাই আগামী দিনের ফণে, কার্তিক, মানিক, প্রমোদের শূন্যস্থান পূরণ করবে। এরা খেলা করে সেও সেই বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা। পুলিস আসছে—পালাচ্ছে। কেউ কিছু করলে তাকে শাসাচ্ছে: যেমন করে ফণেদা শিবুর বাবার পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে ঠিক তেমনি করে পেট ফাঁসিয়ে দেব, যদি আর একটা কথা বলিস।

গলির মোড়ে রকে বসে খেলছিল একটা বাচ্ছা ছেলে। দেওয়ালের গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা—"বন্দুকের গুলীর ভেতর দিয়ে বিপ্লব বেরিয়ে আসে"। মাও সে-তুং যুগ যুগ জিওতে হাত বোলাচ্ছিল। হঠাৎ তীরের মত ছুটে গিয়ে খবর দিল: পুলিস।

দেখতে দেখতে একেবারে দৃশ্যপট বদলে গেল। কোমরে দড়িতে বাঁধা রিভলভার নিয়ে পুলিসের দল নামলো একটা পুলিসভ্যান থেকে। সঙ্গে ইনফরমারের দল পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বস্তীর গলির ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজ উঠলো বোমার। ধোঁয়াতে সব কালো হয়ে গেল। ফণে বোমা ফাটিয়ে মানিককে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু কার্তিক পালাতে পারে নি।

টুক করে সে একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়লো। বোমাটায় কারুর কিছু

হয় নি, সে পালাবার জন্যেই সেটা ফাটিয়েছিল। ফণে আর মানিক বহু দিনের ফেরার, পুলিস ওদের খুঁজে ফিরছিল। তারপর চললো পুলিসী তাণ্ডব। ঘর দরজা তছনছ করে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে ওরা আসামীকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ওদের ধরা এতো সোজা নয়। অভ্যস্ত পায়ে আর স্বাভাবিক তৎপরতায় তারা প্রথমে ঘরের দরজার ওপর পা দিয়ে হনুমানের মত ঝুলে উঠে পড়লো টালির ছাদে। সেখান থেকে পাশের খাটালে লাফিয়ে পড়ে বস্তীর ছাদে ছাদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ যাত্রায় কার্তিকও ধরা পড়তো না। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়েছিল। হঠাৎ যাবার সময় গণেশ পুলিসের কানে একটা হাঁচির শব্দ যেতেই সে ফিরে দাঁড়ালো।

তারপর হঠাৎ একটা লাঠির আঘাত নেমে এলো তার মাথার ওপরে। মুহূর্তে পৃথিবীটা ঘুরে গেল তার চোখের সামনে। সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হলো রাশি রাশি অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে সে। মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কে যেন তাকে ধরে নিলো। তার হাত দুটো বড় নরম। বুকটা বড্ড ঠাণ্ডা। হয়তো বস্তীর সেই মেয়েটা শঙ্করী—যে তাদের পাশের ঘরে থাকে আর যে তাকে বহুবার পুলিসের হাত থেকে জান কবুল করে কত অপমান সহ্য করেও বাঁচিয়েছে। ওকে ঘিরেই ছোট্ট একটা বাসা বাঁধবার স্বপ্ন এক-একবার উঁকি দিত ওর মনে।

সামনের স্কুলটায় একটা লাল পতাকা উড়িয়ে কতকগুলো বোমা ফাটিয়ে কে বা কারা হল্লা করে গেছে। এখন শুধু ছেলেদের হৈচৈ চীৎকার আর ছুটোছুটি। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কতকগুলো লোক জটলা করছে স্কুলের সামনে। কী দরকার ও পথ ধরে চলার—টুলু দূরের বাঁকা পথটাই ধরল। মনে পড়লো ওদের কথা।

মানিক ফণে কার্তিক।

হ্যাঁ, মানিক বলেছিল একদিন দুঃখ করে, 'ভোটের সময় ওদের হয়ে চিল্লিয়েছি, ভলেনটিয়ারী করেছি। দিনে চার টাকা আর মাংস পরোটা দিত। তারপর এবার দাদারা বললেন: "লেগে পড়, জান দিয়ে খাট—যা পেয়েছিস্ ওর চেয়ে বেশীই দেব। গুণ্ডাবাজী ছাড়। ইনক্লাবের জন্যে জান লড়িয়ে দাও। সবাইকে কাজ দেব। খাবার দেব। বাঁচবার পথ দেখিয়ে দেব।" প্রাণপণ

খাটলাম, ওদের জিতিয়েও দিলাম। তারপর সব ভোঁ-ভাঁ। কোথায় চাকরি? সত্যি বলছি তোকে, একটা যদি কাজ পাই ওই ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দেব। চোরে চোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা আছে। কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তারপর কোন দিন সি-আর-পি ব্যাটা দেবে রাইফেল চালিয়ে। খতম হয়ে যাব। একটা যদি বাঁধা রোজগার থাকতো ঠিক বে-থা করে অন্যরকম হয়ে যেতাম।

বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার করবার স্বপ্ন আছে চোখে মানিকের। এখনও ওদের ফেরানো যায়। এ জীবন থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু কে দেবে? পলিটিক্যাল পার্টিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাঙাভাঙি শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে এসেছে হতাশা—অনিশ্চিত অন্ধকারের যাত্রীকে কে আলোর পথ দেখাবে। মানিক, ফণে, কার্তিক আপাতত স্বপ্নই দেখতে থাকুক বস্তীর অন্ধকার ঘরের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আর পুলিশের তাড়ায় পালিযে পালিযে ফিরুক। আর তার কথা? আবার মনে পড়লো স্বপ্নাকে—

একবার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবার চিন্তায় ছেদ পড়লো।

ও বাড়ির মেয়ে হয়েও স্বপ্না ও বাড়ির কেউ নয় যেন। কারু সঙ্গে কথা বলে না। বাবা ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। বড়দা চব্বিশ ঘণ্টা ছটফট করে অস্বস্তিতে। কি যে তার অশান্তি, কি যে তার কষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ভাঙা শরীর নিয়ে বৌদি ফেলে আসা মিছিলের দিনগুলোর কথা ভাবে। তাকে দেখলে মনে হয় আকাশ থেকে টেনে এনে খাঁচায় আটকে দিয়েছে কেউ। স্কুলে চাকরি করতে যায়, সেখানেও রাজনীতির তর্ক। বাসে করে ফেরে, সেই একই রাজনীতির কচকচি। ছোড়দা—বুকটার মধ্যে যেন কেমন জ্বালা করে ওঠে স্বপ্নার।

'টুলুদা?' স্বপ্না ডাকলো।

এই সকালটা। বাইরের বাতাস লাগা কাঁপা-কাঁপা রাধাচূড়ার গাছটার ওপরে কিসের হাতছানি যেন রেখে যায়। সামনের লেকের জলে বাতাসে ছোট ছোট জলের লেখা পড়ছে আর মুছছে। টুলু চমকে তাকালো।

'স্বপ্না?'

'এই সকালেই হন হন করে চললে কোথায়?'

'দাদা হাসপাতালে, তাকে দেখতে যাচ্ছি।' টুলুর গলা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

'ভুলুদা কেমন আছেন এখন?' বিষণ্ণ ক্লান্ত গলায় জানতে চাইলো স্বপ্না। খবরটা আগেই পেয়েছিল। স্বল্পভাষী স্বপ্না এর বেশী কিছু আর জানতে চাইলো না।

'ভালো। খুব অল্পের জন্যে দাদার প্রাণ বেঁচে গেছে।'

স্বপ্না হাসলো। 'ভুলুদার কিছু হবে না—হতে পারে না। এ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি।' দু চোখ ভরা প্রত্যয় নিয়ে স্বপ্না বললো। তার স্বরে কী ছিল, টুলু যেন একবার শুকনো ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

॥ একত্রিশ ॥

রাত বাড়ছে। ঘরের আলো নিভছে। পথের আলো আরো জোরালো হয়ে উঠলো। সারাদিনের ক্লান্তিতে আর অবসাদে মাথা ঘুরছে টুলুর।

সন্ধ্যার বিস্বাদ খবরটা যেন তার মনকে দুমড়ে মুচড়ে দু'টুকরো করে দিয়েছে। সঙ্কট বাড়ছে। বক্তৃতা চলছে দ্বিগুণ উৎসাহে—প্রতি বক্তৃতা আরো ক্ষুরধার। বিবৃতি—প্রতি-বিবৃতি। ফসলের মাঠে ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাত—তার ওপর সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্ত বসুর হত্যা।

"তোমরা আমাকে মারছো কেন? আমি তো তোমাদের কিছু করি নি—" বুকের মধ্যে যেন মুচড়ে উঠলো টুলুর। এ কোন্ রাজনীতি? কার জন্য এ নরহত্যা? কোন্ কল্যাণের পথে এ রক্তস্রোত বইবে? টুলু জানে না, জানতে চায় না। মানুষের জন্য রাজনীতি, না রাজনীতির জন্য মানুষ এ সব কূট প্রশ্নের উত্তর সে জানে না। জানতে চায়ও না। আপাতত তার কিছুই ভালো লাগছে না। কার্তিক ফণে মানকের দলের পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। এ ওদের অবশ্যম্ভাবী ছিল—কিন্তু। একটা মস্ত কিন্তু থেকে যায় সব কিছুর মধ্যে। সুস্থ জীবন—চাকরি—সামনে ভবিষ্যৎ। তাহলেও কি ওরা এ পথে আসতো—কে জানে!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্বপ্না চলে গেছে বাড়িতে। খবরটা তাকেও আহত করেছে। আবার স্বপ্নার কথা মনে পড়লো টুলুর, স্বপ্নার কথা মনে পড়লেই কেমন রক্তে নেশা ধরে তার। মেয়েটা তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই ছেলেবেলার ভালবাসার মানে আছে কোন?

"ইস, তুমি কি ভালো অঙ্ক কষ টুলুদা। কত তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষতে পার।"

"অঙ্ক তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব চাই অঙ্কে। একটু ভুল করলেই অ্যাকসিডেন্ট।"

"কিসের অ্যাকসিডেন্ট?"

"বা রে, আমি যে পাইলট হবো। জানিস্ স্বপ্না দমদমে একটা একজিবিসন হয়েছিল একবার। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। প্লেনের একজিবিসন। মানে ঠিক প্লেনের নয়। নানারকম প্লেনের ইঞ্জিন। তার যন্ত্রটন্ত্র সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সূক্ষ্ম ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই দেখে আমার মনে হলো আমার পাইলট হতে হবে—"

"না টুলুদা, তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই—"

'কত নাম—কত সম্মান। আমি প্লেন চালিয়ে লণ্ডনে যাব।'

"না—না। যদি অ্যাকসিডেণ্ট হয়! তুমি ডাক্তার হও, ইঞ্জিনীয়ার হও।"

'টুলু! এখনও ঘুমোস নি?' মা ঘরে এলেন।

এ বাড়িতে মা'র পজিসন একটু পিকিউলিয়ার। সমস্ত জীবন মা এক-টানা কষ্টই করে গেলেন। বাবা সেকালের গ্রাজুয়েট। সুতরাং তিনি যেমন ইংরিজি জানেন তেমন আর কেউ জানে না এবং তাঁর ধারণা মা সেকালের মহাকালী পাঠশালার ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া—সুতরাং "তোমার মত গাধা নিয়ে সংসার করা—" এই সিদ্ধান্ত প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখে।

মা একটা ইডিয়ট—মা'র মাথায় কোনো কিছু নেই, এই পরম আবিষ্কারটি সেকালের বি-এ পাস আর দারুণ ইণ্টেলেকচ্যুয়াল বাবা কখনো গোপন রাখতেন না। "শী ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল। ডিলাইট ইন কুকারী।" এ তো তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। ছেলেমেয়েদের সামনেই বলতেন, "আশ্চর্য আমার ট্র্যাজেডি। সারাজীবন আমার ঘর করতে হলো এক বস্তা রাবিশের সঙ্গে। দিদি এদিক থেকে ষোল আনা বাবার ধারা পেয়েছে। তার শাড়ি ইস্ত্রী থেকে সব পরিচর্যাই মাকে করতে হতো। তবু পান থেকে চুন খসলেই অকথ্য ভাষায় সে বকতে মাকে। কখনও কখনও বাবাকেও ছাড়িয়ে যেত কটু ভাষণে। বোধ হয় এটা মেয়েদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রূপ আর স্নো পাউডারের পলেস্তারা করা মুখে যে এত বিষ থাকতে পারে, আগে তা ধারণাও করা যায় না ভাষাবিন্যাস না শুনলে।

মা আজ শোকে দুঃখে শীর্ণ সাদা হয়ে গেছেন। বাড়িতে তাঁর ধীর পদচারণ ছায়ার মতই নিঃশব্দ। তাই এতক্ষণ অন্যমনস্ক টুলু বুঝতে পারে নি।

মা আবার বললেন, 'ঘুমোস নি? এতক্ষণ রাত জেগে জেগে কী করছিস? যা ঘুমোগে।' মা টুলুর মাথায় হাত দিলেন। ফিরে তাকালো টুলু।

মা যেন কঙ্কালের মত হয়ে গেছেন।

'ভুলুকে কবে ছাড়বে রে?' মা'র ক্লান্ত স্বর শোনা গেল।

'দাদা ভালো আছে মা। তাড়াতাড়িই ওকে ছেড়ে দেবে।'

'উমার ওখানে একবার গিয়ে ওদের খবর নিলি না? অনেক দিন তো ওদের খবর পাই না।'

'কেন, পরশুই তো তোমাকে ওদের খবর এনে দিলাম।'

মা এগিয়ে এসে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন।

'তুমি ঘুমোবে না মা? যাও, ঘুমোওগে।'

'তুই?'

'হ্যাঁ, আমিও শোব এবার। মনটা ভাল লাগছে না। তাই—'

বাবা মারা যাবার পর মা যেন কেমন হয়ে গেছেন। কথায় কথায় কেঁদে ফেলেন। তাঁকে এখন আরো করুণ লাগে। তার ওপর টিনটিনের শোকটা তাঁর খুবই লেগেছে। লাগাই স্বাভাবিক।

মা টুলুর কাছে এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হলো?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে টুলু বললে।

'ওর বৌদি কি সত্যিই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে? আহা—বড় লক্ষ্মী বৌ ছিল সুজাতা। কিন্তু কি যে হলো ওদের—'

মা'র সঙ্গে এ সব কথা ইতিপূর্বে কখনও টুলুর হয় নি। সুতরাং টুলু বললে: 'ওসব অনেক জটিল ব্যাপার মা। তুমি ভালো মানুষ, এত সব বুঝবে না।'

'হয়তো বুঝবো না। ঠিক কথা। কিন্তু একটা কথা—'

মাকে যেন একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো লাগলো এই মুহূর্তে: 'সেও তো মা। স্বামীর ওপর তার রাগ হতে পারে। হতে পারে অনেক কারণেই। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে ওদের জীবন শুরু হয়েছিল। সে আদর্শে ফাটল ধরলে ওদের জীবনেও চিড় লাগবে—এটা হওয়াও সম্ভব। কিন্তু মা হয়ে কি করে ছেলেকে ছেড়ে গেল? একবার ভাবলো না, সে মা—একটা ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার ওপর। এই ছেলে যখন বড় হবে—লেখাপড়া শিখে মাথা তুলে দাঁড়াবে—সে কি কখনও তার মাকে ক্ষমা করতে পারবে?'

'মা—' অবাক বিস্ময়ে টুলু ডাকলো। 'তুমি এত কথাও বোঝ, আর এমন করে বোঝ?'

'তোর বাবা তো আমাকে ইডিয়ট ছাড়া কথা কইতেন না। আমার যে

একটা প্রাণ আছে, বোধ আছে, ভালো মন্দ বোঝবার অধিকার আছে তা যেন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। উমা তো আমাকে অপদার্থই বলে। কিন্তু আমরা যে অপদার্থ, তাই বরং ভালো আছি। এ সব এত আধুনিকতা আমরা বুঝি না। আর উমা যদি একটু কম আধুনিক হতো তা হলে হয়তো থানিকটা প্রকৃতিস্থ হতো। আর তাকে এত বড আঘাতটাও পেতে হতো না।'

টুলু কি স্বপ্ন দেখছে? মা'র আজ কী হলো। 'মা, তোমার আজ হলো কী মা। অত কথা তুমি বলতে পার?'

একটু হেসে মা বললেন, 'পারতাম না রে, কিছুই বলতে পারতাম না। নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবতেও পারতাম না। শুধু "ইডিয়ট" ছাড়া আব "গাধা" ছাড়া আমি যে আর কিছুই নয়, একথা বার বার মনে হয়েছে। আব মনে হয়েছে তোর বাবার জীবনটা আমি সত্যিই নষ্ট করে দিলাম। উমার বিয়ে হলো। ভাবলাম ওরা দু'জনেই আধুনিক, হয়তো সুখী হবে। নতুন কালের নতুন মানুষ এবা—নতুন মা হবে। ছেলেমেয়ে আদর্শ হবে। আমার মত কবে ওরা ছেলেমেয়েকে নষ্ট করে দেবে না। কিন্তু—' মা থামলেন। 'যাই আমি। মনটা ভারি খারাপ ছিল আজ সারাদিন। পাগলেব মত অনেক কথা বললাম। শো—শো তো তোকে না শুইয়ে আমি যাব না।'

অগত্যা টুলুকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পডতে হলো। মা ছোট ছেলেটির মত ওর মশারি টাঙিয়ে, চারিদিকে সযত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে চলে গেলেন।

তখনও ঘুম আসে নি টুলুর।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মা'র কথা, যে মা'র মুখ দিয়ে একটিও কথা ফুটতো না সেই মা আজ কত কথা বললেন। বাবা মাকে যা ভাবতেন তিনি তো একেবারেই ত[illegible] নন। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন মা। সবই বোঝেন, কিন্তু কথা বলেন না সহজে আ[illegible] অকারণে।

হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে কোথায় যেন বোমা পডলো। একটা—দুটো—তিনটে। তারপর বন্দুকের শব্দ। যাদবপুরের দিক থেকেই মনে হলো। ওধারে নাকি দুটো দল আছে এপাড়া আর ওপাড়ায়। রাস্তা পার হয়ে এপার থেকে ওপারে গেলেই এই অনর্থ।

ঢন ঢন করে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ফায়ার ব্রিগেড চলে গেল। কোথায় যেন আগুন লেগেছে।